রাসায়েল ও মাসায়েল

৫ম খন্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

রাসায়েল ও মাসায়েল

৫ম খণ্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ

আকরাম ফারূক

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেইলগেট, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩১৭৪১০, মোবাইল: ০১৭৫৩৪২২২৯৬

ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com

আমাদের কথা

ইসলামি জ্ঞান গবেষণার বিশ্ববরেণ্য বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ শহর থেকে ১৯৩২ সালে 'তরজমানুল কুরআন' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন, যা অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল যাবত মানব জাতির কাছে ইসলামি জ্ঞান পরিবেশন করে আসছে। আজও সে পত্রিকাটি লাহোর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

এ মাসিক পত্রিকায় তিনি ইসলামের বিপ্লবী চিন্তাধারা হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও প্রকাশভংগীতে পরিবেশন করতে থাকেন, যার ফলে পাঠকবর্গের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। পাঠকদের পক্ষ থেকে উক্ত পত্রিকাটির মাধ্যমে তার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর ও ব্যাখ্যা দাবি করা হয়। মাওলানা পত্রিকাটির মাধ্যমে সেসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেন। এ প্রশ্নোত্তরের ধারাবাহিকতা তার জীবদ্দশা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

এ প্রশ্নোত্তরগুলো 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনামে প্রকাশিত হতে থাকে। রাসায়েল 'রিসালাহ' শব্দের বহু বচন, যার অর্থ 'পত্রপত্রিকা' 'সাময়িকী' ইত্যাদি। মাসায়েল 'মাস্‌য়ালা' শব্দের বহু বচন। অর্থ 'প্রশ্ন' বা 'সমস্যা'। মাওলানা তার সম্পাদিত ও প্রকাশিত পত্রিকাটির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার জবাব দিয়েছেন এবং এ সবের জন্যে 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনাম ব্যবহার করেছেন।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক তার নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। কেউ জ্ঞান লাভের জন্যে প্রশ্ন করেছেন, কেউ তার প্রকাশিত বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে তাকে পত্র লিখেছেন। এ সবের তিনি সুন্দর জবাব দিয়েছেন।

তাছাড়া প্রশ্নের ধরন ছিলো বিভিন্ন। কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফেকাহ সম্পর্কে প্রশ্ন। রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন সাধারণ জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের সাথে বহু আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও মন জয়কারী জবাব তিনি দিয়েছেন। এসব প্রশ্নোত্তর 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনামে গ্রন্থাকারে

কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানার মনীষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এ গ্রন্থের বংগানুবাদের নামকরণও আমরা করলাম রাসায়েল ও মাসায়েল।

'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনামে মাওলানা নিজে যেসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন সেগুলো পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এ খণ্ডটি প্রকাশনার মাধ্যমে রাসায়েল ও মাসায়েলের সেই পাঁচটি খণ্ডের অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন হলো। পরবর্তী কয়েকটি খণ্ড মাওলানার ব্যক্তিগত সহকারি মালিক গোলাম আলীর নামে প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানা জেলে ও সফরে থাকাকালে এবং তার অন্যান্য ব্যস্ততার সময় তার পক্ষ থেকে মালিক গোলাম আলী সাহেব লোকদের প্রশ্নপত্রের জবাব দিতেন। সেগুলোও শীঘ্রি প্রকাশ হবে ইনশাল্লাহ।

আমরা মনে করি আলেম সমাজ, কুরআন, হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রের জ্ঞানপিপাসু, সাধারণ জনগোষ্ঠী এবং আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের জন্যে জ্ঞান আহরণের এ এক অমূল্য গ্রন্থ। তবে জ্ঞান লাভের জন্যে সুস্থ ও নিরপেক্ষ মন মানসিকতার যে প্রয়োজন, সম্মানিত পাঠকবর্গ সেই মন নিয়েই গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করবেন বলে আশা করি। জবাবদাতার মূল চিন্তা ও ভাবধারাকে সামনে রেখেই প্রশ্নোত্তরগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। কোথাও কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে এবং তা আমাদের গোচরীভূত করলে আমরা তা সংশোধনের চেষ্টা করবো। জ্ঞানপিপাসু বাংলাভাষীদের দারুণ আকাংখিত এ গ্রন্থখানি তাদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হচ্ছে বলে আল্লাহ তায়ালার দরবারে কাতর প্রার্থনা, তিনি যেন এ গ্রন্থখানি কবুল করেন এবং এতে প্রভূত বরকত দান করেন। তা হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা।

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১

আয়াতের তাফসির ও হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

০১. নিষিদ্ধ মাসগুলো কি এখনো নিষিদ্ধ?

প্রশ্ন: পবিত্র কুরআনে নিষিদ্ধ মাসগুলোতে সশস্ত্র যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের মুসলিম মনীষীদের মধ্যে শাহ ওলিউল্লাহ এবং তাফসিরে মাযহারীর লেখক মাওলানা সানাউল্লাহ পানিপথী এবং প্রাচীন মনীষীদের মধ্যে আতা ও ইমাম বয়দাবি ছাড়া আর কেউ এ আদেশ বহাল আছে বলে মনে করেননা। বাদায়ে ও সানায়ে গ্রন্থের লেখক আল্লামা যামাখশারী, জাসসাস, ইবনুল আরাবী এবং অন্যান্য ফিকাহবীদ ও তাফসিরকার বলেছেন, এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে। এমনকি 'কিতাবুল উম্' গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ির মতামতও রহিত হওয়ার পক্ষে বলেই মনে হয়। অথচ যে তাফসিরে বায়দাবি তার ফেকাহশাস্ত্রীয় মূলনীতির ধারক বলে স্বীকৃত, তার আলোকে রহিত মনে না করারই কথা।

আমি জানতে ইচ্ছুক, তাফহীমুল কুরআনের লেখক এ ব্যাপারে কি মত পোষণ করেন। তাফহীমুল কুরআনের নীরবতা থেকে দৃশ্যত মনে হয়, এ আদেশ রহিত নয়। এরপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলোরও বিশ্লেষণ কাম্য।

১. ইসলামি সমর বিধানে এ আদেশটি কি অন্যান্য আইনের মতোই মর্যাদাসম্পন্ন?

২. নিষিদ্ধ মাসগুলোতে যুদ্ধের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা কি শুধু আরবদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, না দুনিয়ার প্রত্যেক ইসলামি রাষ্ট্রের জন্যই তা অবশ্য পালনীয়?

৩. তাফসির গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় নিষিদ্ধ মাসগুলোতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হয়েছে এই জন্য যে, স্বয়ং আরবদের মধ্যেও এই প্রথা চালু ছিলো এবং তারা এ পবিত্র মাসগুলোকে শ্রদ্ধা করতো। দুনিয়ার সকল ইসলামি রাষ্ট্রের বেলায় এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য মনে করা হলে তার পেছনে এমন একটা কারণ থাকা চাই, যা আরবদের বিশেষ রীতি রেওয়াজ থেকে পৃথক। সে কারণটা কি? কুরআন ও হাদিসে তার উল্লেখ করা হয়েছে কি?

আপনার কর্মব্যস্ততায় হস্তক্ষেপ করতে হলো বলে আমি লজ্জিত। তবে আশা করি আপনি আমার এই খটকা, বিশেষত ২নং প্রশ্নে যা উল্লেখ করা হয়েছে, দূর করে দেবেন।

জবাব: নিষিদ্ধ মাসের ব্যাপারটা হলো, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত লাভের আগে শত শত বছর ধরে আরবে অশান্তি, বিশৃংখলা ও অরাজকতার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ছিলো। গোত্রে গোত্রে লড়াই ছিলো নিত্যকার ঘটনা। পথঘাট ছিলো একেবারেই নিরাপত্তাহীন। কোনো মানুষ নিজ গোত্রের সীমার বাইরে গিয়ে নিজেকে নিরাপদ মনে করতো না। এমনকি কোনো গোত্র তার এলাকায় অপেক্ষাকৃত প্রতাপশালী অন্য কোনো গোত্রের আকস্মিক আক্রমণ ঘটবে না, এমন কথা নিশ্চিত করে বলতে পারতো না।

এহেন পরিস্থিতিতে বছরে চার মাস নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া, সেই চার মাসে যুদ্ধ, নরহত্যা ও লুটতরাজ বন্ধ থাকা এবং নিরাপদে হজ্ব ও ওমরা পালনের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার মতো আল্লাহর রহমত কবে কিভাবে আরবদের উপর নাযিল হলো, তা কেউ জানেনা। এটাও জানা যায় না যে, এই চারটি মাসকে নিষিদ্ধ ও পবিত্র বলে মান্য করার বিধি কে কবে প্রবর্তন করলো এবং কিভাবেই বা তা আরবের সকল গোত্র মেনে নিলো। যাই হোক, ইসলামের আগমনের পূর্বে শত শত বছর ধরে আরবে এই রীতি চালু ছিলো এবং প্রতিবছর অন্তত চার মাসের জন্য শান্তি লাভ করা সেই হতভাগা জাতির জন্য আল্লাহর একটা বিরাট অনুগ্রহ ছিলো, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পর জাহিলিয়াত যুগের অন্য সকল ভালো রীতিপ্রথার মতো এ রীতিটাও বহাল রাখা হয়। কেননা এর কল্যাণে অন্তত চার মাস রক্তপাত বন্ধ থাকতো। হজ্ব ও ওমরার কার্যধারা চালু রাখা সম্ভব হতো। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই মাসগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন থেকে বুঝা যেত যে, জাহিলিয়াতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আরবদের মধ্যে কিছুটা খোদাভীতি অবশিষ্ট রয়েছে। এরপর যখন রসূল সা. হিজরত করলেন এবং মুসলমানদের সাথে আরবের কাফেরদের যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হলো, তখনও এই চারটা মাসের পবিত্রতা বহাল ছিলো, যাতে আর না হোক, এই চার মাস মুসলমানরা শান্তিতে থাকতে পারে। কিন্তু সমগ্র আরববাসী মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর এ আদেশ আপনা আপনি রহিত হয়ে গেলো। কেননা ইসলামে অন্তর্ভুক্তির পরে তো তাদের উপর আরেকটা বৃহত্তর বিধান কার্যকর হলো। সেটা হলো, উপযুক্ত কারণ ও পদ্ধতি ছাড়া কোনো মুসলমানকে হত্যা করার বিরুদ্ধে চিরন্তন ও সার্বক্ষণিক নিষেধাজ্ঞা। এরপর নিষিদ্ধ মাসের বিধান চালু থাকার অর্থ দাঁড়াতো, আরববাসী কেবল চার মাস যুদ্ধবিরতি পালন করবে, আর বাদবাকি সারা বছর লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে।

চার মাসের নিষেধাজ্ঞা শুধু আরব উপদ্বীপের জন্য, আর তাও ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত সময়ের জন্য কার্যকর ছিলো। তার একটা প্রধান যুক্তি হলো, আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের সকলে মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানদের যুদ্ধবিগ্রহ কেবলমাত্র আরব উপদ্বীপের বাইরের অমুসলিমদের সাথেই হওয়া বৈধ ছিলো। ঐসব যুদ্ধে নিষিদ্ধ মাসের প্রশ্ন সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ তোলেনি। অমুসলিমদের পক্ষে তো যুদ্ধ শুরু করতে গিয়ে নিষিদ্ধ মাসের দিকে লক্ষ্য রাখা সম্ভবই ছিলনা। কিন্তু স্বয়ং মুসলমানরাও কোনো অমুসলিম জাতির উপর আক্রমণ চালাতে গিয়ে এটা ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ না বাধুক। কোনো ফেকাহবিদও কখনো এতে আপত্তি তুলেছেন বলে আমার জানা নেই। **(তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি: ১৯৬৫)**

০২. হাদিসের দেরায়াত (যৌক্তিকতা)।

প্রশ্নঃ আপনি সূরা সোয়াদের তাফসিরে সোলায়মান আ. সম্পর্কে আবু হুরায়রা রা. -এর রেওয়ায়েতকে বিশুদ্ধ মেনে নেয়া সত্ত্বেও তার বিষয়বস্তুকে অযৌক্তিক আখ্যায়িত করে

প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপনার বিরোধীরা এ ব্যাপারটার ছুতো ধরে আপনাকে হাদিস অস্বীকারকারী বলে চিহ্নিত করে বসতে পারে। তারা বলতে পারে, আপনি যুক্তির নামে বিশুদ্ধ হাদিসকে অস্বীকার করে থাকেন। আপনার এই মত পরিবর্তন করুন, নচেত এর স্বপক্ষে কুরআন বা হাদিসের কোনো প্রমাণ থাকলে তা পেশ করুন। প্রাচীন ইমামদের কেউ যদি এ কথা বলে থাকেন তবে তার বরাত দিন।

কোনো ইমাম কোনো হাদিসের সনদ শুদ্ধ মেনে নিয়েও হাদিসের বক্তব্য যুক্তিবিরোধী বিধায় তা অস্বীকার করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত থেকে থাকলে তার বরাত দিন। পুনরায় বলছি, সোলায়মান আলাইহিস সালাম এক রাত্রে ৯০ জন স্ত্রীর কাছে গেছেন, এটা মেনে নিলে শরিয়তের দিক থেকে আপত্তির কি আছে? আধুনিক পাশ্চাত্যঘেঁসা মহলের চিন্তাধারায় আপনিও কি প্রভাবিত হয়ে গেলেন?

জবাব: দয়া করে আমার ঐ টীকাটি আবার পড়ে দেখুন, যা নিয়ে আপনি মন্তব্য করেছেন। সনদ শুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এ হাদিসটা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার যুক্তি কি, তা ওখানেই লেখা রয়েছে। ওখানে আমি একথাও বলেছি যে, সম্ভবত রসূল সা. ইহুদিদের জনশ্রুতিমূলক কল্পকাহিনীর উল্লেখ করেছেন। আর শ্রোতা বা তার পরবর্তী কোনো বর্ণনাকারীর এরূপ ভুল ধারণা জন্মেছে যে, তিনি প্রকৃত ঘটনাই বর্ণনা করেছেন।

প্রাচীন ইমামদের কেউ কোনো হাদিসের সনদ শুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তার বক্তব্য গ্রহণ করেননি এমন দৃষ্টান্ত আছে কিনা, আপনার এ প্রশ্নের জবাবে বলছি, এর একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। আয়েশা রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. -এর বর্ণিত নিম্নের হাদিসটি লক্ষ্য করুন:

"যে ব্যক্তি প্রেম করে, অতঃপর চারিত্রিক সততা বজায় রেখে মারা যায়, সে শহীদ।" অপর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি কারো প্রেমে পড়ে কিন্তু তা গোপন রাখে, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা বজায় রাখে ও ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।" 'যাদুল মায়াদ' গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম উক্ত হাদিস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন:

'এ হাদিসের বিশুদ্ধতা যদি সূর্যের মতো স্পষ্ট হতো, তবুও তা অশুদ্ধ ও ভ্রান্ত হতো।' তার মতে এর কারণ হলো, এ হাদিসের বক্তব্য বিশুদ্ধ নয় এবং এর ভাষাও রসূল সা. -এর বলে মনে হয় না। -যাদুল মায়াদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৬, ২০৭।

'আল ইস্তিয়াব' গ্রন্থে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন: 'ইবনে ওমর রা. বর্ণিত এ হাদিস উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত ও ভ্রান্ত। এর বক্তব্য সঠিক নয়, যদিও তার সনদ নির্ভুল।' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৬৬)

এটা অসম্ভবও নয় দুর্বোধ্যও নয় যে, কোনো ব্যক্তি রসূল সা.-এর মুখ থেকে একটা কথা সত্যিই শুনেছে, কিন্তু তা ভালো করে বুঝতে পারেনি। কিংবা স্থান ও কালের প্রতি দৃষ্টি না থাকার কারণে সে ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়েছে। বুখারি ও মুসলিমেই এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. একথা বলতেন যে: 'মৃত ব্যক্তির উপর তার পরিবার পরিজনের বিলাপের কারণে আযাব হয়।'

আয়েশা রা. যখন ব্যাপারটা জানলেন তখন বললেন, 'আল্লাহ ইবনে ওমর রা.-কে মাফ করুন। তিনি মিথ্যা বলেননা। তবে তার ভুল হয়ে গেছে অথবা ভুল বুঝেছেন। আসল ব্যাপার ছিলো, জনৈকা ইহুদি মহিলা মারা গেলে তার পরিবারের লোকেরা খুব কান্নাকাটি করছিলো। রসূল সা. সেই জায়গা দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন: 'এরাতো এখানে তার জন্য কান্নাকাটি করছে, অথচ সে কবরে আযাবে ভুগছে।' এজন্য হাদিসের সনদ দেখার সাথে সাথে তার বক্তব্য ও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কেবল সনদ শুদ্ধ হলেই হাদিসের বক্তব্যে প্রকাশ্য কোনো অশোভন ব্যাপার থাকলেও তা মেনে নিতে হবে, এটা জরুরি নয়।

আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন সোলায়মান আ. যদি এক রাত্রে ৯০ জন স্ত্রীর কাছে যেয়ে থাকে তবে তাতে শরিয়তের দৃষ্টিতে আপত্তির কি আছে? আমার কথা হলো, এতে শরিয়তের দৃষ্টিতে নয়, যুক্তির দৃষ্টিতে আপত্তির ব্যাপার রয়েছে। বাস্তবে এমনটি হওয়া সম্ভব নয়। আমি তো হিসাব করে বলে দিয়েছি যে, ৯০ জন নয়, ৬০ জন স্ত্রীও যদি থেকে থাকে তবে এক নাগাড়ে দশ ঘণ্টাব্যাপী প্রতি দশ মিনিট অন্তর সোলায়মানের এক একজন স্ত্রীর কাছে যাওয়া এবং তার সাথে সহবাস সম্পন্ন করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

আপনার বিবেকে কি বলে, একজন মানুষের পক্ষে প্রতি দশ মিনিটে একবার সহবাস করে তৎক্ষণাত আর একবার সহবাস করার জন্য তৈরি হওয়া এবং এভাবে এক নাগাড়ে দশঘণ্টা যাবত এ কাজ করতে থাকা সম্ভব? যদি ধরেও নেই, সোলায়মানের অবস্থা সত্যিই এরূপ ছিলো তা হলেও প্রশ্ন জাগে, স্ত্রীরা কি এমনভাবে প্রস্তুত হয়েই বসে থাকতেন যে, এক স্ত্রীর কাছ থেকে কাজ সেরে তিনি তৎক্ষণাত আর এক স্ত্রীর কাছে যাওয়া মাত্রই সহবাসে লিপ্ত হয়ে যেতেন? এ ধরনের কতাবার্তা যদি আপনি মেনে নিতে চান তবে সানন্দে মানুন। তবে মনে রাখবেন, বক্তব্য ও বিষয়ের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নির্বিচারে রেওয়ায়েতের উপর আস্থা স্থাপনের এরূপ জিহাদের কারণেই হাদিস অস্বীকার করার বিভ্রান্তিকর আন্দোলন আস্কারা পাচ্ছে। -তরজমানুল কুরআন, মার্চ: ১৯৬৫।

০৩. ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের ধ্যানের যুগ।

প্রশ্ন: তাফহীমুল কুরআনে সূরা আনয়ামের ৫০নং টীকায় আপনি বলেছেন, 'এখানে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনা যে বিষয়টির সাক্ষ্য ও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে তা হলো, আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের কল্যাণে আজ যেভাবে মুহাম্মদ সা. ও তার সহচরবৃন্দ শিরককে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং সকল মনগড়া দেবদেবীকে অগ্রাহ্য করে একমাত্র বিশ্ববিধাতার আনুগত্য গ্রহণ করেছেন, অতীতে তেমনি ইবরাহিম আলাইহিস সালামও এ কাজই করেছেন।'

আপনার এ উক্তির মর্ম হলো, সূরার আলোচ্য অংশ ইবরাহিম আ.-এর ওহি প্রাপ্তির পরবর্তী দাওয়াতী কার্যক্রম ও স্বজাতির সাথে বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সাথেই সম্পৃক্ত। 'আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত' কথাটা থেকেই বুঝা যায় যে, নবুয়তের পূববর্তী ধ্যানযুগের বিবরণ দেয়া এ আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া আয়াতে ইবরাহিম আ.-এর দাওয়াতেরও উল্লেখ রয়েছে। এ দাওয়াত যে নবুয়তের পরবর্তীকালেই দেয়া হয়েছে, তা

বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে ধ্যানযুগের কোনো আভাস ইংগীত নেই। ৭৫নং আয়াতের ৫২নং টীকার শেষ বাক্যটিতেও আপনি বলেছেন, নবুয়তের পরবর্তী দাওয়াতী কার্যক্রমের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ 'ইবরাহিম-আ. তাওহীদের যে দাওয়াত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন' বাক্যটি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আপনি রসূল সা.-এর মেরাজ প্রসঙ্গে নিজের বিভিন্ন বইপুস্তকে একাধিক জায়গায় বলেছেন, এভাবে অন্যান্য নবীদেরকেও বিশ্বপ্রকৃতির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করানো হয়েছে। একথার প্রমাণ হিসেবে ইবরাহিম আ.-এর মেরাজ সম্পর্কে এই ৭৫নং আয়াতটিই উল্লেখ করেছেন। এটা সুবিদিত সত্য যে, মেরাজ নবুয়তের পরেই সংঘটিত হয়ে থাকে, নবুয়তের আগে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করানোর জন্য 'আল্লাহর পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া' সম্ভব নয়।

এরপর ৭৬নং আয়াত ف (অতঃপর) অব্যয় দিয়ে শুরু হয়েছে। এ আয়াতে রাতের আগমন এবং তারকা পর্যবেক্ষণের বিবরণ রয়েছে। অথচ এটিকেও আপনি ধ্যান যুগের ব্যাপার বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, কিন্তু এটা কিভাবে ধ্যানযুগের কার্যক্রম হতে পারে, তা আমার বুঝে আসেনি। অনুগ্রহপূর্বক আমার এ খটকা নিরসন করবেন। আর একটা কথা وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ 'এবং যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি ৭৫নং আয়াতের শেষাংশ এবং এটি একটি وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ তথা কারণ বিশ্লেষণী বাক্য। এ বাক্যের শুরুতে সংযোজনী অব্যয় و (এবং) যুক্ত হয়েছে। ব্যাকরণের বিধি অনুসারে এর পূববর্তী বাক্যটিও কারণ বিশ্লেষণী বাক্য হওয়া চাই। অথচ আপনি যে অনুবাদ করেছেন তাতে পুরো আয়াতটির বক্তব্য অন্য রকম দাঁড়ায়। আয়াতের শুরুতে كذلك (অনুরূপভাবে) শব্দটাও দুর্বোধ্য লাগছে। এখানে কিসের দিকে ইংগীত করা হচ্ছে। ব্যাপারটা কি ইতিপূর্বে উল্লিখিত হওয়া জরুরি নয়?

জবাবঃ আপনি সূরা আনয়ামের যে জায়গাটা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, এটা কুরআনের জটিলতম স্থানগুলোর অন্যতম। এর জটিলতা নিরসনের জন্য তাফসিরকারগণ যে কয়েক রকমের ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, তা আমার গৃহীত ব্যাখ্যায় আপনি যতোটা জটিলতা অনুভব করেছেন, তার চেয়েও অনেক বেশি জটিলতার সৃষ্টি করে। আমি এ জায়গাটার দুর্বোধ্যতা দূর করার জন্য সাধ্যমত যেটুকু চেষ্টা করেছি, সেটা যদিও একেবারেই জটিলতামুক্ত নয়, তথাপি আমার ধারণা এ ব্যাখ্যায় সবচেয়ে কম জটিলতা অবশিষ্ট থাকে। আর যেটুকু থাকে তাও নিরসন করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

মূল প্রশ্ন হলো, এ ঘটনাটা নবুয়তের পূর্বের না পরের। যদি নবুয়তের আগেকার ঘটনা হয়, তা হলে তিনটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমতঃ রাত হওয়া এবং সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের উদিত হওয়া কি সেই দিনই সর্বপ্রথম ইবরাহিম আ. প্রত্যক্ষ করলেন? এর আগে কি তিনি এসব দেখবার সুযোগ পাননি? দ্বিতীয়তঃ নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যকে একের পর এক দেখে তার هذا ربى (এই আমার রব) বলাটা কি শেরক নয়? যদিও প্রত্যেকটিকে অস্তমিত হতে দেখে তিনি তার 'রব' হওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করেছেন,

কিন্তু কিছুটা সময়তো এমন অতিবাহিত হয়েছে যখন তিনি (নাইজুবিল্লাহ) শেরকে লিপ্ত থেকেছেন। তৃতীয়ত: বিভিন্ন জিনিসকে রব হিসেবে মেনে নিয়ে অতঃপর পুণরায় তা অস্বীকার করে অবশেষে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাকে একক প্রভু হিসেবে মেনে নেয়ার পর্যায়ে উপনীত হওয়াতে কি সুস্পষ্ট ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়া ধরা পড়ে না? অন্য কথায় এ দ্বারা কি বুঝা যায় না যে, একজন মানুষকে শেরকের মধ্যবর্তী স্তরগুলো অতিক্রম করতে করতে তাওহীদের স্তরে উপনীত হয়েছে এবং সেখানে উপনীত হওয়ার পর স্বজাতির সামনে শের্ককে প্রত্যাখ্যান করার কথা ঘোষণা করেছেন?

আর যদি এ ঘটনা নবুয়তোত্তরকালের হয়ে থাকে, তাহলে উপরোক্ত তিনটি প্রশ্ন আরো তীব্র হয়ে দেখা দেয় এবং সেই সাথে এ প্রশ্নও জাগে যে, ঘটনাটা আসলে ঘটেছিলো কিভাবে? এটা কি এভাবে সংঘটিত হয়েছিল যে, একদিন রাত শুরু হওয়া থেকে নিয়ে পরদিন সূর্য ডোবা পর্যন্ত সমগ্র ব্যাপারটা কি নিভৃতে বসে প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং তারপর বাইরে এসে জনতার সামনে শিরক প্রত্যাখ্যান ও আসমান যমীনের স্রষ্টার দিকে মন নিবদ্ধ করার ঘোষণা দেন? না এটা একটা বিতর্ক ছিলো এবং এতে ইবরাহিম আ. ও তার স্বজাতির লোকেরা ক্রমাগত একদিন এক রাত ধরে অংশগ্রহণ করেছিলেন? মাগরিবের পর থেকে বিতর্ক শুরু হলো।

নক্ষত্ররাজিকে দেখে ইবরাহিম আ. স্বজাতির সামনে বললেন: এগুলো আমার রব। অতঃপর তা যখন ডুবলো তখন বললেন, ডুবে যাওয়া জিনিস তো আমি পছন্দ করি না। আবার চাঁদ উঠলো। তিনি বললেন: এটা আমার প্রভু। অতঃপর তা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত তার জনগণ বসে রইল। ডুবে যাওয়ার পর ইবরাহিম আ. বললেন: আমার রব আমাকে সঠিক পথ না দেখালে আমিও পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। আবার সূর্য উঠলো। ইবরাহিম আ. ঘোষণা করলেন: এটা আমার মনিব। কেননা এটা সবচেয়ে বড়। অতঃপর সমগ্র জাতি দিনভর বসে রইল। যেই সন্ধ্যা হলো এবং সূর্য ডুবলো, অমনি ইবরাহিম আ. এই ঘোষণা দিয়ে বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটালেন। তিনি ঘোষণা করলেন: 'হে জাতি! আমি তোমাদের শিরকী ব্যবস্থার ধার ধারি না'। উপরোক্ত দুটো প্রক্রিয়ার যেটাই আপনি গ্রহণ করুন, এতে যে জটিলতা রয়েছে তা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না।

এই জটিলতাগুলোকে সামনে রেখে ৭৪ থেকে ৭৮নং আয়াত পর্যন্ত টীকাগুলোতে আমি যে ব্যাখ্যা করেছি, তা লক্ষ্য করুন। আমার মতে আলোচনার ধারাবিন্যাস এ রকম যে, শিরকী আকিদার বিরুদ্ধে এবং এক আল্লাহর স্বপক্ষে রসূল সা. কাফেরদেরকে যে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তার সমর্থনে ইবরাহিম আ.-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ৭৪ নং আয়াতে তার নবী জীবনের দাওয়াত সংক্রান্ত। অতঃপর ৭৫ থেকে ৭৮ নং আয়াতের প্রথমাংশ নবুয়তপূর্ব জীবনের চিন্তাধারা প্রতিফলিত করে। এরপর আবার قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّىْ بَارِئٌ থেকে فَاَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ পর্যন্ত নবুয়তের দাওয়াত আলোচিত হয়েছে। মাঝখানে নবুয়তপূর্ব চিন্তার বিবরণ দেয়ার যে উদ্দেশ্য তা আমি ৫১ ও ৫৩নং টীকায় উল্লেখ করেছি।

মেরাজ প্রসঙ্গে এই কাহিনীর বরাত দেয়াতে একটা জটিলতা যথার্থই দেখা দেয়। আপনি তার উল্লেখও করেছেন। কিন্তু কুরআনের এই জায়গাটির জটিলতা নিরসন করার সময় আপনি যদি একটি আনুষঙ্গিক আলোচনার ইশারা ইংগীত থেকে মনমগজকে মুক্ত করে নেন তাহলে ভাল হয়। আনুষঙ্গিক আলোচনার কোথাও প্রসঙ্গক্রমে কোনো ইশারা ইংগীত এসে গেলে সেটা হয়ে থাকে নিতান্তই ভাসাভাসা ব্যাপার। ঐ সময় লেখকের মনমগজ তার আলোচ্য বিষয়ের উপরই কেন্দ্রীভূত থাকে। আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে ভাসাভাসাভাবে ইংগীত দিয়ে যায়। এটা কোনো গবেষণামূলক ব্যাপার হয়না। একটা বিষয়ে গভীর গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের সময় যেসব দিক চিন্তায় আসে, আনুষঙ্গিক ইংগীতে সেসব দিক চিন্তায় আসে না।

وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ এর , দ্বারা আপনার এ যুক্তি প্রদর্শন ঠিক নয় যে, এর পূর্ববর্তী বাক্যটাও কারণ বিশ্লেষণমূলক বাক্য جمله معلله হওয়া চাই। কুরআনে এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন:

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّـــهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ

'ঐ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে আবর্তিত করে থাকি। আর যাতে আল্লাহ বুঝে নেন কে ঈমানদার এবং যেন কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করেন।' (আল ইমরান, আয়াত: ১৪০-১৪১।)

قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّـــهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

'হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা যদি তোমাদের বাড়িতেও থাকতে, তবুও যাদের নিহত হওয়া নির্ধারিত ছিলো, তারা তাদের বিছানায় বসেই নিহত হতো। আর আল্লাহ যাতে তোমাদের বুকের মধ্যে কি আছে তা পরখ করতে পারেন এবং তোমাদের মনে যা আছে তা বাছাই করতে পারেন।' -সূরা ৩: ১৫৪।

كَذَالِكَ (অনুরূপভাবে) বলে যে বিষয়ের দিকে ইংগীত করা হয়েছে, ইতিপূর্বে তার উল্লেখ কোথাও হয়নি। আমি ৫১নং টীকায় বলেছি যে, এ বিষয়টি পটভূমিতে লক্ষনীয়। كَذَالِكَ এর এ জাতীয় ব্যবহারের দৃষ্টান্তও কুরআনে বিস্তর। আপনি كَذَالِكَ যুক্ত আয়াতগুলোকে একত্রিত করুন। দেখবেন, অধিকাংশেরই ইঙ্গিত অনুল্লিখিত এবং তা পটভূমিতে বা পারিপার্শ্বিকতায় খুঁজতে হয়। এমনকি কোথাও কোথাও كَذَالِكَ দিয়েই কথা শুরু হয়েছে, যেমন সূরা শূরার পয়লা আয়াতে। (তরজমানুল কুরআন, জুন ১৯৬৫)

০৪. খিজির আলাইহিস সালাম কি মানুষ?

প্রশ্ন: তাফহীমুল কুরআন তৃতীয় খণ্ড (উর্দু) পড়ছি। খিজির আ.-এর ঘটনা এবং আপনার ৬০নং টীকা পুরোপুরি পড়েছি। খিজির আ. সম্পর্কে আপনার ধারণা এরকম মনে হয় যে, তিনি কোনো ফেরেশতা হবেন অথবা আর যাই হোন মানুষ নন। আমার মাথায় এমন কিছু তথ্য রয়েছে যার কারণে আপনার ধারণার সাথে আপাতত একমত হতে পারছি না। তাই আপনার আরো কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমার প্রয়োজন। আপনার

যুক্তি প্রমাণের কেন্দ্রীয় বিষয় হলোঃ মানুষ যদি মুমিন হয়, তবে তাকে শরিয়তের অনুগত হতেই হবে। তাই খিজির আ.-এর কার্যকলাপের সাথে 'শরিয়তের সংঘাত' তাকে মানুষ বলে মেনে নেয়ার পথে অন্তরায়। এর অর্থ দাঁড়ায়, তার কার্যকলাপকে যদি কোনো উপায়ে শরিয়তের সাথে সংগতিশীল প্রমাণ করা যায়, তাহলে তার মানবত্ব নিয়ে আর কোনো কথা ওঠে না। কিন্তু কুরআনে খিজির আ.-এর বৃত্তান্ত যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে তার মানুষ হওয়ার পক্ষেই ধারণা জন্মে।

আমার মনে হয়, যেসব কাজ মানুষ নিজে করতে পারে তা ফেরেশতারা করেন না। মানুষ যখন একেবারেই অসহায় হয়ে যায় এবং যখন কোনো কাজ মানুষের সমস্ত ক্ষমতা ও উপায় উপকরণের আয়ত্বের বাইরে চলে যায়, কেবল তখনই আল্লাহ মানুষের ক্ষতি বা উপকারের উদ্দেশ্যে কোনো ফেরেশতাকে বা বিশ্ব প্রকৃতির ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত কর্মীদেরকে কোনো বিশেষ কাজ সমাধা করার জন্য পাঠাতে সম্মত হন। তাছাড়া কাজ সমাধা করার জন্য তাদের গৃহীত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াও মানবীয় পদ্ধতি প্রণালী থেকে পৃথক ধরনের হয়ে থাকে এবং তাতে চমকপ্রদ অভিনবত্বও থাকে।

কোনো নৌকার তক্তা ভাংগা, কোনো শিশুকে হত্যা করা এবং কোনো ধ্বংসোম্মুখ প্রাচীরকে পুনর্বহাল করার জন্য কোনো ফেরেশতার শক্তির দরকার হয়না। এগুলো মামুলী মানবীয় কাজ। এতে এমন কোনো চমকপ্রদ অভিনবত্বও নেই, যা গায়েবী তৎপরতার বিষয়ে কল্পনার উদ্রেক করে। এজন্য সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের সাক্ষ্য হলো, খিজির মানুষ ছিলেন, ফেরেশতা ছিলেন না।

মুসা আ. ও খিজির আ. উভয়ে গ্রামবাসীর কাছে খাবার চেয়েছিলেন, আয়াতে ব্যবহৃত বহুবচন ক্রিয়া থেকে একথা স্পষ্ট। উভয়ে ক্ষুধার্ত ছিলেন এবং উভয়ের খাদ্যের প্রয়োজন ছিলো, তা বেশ বুঝা যায়। খিজির আ. যদি ফেরেশতা হতেন, তাহলে তার খাদ্যের প্রয়োজন হতেই পারে না। কেননা ইবরাহিম আ. যখন ভুনা করে বাছুরের গোশত এনে (মানবরূপী) ফেরেশতাদেরকে খেতে দিয়েছিলেন, তখন তারা তা খাননি, কারণ স্বভাবতই তাদের খাওয়ার চাহিদা ছিলনা। এ থেকেও বুঝা যায় যে, খিজির আ. মানুষ ছিলেন, ফেরেশতা ছিলেন না।

একটা নিষ্পাপ শিশুর হত্যাকাণ্ড কেবল শরিয়তধারী মুসাকেই হতবাক ও মর্মাহত করেনি। বরং যে কোনো সুস্থ প্রকৃতির মানুষের কাছেই তা একটা ঘোর নিন্দনীয় ও জঘন্য কাজ ছিলো। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ লাভের পর নির্দেশ বাস্তবায়ন ছাড়া আর কিইবা করার ছিলো? ইবরাহিম আ. এভাবেই তো নিজের পুত্রকে আল্লাহর হুকুমের ইংগীত পাওয়া মাত্রই জবাই করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন এবং আপন শরিয়তের বিধির আশ্রয় নিয়ে কোনো রকম ওজর আপত্তি করার চিন্তাও করেননি। অথচ শরিয়তের আলোকে তো সন্তান হত্যা একটা জঘন্য পাপ। পাপটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার দ্বারা সংঘটিত হতে পারেনি।

ইবরাহিম আ. ও ইসমাইল আ. উভয়েই আল্লাহর হুকুম পালনে যেরূপ সাহসী উদ্যোগ নিয়েছিলেন শরিয়তের বিধির তোয়াক্কা না করেই, তাতে দৃশ্যত এ সিদ্ধান্তই নেয়া যায় যে, স্বাভাবিক অবস্থায় শরিয়তের পাবন্দী করা অপরিহার্য। তবে যখন কোনো ব্যক্তি

কোনো বিশেষ কাজে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ খোদায়ী নির্দেশ লাভ করে, তখন সেই ব্যাপারে শরিয়তের বিধি উপেক্ষা করা তার জন্য বৈধ হয়ে যায়।

খোদায়ী নির্দেশ প্রাপ্ত এই মহান ব্যক্তিবর্গের কার্যকলাপ ও চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলে আধুনিক মুসলিম মনীষীদের চিন্তাধারার সাথে একমত হতে যেমন মন সায় দেয়না, তেমনি খিজিরের মানবত্বকে অস্বীকার করতেও মনে চায়না। আল্লাহর সর্বব্যাপী রহমত তো সর্বক্ষেত্রেই বিরাজমান। কিন্তু আল্লাহ যখন তার কোনো বিশেষ রহমতের কথা এরূপ ভাষায় বলেন যে: اَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا 'আমার পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ তার উপর বর্ষণ করেছি' এবং عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا 'আমার পক্ষ থেকে এক বিশেষ জ্ঞান তাকে দান করেছি, তখন মনে হয়, এ রহমত ঠিক সেই ধরনের এবং ততোখানিই ব্যাপক, যেমনটি কোনো কোনো নবী ও রসূলের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। وَاَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا 'আমি তাকে এক বিশেষ ক্ষমতা ও জ্ঞান দান করেছি,' -এসব ভাষায় নিহিত রয়েছে। আমার জানা মতে, উপরোক্ত তিনটে আয়াতের কোনটাই কোনো ফেরেশতার ব্যাপারে কখনো নাযিল হয়নি। কোনো ভাগ্যবান মানুষের সাথে যখনই এসব আয়াত সম্পৃক্ত হয়েছে, তখন তার ব্যাখ্যা ও তাফসিরে নবুয়ত ও রেসালাতের তত্ত্বই পেশ করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হলে খিজির আ.-কে মামুলী মানুষ নয় বরং নবী বা রসূল মনে করা যেতে পারে।

আল্লাহ যখনই কোনো বিশেষ মানবকে নিজস্ব কোনো অসাধারণ জ্ঞান দ্বারা অলংকৃত করতে চেয়েছেন এবং কোনো ফেরেশতাকে তার বাহন বানাতে চেয়েছেন, তখন স্বয়ং ফেরেশতাকেই তার কাছে পাঠানো হয়েছে, ওহি ও ইলহামের ধারককে ফেরেশতার কাছে যেতে বলা হয়নি এবং তিনি নিজেও এ ধরনের কোনো ফেরেশতার সন্ধানে বের হননি। (অবশ্য প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।)

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলোর প্রত্যেকটিই আমার দ্বিধা সংশয়ের কারণ ঘটিয়েছে। এ সংশয় দূর করতে আপনাকেই কষ্ট দিতে হচ্ছে। এছাড়া উপায় নেই। প্রথমত এ জন্য যে, ইসলামের যেরূপ জ্ঞান ও চিন্তা গবেষণার ক্ষমতা আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন, তা সবার ভাগ্যে জোটেনি। দ্বিতীয়ত খিজির আ.-কে নিয়ে আন্দাজ অনুমান চালালেন আপনি, আর প্রশ্ন করা হবে অন্যের কাছে, এটা তেমন সঙ্গত নয়।

জবাব: আমি খিজির আ. প্রসঙ্গে যা কিছু লিখেছি, তা নিছক আমার আন্দাজ ও ধারণা মাত্র। পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে এ কথাও বলিনা যে, তিনি মানুষ ছিলেন। এটাও বলিনা, তিনি মানুষ ছাড়া অন্য কিছু ছিলেন। আমার এ আন্দাজ ও অনুমানকে মেনে নিতে আপনি বাধ্য নন। আপনি যদি তার মানুষ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে থাকেন তবে তাতে কোনো আপত্তি নেই।

আপনার এ অভিমত সঠিক যে, কুরআনে এ ঘটনা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে এ ধারণাই জন্মে যে, তিনি মানুষ ছিলেন। কিন্তু তার শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপের কারণেই তাকে মানুষ মেনে নিতে ইতস্ত বোধ হয়। নৌকায় ছিদ্র করে দেয়া এবং একটি নিষ্পাপ শিশুকে পাপে লিপ্ত হবার আশংকায় পাপ কাজ করার আগেই হত্যা করা স্পষ্টতই শরিয়তের পরিপন্থী কাজ। আল্লাহ যদি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতেন, খিজির আ. একজন

মানুষ ছিলেন, তাহলে আমরা ধরে নিতাম যে, মানবজাতির জন্য আল্লাহর যে আইন ও বিধিমালা রয়েছে তা দুরকমের। একটা হলো শরিয়তে বর্ণিত বিধিমালা। আর অপরটি হলো কোনো বান্দাহর উপর প্রত্যক্ষভাবে নাযিল হওয়া শরিয়তের বিরোধী বিধিমালা। কিন্তু কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় খিজিরকে মানুষ বলে উল্লেখ না করায় এবং আল্লাহর নির্দেশনাবলীকে দুভাগে বিভক্ত করার কোনো দৃষ্টান্ত কুরআনে না থাকায় খিজিরকে মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টি মনে করাই আমার কাছে অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ইবরাহিম আ.-এর ঘটনা থেকে আপনি যে যুক্তির অবতারণা করেছেন, সেটা খাটতো যদি তিনি সত্যি সত্যি স্বীয় পুত্রকে জবাই করে দিতেন। সেক্ষেত্রে আমি স্বীকার করতাম, আল্লাহ তায়ালা কোনো কোনো মানুষকে শরিয়তের বিপরীত নির্দেশও দিয়ে থাকেন। কিন্তু ইবরাহীমের ঘটনায় একেতো তার পুত্রকে জবাই করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়নি বরং স্বপ্নে জবাই করতে দেখানো হয়েছিল। দ্বিতীয়ত আল্লাহ জবাই এর কাজটা সংঘটিত হতে দেননি। তাই এ ঘটনা আল্লাহর বিধান দুরকম হওয়ার স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

মানুষের করার মতো কাজ ফেরেশতারা করেন না, তাই নৌকা ভাঙ্গা ও শিশুকে হত্যা করা মানুষেরই কাজ হতে হবে, এ যুক্তিও আপনার ধোপে টেকেনা। সঠিক কথা হলো, যে কাজ মানুষের জন্য অবৈধ, তা ফেরেশতাদের পক্ষে অবৈধ নয়। মানুষ শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়া কারোর সম্পদের ক্ষতি করলে বা কাউকে হত্যা করলে গুণাহ হয়। কিন্তু ফেরেশতারা আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধানের আওতায় প্রতিদিন লাখো লাখো মানুষকে নানা পন্থায় হত্যা করছে এবং নিত্যনতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা মানুষের সম্পত্তি ধ্বংস করছে। আল্লাহর এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার উপর থেকে সামান্য পর্দা সরিয়ে মূসাকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যে, প্রকৃতির কারখানার কর্মীরা কিভাবে ও কি উদ্দেশ্যে কি কি কাজ করে যাচ্ছে এবং মানুষের পক্ষে, তা সে মুসা আ.-এর মতো অসাধারণ মানুষই হোক না কেন, এর নিগূঢ় রহস্য ও যৌক্তিকতা বুঝে ওঠা কতো কঠিন।

মূসা আ. ও খিজির আ.-এর খাদ্য চাওয়া দ্বারা খিজির আ.-এর মানুষ হওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি দেখানোও ঠিক নয়। খিজির আ. মূসা আ.-এর সাথে সত্যিই খাবার খেয়েছিলেন এমন কথা কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। খিজির আ. সম্পর্কে কুরআনের উক্তি:

آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا

যে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় নবীদের সম্পর্কে যে ভাষায় কথা বলা হয়েছে তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তাতে সন্দেহ নেই। এ কথাও সত্য যে, কুরআনে ফেরেশতাদের সম্পর্কে এ ধরনের ভাষা প্রয়োগ করা হয়নি। কিন্তু এ ধরনের ভাষা প্রয়োগের কারণে খিজির আ.-কে নবী ও রসূল মেনে নিতে অসুবিধা থাকতো না। যদি খিজির আ.-এর ঘটনায় নৌকা ভাঙ্গা ও নিরীহ বালককে হত্যা করার বিষয় উল্লেখ না থাকতো। এই দুটো ঘটনা সত্ত্বেও খিজির আ.-কে নবী মেনে নিলে এ কথাও মানতে হয় যে, আল্লাহ সকল নবীকে যে শরিয়তের বিধান দিয়েছেন, তার বিপরীত নির্দেশও তিনি কোনো কোনো নবীকে দিতেন। নবীদেরকে বিশেষ ক্ষমতা ও বিশেষ জ্ঞান দানের কথা যে ভাষায় বলা হয়েছে, তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ভাষায় খিজির আ.-কে অসাধারণ জ্ঞান ও অনুগ্রহ বিতরণের

উল্লেখ এমন গুরুতর ব্যাপারে মেনে নেয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। আর ফেরেশতাকে মূসা আ.-এর কাছে না পাঠিয়ে মূসা আ.-কে ফেরেশতার কাছে পাঠানো একটা অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া, এ যুক্তিতেও এমন গুরুতর তত্ত্ব মেনে নেয়া যায় না।

আপনার এ ধারণাটাও সঠিক নয় যে, খিজির আ.-কে ফেরেশতা আখ্যায়িত করা কেবল আধুনিক মনীষীদের 'চিন্তা গবেষণার ফসল'। আপনি আধুনিক মনীষী বলে কাদের দিকে ইংগীত করেছেন, তা অবশ্য আমি জানি না। তবে আপনার জানা দরকার, খিজির আ. রসূল না নবী, ফেরেশতা না ওলী দরবেশ এবং তিনি জীবিত না মৃত, তা নিয়ে প্রাচীন মনীষীদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে।

বুখারির টীকা ফাতহুল বারীতে ইলম সংক্রান্ত অধ্যায়ের মুসা আ.-এর সমুদ্রযাত্রা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে হাফেজ ইবনে হাজার এ মতভেদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এর পরবর্তী নবীদের সংক্রান্ত অধ্যায়ে তিনি পুনরায় বলেছেন:

'সুহাইলী একটি গোষ্ঠীর বরাত দিয়ে বলেছেন, খিজির মানুষ নয়, একজন ফেরেশতা ছিলেন।(তরজমানুল কুরআন, জুলাই: ১৯৬৫)

০৫. খোদায়ী ওয়াদার তাৎপর্য

প্রশ্ন: হাদিসে পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াতের ব্যাপারে বড় বড় ওয়াদা দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ আয়াতুল কুরসীই ধরুন। বুখারি ও মুসলিম শরীফে সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ এভাবে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে: 'যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী পড়বে, তার জন্য একজন ফেরেশতা রক্ষক ও প্রহরী নিযুক্ত হয়।' এর দ্বারা চুরি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং ধনসম্পদ নিরাপদে থাকে, এ কথাও বহুল প্রচারিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সময় সময় চুরি হয়ে যায় এবং মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়। হাদিসে এ কথাও বলা হয়েছে যে:

بسم الله الذى لا يضرمع اسمه شيىءً فِى الارض ....

যে ব্যক্তি এই দোয়াটি পড়ে, কোনো কিছুই তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

আমি শুধু এ কথাই বলতে চাইছি যে, এ সব বর্ণনা সত্ত্বেও বাস্তব ঘটনাবলী ওয়াদা মোতাবেক হয়না। অনুগ্রহপূর্বক এ সমস্যাটার সমাধান করে দেবেন।

জীবিকা ইত্যাদি সংক্রান্ত ওয়াদাসমূহের ব্যাপারেও একই কথা খাটে। পরহেজগার লোকদেরকে জীবিকা দেয়া হবে বলে বহু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এমন বহু লোক দেখা গেছে, যারা অত্যধিক পরহেজগার হওয়া সত্ত্বেও চরম অভাবের শিকার। সততার সাথে জীবিকা উপার্জনকারীদের অবস্থা এমন শোচনীয় আর অসৎ লোকদের এতো সচ্ছলতা, এর কারণ কি? এ অবস্থা দেখে মনের শান্তি ক্ষীণ হয়ে আসে এবং সততার প্রতি মানুষের আকর্ষণ কমে যায়। সাধারণত দুর্নীতির পথ অবলম্বনকারীরা সফলতা লাভ করে, আর যারা শরিয়তের বিধি নিষেধ মেনে চলে এবং দুর্নীতি এড়িয়ে চলে তারা সফল হতে পারে না। আশা করি আপনি এই দুর্বোধ্য ব্যাপারটার সুরাহা করে দেবেন।

জবাব: আয়াতুল কুরসী এবং بسم الله الذى لا يضر এর যেসব সুফল হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, কেবল মুখ দিয়ে আউড়িয়ে দেয়াতেই তা অর্জিত হয়না। বরং এ জিনিসগুলোকে

ভেবে চিন্তে ও বুঝে শুনে পড়লে এবং এগুলোর বক্তব্য বিষয়কে নিজের চিন্তা ও কর্মে বাস্তবায়িত করলে এগুলোর যে সুফল বর্ণিত হয়েছে সত্যিই তা পাওয়া যায়। এর অর্থ এরূপ বুঝবেন না যে, যে ব্যক্তি এগুলো পড়বে, সে সব রকমের বিপদ আপদ ও তার স্বাভাবিক ফলাফল থেকে অবশ্যই নিরাপদ হয়ে যাবে। এর প্রকৃত তাৎপর্য হলো, ঐ ব্যক্তির মধ্যে এমন এক দুর্নিবার তেজস্বিতা ও বলিষ্ঠ মনোবলের সৃষ্টি হবে যে, কোনো অবস্থাতেই তার মন দমিত হতে পারবে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্বিপাকতো সব মানুষের জীবনেই আসে। কিন্তু দুর্বল প্রকৃতির লোকেরা তাতে হিম্মত হারিয়ে ফেলে আর দৃঢ়চেতা ও অটুট সংকল্পধারী লোকেরা এ সবের সামনে পরাভূত হয়না।

মুত্তাকী তথা খোদাভীরু লোককে জীবিকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি যেখানে এসেছে, সেখানে জীবিকা অর্থ হালাল রুজি, হারাম উপার্জন নয়। মুত্তাকী হওয়ার অর্থই হলো, হারাম উপায়ে অর্থ উপার্জনের আকাঙ্খাই পোষণ না করা এবং উপার্জনকে হালাল উপায়ের মধ্যে সীমিত রাখার সংকল্প গ্রহণ করা। যে ব্যক্তি এরূপ করে তার জন্য আল্লাহ জীবিকার পথ বন্ধ করেন না। আর এ ধরনের লোকেরাও হালাল পন্থায় আল্লাহ কমবেশি যা জীবিকা দেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। আপনি জীবিকার যে প্রাচুর্যের উল্লেখ করেছেন, তা জীবিকা নয় বরং নোংরা পদার্থ। এটা খাওয়ার কথা কোনো খোদাভীরু লোক ভাবতেও পারে না। (তরজমানুল কুরআন, আগস্ট: ১৯৬৫)

০৬. আল্লাহ্ জীবিকাদাতা হওয়ার তাৎপর্য।

প্রশ্ন: কুরআন মজিদের নিম্নোক্ত আয়াতটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে চাই।

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا

'এমন কোনো বিচরণশীল প্রাণী পৃথিবীতে নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর হাতে ন্যস্ত হয়নি এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেননা সে কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাহিত হয়।'

আমার যে ব্যাপারটা নিয়ে খটকা লাগে তা হলো, জীবিকার দায়িত্ব যখন আল্লাহর হাতে, তখন ১৯৪৩-৪৪ সালে বাংলাদেশে যে ত্রিশ হাজার মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা গেলো, তাদের মৃত্যুর জন্য কে দায়ি ছিলো?

জবাব: আয়াতটির মর্ম হলো, পৃথিবীতে যতো সৃষ্ট জীব রয়েছে তাদের সকলের জীবিকার উপকরণ আল্লাহই তৈরি করেছেন। এই উপকরণ যদি আল্লাহ তৈরি না করতেন, তাহলে কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত এই অগণিত সৃষ্টির জন্য প্রত্যেকের প্রয়োজন ও চাহিদা মোতাবেক জীবিকা আর কে সরবরাহ করতে পারতো? এ কথা ঠিক কিছু কিছু সৃষ্ট জীব কখনো কখনো খাদ্যাভাবে মারাও যায়। তাই বলে আল্লাহর জীবিকাদাতা হওয়ার কথা অস্বীকার করতে হবে, এটা কেমন কথা? প্রথমে একটু হিসাব করুন, খাদ্যাভাবে মারা যায় এমন সৃষ্টির সংখ্যা কোটি প্রতি বরং অযুদ প্রতি কতো জন। অতঃপর এ কথাও বুঝতে চেষ্টা করুন যে, আল্লাহ আপন সৃষ্টির জীবন ধারণের জন্য যেমন সীমাহীন ও অসংখ্য উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি তাদের মৃত্যুর জন্যও তো অগণিত কারণ সৃষ্টি করছেন। প্রতি দিন লক্ষ কোটি মানুষ ভূমিষ্ঠও হয় আবার মৃত্যুও বরণ করে। যারা মরে তারা সবাই একভাবে মরেনা। অসংখ্য রকমারী পন্থায় মারা যায়। মৃত্যুর এই অগণিত পন্থার মধ্যে খাদ্যাভাবও

একটা। মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন জীবিকার প্রাচুর্যও কোনো প্রাণীকে মৃত্যু থেকে রেহাই দিতে পারেনা। আল্লাহর হাতে শুধু জীবিকাই নয়, বরং জন্ম ও মৃত্যুর ব্যবস্থাপনাও তারই হাতে নিবদ্ধ। এ জন্যই আল্লাহর হাতে জীবিকা বলার সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাহিত হয় তাও তিনি জানেন।' (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি: ১৯৬৬)

০৭. সাত আকাশের রহস্য ও পাঁজর থেকে হাওয়ার জন্ম।

প্রশ্ন: তাফহীমুল কুরআন পড়ার সময় দুটো জায়গায় কিছুটা জটিলতা অনুভূত হয়েছে। অনুগ্রহ পূর্বক আপনি আমার এ সংশয় দূর করে দিলে কৃতার্থ হবো।

ক. কুরআনের আয়াতগুলোর বাহ্যিক শব্দবিন্যাস থেকে বুঝা যায়, সাত আসমান সাতটা নির্দিষ্ট জায়গার নাম এবং তা পৃথিবী থেকে আলাদা আলাদা জায়গা। এগুলোর একটা অপরটার উপর ছাদসদৃশ। যেমন سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সাতটি আকাশ, فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ 'আল্লাহ সেগুলিকে সাতটি আকাশে বিন্যস্ত করলেন, سَقْفًا مَّحْفُوْظًا সুরক্ষিত ছাদ' زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ সর্বনিম্ন আকাশকে বহুসংখ্যক প্রদীপ দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন।

কুরআন থেকে এ কথাও জানা যায় যে আকাশের যথারীতি দরজা থাকবে। যেমন, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا 'আর আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, তখন তাতে বহুসংখ্যক দরজা হয়ে যাবে।' এ ব্যাপারে হাদিসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মে'রাজ সংক্রান্ত হাদিসেই এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সে হাদিসে সাত আকাশকে সাতটা পৃথক পৃথক জায়গা হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু আপনি তাফহীমুল কুরআনের সূরা বাকারার ৩৪ নং টীকাতে লিখেছেন, সংক্ষেপে এতোটুকু বুঝে নেয়া চাই যে, পৃথিবীর বাইরে যে সৃষ্টিজগত রয়েছে আল্লাহ তাকে সাতটা মজবুত স্তরে বিভক্ত করে রেখেছেন। অথবা পৃথিবী মহাবিশ্বের যে অঞ্চলে অবস্থিত, তা সাতটা স্তরের সমষ্টি।

অনুগ্রহপূর্বক কুরআন ও হাদিসের উপরোক্ত উক্তিসমূহের আলোকে আপনার এ উক্তির ব্যাখ্যা করুন, যাতে আপনার বর্ণিত মতবাদ পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

খ. তাফহীমুল কুরআন সূরা নিসার ১ নং টীকাতে আপনি লিখেছেন, خَلَقَ فِيْهَا زَوْجَهَا সেই একক মানবসত্তা থেকে তার জোড় সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে সাধারণ তাফসিরকারগণ যা বলেন এবং বাইবেলেও যা বলা হয়েছে তা হলো: আদম আ.-এর পাঁজর থেকে হাওয়া আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে কুরআন এ ব্যাপারে নীরব। উপরোক্ত উক্তির সমর্থনে যে হাদিস উল্লেখ করা হয়, তার যে অর্থ সাধারণভাবে বুঝা হয়েছে, আসল অর্থ তা নয়। এ সম্পর্কে আমার কথা হলো: আপনি যে হাদিসের বরাত দিয়েছেন, সেটাতো বুখারি ও মুসলিমের হাদিস।

এ হাদিস গ্রহণযোগ্য কিনা এবং হয়ে থাকলে তার সঠিক তাৎপর্য কি, অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন।

জবাব: আপনার প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব নিম্নে দিচ্ছি।

ক. যে সব জিনিস মানুষের অজানা ও অচেনা এবং যে সব জিনিস সম্পর্কে মানুষের কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি, সে সব জিনিসের জন্য মানুষের ভাষায় কোনো প্রতিশব্দ

পাওয়া যায় না। এ ধরনের জিনিসের কথা যখন কুরআন ও হাদিসে উল্লেখ করা হয়, তখন মানুষের ভাষা থেকে এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়, যা মানুষ স্বীয় অনুভূতির আওতাধীন জিনিসগুলোর জন্য প্রবর্তন করেছে। এ সব শব্দকে হুবহু তার আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয়। বরঞ্চ এর সাহায্যে অনুভূতি বহির্ভূত জিনিসগুলোর একটা মোটামুটি ধারণা মনে বদ্ধমূল করা দরকার। তথাপি কেউ যদি ছাদ শব্দটা শুনে কেবল ঘরের ছাদই কল্পনা করতে পারে এবং দরজা শব্দ দ্বারা কেবল তার ঘরের দরজা জানালাই বুঝতে পারে যা সব সময় সে দেখতে পায়, তবে বুঝতে হবে তার বুদ্ধির দৌড় ঐ পর্যন্তই। কাজেই তার কাছে এর চেয়ে বেশি আশা করা চলে না। সে যেভাবে কথা বুঝতে সক্ষম তার চেয়ে ব্যাপকভাবে বুঝা তার জন্য জরুরি নয়।

খ. হাওয়াকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা সংক্রান্ত আকিদা যে হাদিস থেকে নেয়া হয়েছে তাতে এ কথা বলা হয়নি যে, হাওয়া আ. আদম আ.-এর পাঁজর থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। বরং একটি হাদিসে বলা হয়েছে, নারীরা পাঁজর থেকে সৃষ্টি হয়েছে। اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ 'নারীদের সাথে ভালোভাবে কথা বলো। কারণ তাদেরকে পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।' অন্য এক হাদিসে নারীকে পাঁজরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। اَلْمَرْئَةُ كَالضِّلْعِ 'নারী পাঁজরের সদৃশ।' আর একটি হাদিসে গোটা নারী জাতিকেই পাঁজর থেকে সৃষ্ট বলা হয়েছে। اَلْمَرْئَةُ كَالضِّلْعِ নারী যাকে পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।' তাছাড়া এই হাদিসগুলোর আলোচ্য বিষয় মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব নয়। আসলে রসূল সা. বলতে চেয়েছেন, নারীর স্বভাবটায় পাঁজরের মতো বক্রতা রয়েছে। তাই তাকে সোজা করার চেষ্টা করা উচিত নয়। বরং তার স্বাভাবিক বক্রতার দিকে লক্ষ্য রেখেই তার সাথে আচরণ করা উচিত। এখন আপনি কি সত্যিই মনে করেন, এ সব হাদিসের নিরিখে হাওয়া আ. আদম আ.-এর পাঁজর থেকে সৃষ্টি হওয়ার তত্ত্বটা ইসলামি আকিদা বলে বিবেচিত হতে পারে? (তরজমানুল কুরআন, মে: ১৯৬৬)

০৮. মনোবিজ্ঞান ও কতিপয় বিবিধ সমস্যা।

প্রশ্ন: আপনার বই পড়ে এবং আপনার সাথে মৌখিক কথাবার্তা বলে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি। আমি সব সময় আপনার কল্যাণের জন্য দোয়া করে থাকি। বর্তমানে আমি আমেরিকায় বিশেষভাবে মনোবিজ্ঞান এবং মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশুনা করছি। ইসলামি বিষয়ে আপনার যে প্রখর পারদর্শিতা রয়েছে তা দ্বারা উপকৃত হতে চাই। আমার প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ।

১. ইসলামে 'নফ্স' এর সংজ্ঞা কি? কুরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যা কি হবে?

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا • فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا • قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا • وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا •

'আর নাফসের শপথ এবং যিনি তাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন, অতঃপর তাকে তার স্বেচ্ছাচার ও সদাচার সম্পর্কে প্রজ্ঞা দিয়েছেন, তার শপথ। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি নফ্সকে পরিশুদ্ধ করেছে সে সফলকাম হয়েছে, আর যে ব্যক্তি তাকে সমাধিস্থ করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।' এটা কি নিছক একটা দৈহিক ও জৈবিক প্রেরণা, না তার চেয়ে অতিরিক্ত

কোনো বস্তু? আয়াতের শব্দবিন্যাস থেকে মনে হয় 'যে ব্যক্তি' কথাটা দ্বারা একটা স্বতন্ত্র সত্তা বুঝানো হচ্ছে, যা নফ্সকে আপন নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং তার উপর প্রভাব খাটায়। স্বেচ্ছাচার ও সদাচার সম্পর্কে প্রজ্ঞা দানের অর্থ কি? নফ্সকে পরিশুদ্ধ করা ও সমাহিত করারই বা তাৎপর্য কি? নফসে আম্মারা (পাপের প্ররোচণাদাতা) এবং নফসে লাওয়ামা (অনুশোচনাকারী) এর মনস্তাত্তিক সংজ্ঞা কি হতে পারে? এই আয়াত ও পরিভাষাগুলোর ব্যাপারে আপনার সার্বিক সহায়তা চাই, যাতে চিন্তা গবেষণার উপকরণ খুঁজে পাই এবং এটি ইসলামের একটা দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুশীলন প্রক্রিয়া গড়ে তোলার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

২. নফ্স (Mind), মস্তিষ্ক (Brain) এবং শরীরের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরনটা কি? মস্তিষ্ক ও শরীর যে বস্তু দ্বারাই তৈরি এবং নাফ্স বা মস্তিষ্ক যে একটা অবস্তুগত জিনিস, তাতো সুবিদিত।

৩. আপনি সম্ভবত তাফহীমুল কুরআনে এবং অন্যান্য স্থানে প্রথম ওহি আগমনের ঘটনার একটা চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এবং এরূপ চিত্র তুলে ধরেছিলেন যে, এটা কোনো আভ্যন্তরীণ (Subjective) অভিজ্ঞতা ছিলনা এবং এর জন্য আগে থেকে কোনো প্রস্তুতিও নেয়া ছিলনা। হঠাৎ করেই বাইরে থেকে ফেরেশতা এসেছিল এবং ওহি নাযিল হয়েছিল। এটা ছিলো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও অভিনব অভিজ্ঞতা। আকস্মিক কোনো ঘটনার ফলে যেমন হয়ে থাকে। এ ঘটনার ফলে রসূল সা.-এরও তেমনি দুর্ভাবনায় পড়তে হয়েছিল। ধ্যান, তপস্যা, মোরাকাবার সাথে নবুয়তী ওহীর জাজ্বল্যমান পার্থক্য এটাই যে, নবী যা পর্যবেক্ষণ করেন, সেটা পুরোপুরি একটা বাহ্যিক ও মূর্তিমান (Objective) সত্য। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্নের সম্মুখীন না হয়ে পারা যায় না। সেটা হলো, হেরা গুহায় নবী সা.-এর ধ্যানের ধরনটা কি ছিলো? এখানে একথা বলার অবকাশ আছে যে, ওটাও আভ্যন্তরীণ ও মানসিক অনুভূতি অর্জনেরই চেষ্টা ছিলো।

৪. আমাকে জনৈক মানসিক চিকিৎসক প্রশ্ন করেছিলেন, একজন মানসিক ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি যেমন নানা রকমের আকৃতি দেখতে পায় এবং নানা রকমের আওয়াজ শুনতে পায়, নবীর উপর ওহি আগমন কি সেই রকম ব্যাপার নয়? (নাউজুবিল্লাহ, কুফরী কথার উদ্ধৃতি কুফরীর শামিল নয়।) আমি তাকে ভালোমত বুঝাতে পারিনি। তাই আপনার সাহায্য চাইছি।

৫. আপনি ইসলামের তাওহীদের মতবাদ ও তার ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, শুরুতে মানুষ এক আল্লাহতেই বিশ্বাসী ছিলো এবং তাকে এ কথাই শেখানো হয়েছিল যে, শিরক হলো পরবর্তীকালের উদ্ভুত জিনিস। কিন্তু আধুনিক ধর্মতত্ত্বের মতামত ঠিক এর বিপরীত। এর সমর্থনে আদিম ও জংলী মানুষের শিরকী ধ্যানধারনার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ যুক্তি খণ্ডন করার উপায় কি?

৬. অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে ইসলাম অপরাধীকে একজন সুস্থ মস্তিষ্ক ও ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি গণ্য করে তাকে আইন ও নৈতিকতার আলোকে আপন কৃতকর্মের জন্য পুরোপুরি দায়ি করে। কিন্তু মনোব্যাধির আধুনিক চিকিৎসকগণ, যাদেরকে সাইকিয়াট্রিষ্ট (Psychiatrist) বলা হয়, অত্যন্ত জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধে লিপ্ত হওয়া

লোকদেরকেও মানসিক রোগী বলেন এবং তাদেরকে সচেতন ও সজ্ঞানে অপরাধ করার দায়ে দোষী করেন না। এ মতবাদ ইসলামের দৃষ্টিতে কতদূর সঠিক এবং এটা মেনে নেয়া চলে কি?

৭. পৃথিবীর খেলাফতের যে পদমর্যাদায় মানুষকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে তাতে কি জিনরাও অংশীদার? তাদের মনস্তত্ত্ব কী মানুষের মনস্তত্ত্বের মতোই? সচরাচর বলা হয়ে তাকে, অমুকের ঘাড়ে জিন চড়াও হয়েছে। এর তাৎপর্য কি? শয়তান বা ইবলিশ কি সর্বত্র বিরাজমান এবং এক সাথে সকল মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখে?

৮. গুণাহর ইহকালীন ও পরকালীন পরিণতির অনিবার্যতা দ্বারা আপনি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন। আবার তওবা দ্বারা গুণাহ্ মাফ হয়ে যায় এ কথাও সর্বসম্মত। এই দুই তত্ত্ব পরস্পর বিরোধী মনে হয়। এ ব্যাপারে আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী।

৯. গীবত গুণাহর কাজ এ কথা সত্য। কিন্তু কখনো কখনো কোনো কোনো মানুষের স্বভাবচরিত্র ফুটিয়ে তোলা যায় এমন দোষ বর্ণনা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন অমুক রগচটা, অমুক তাড়াহুড়া পছন্দ করে ইত্যাদি। একান্ত প্রয়োজনেও কি এটা করা যায় না?

১০. ঈসার অবতরণ, দাজ্জাল বা ইয়াজুজ মাজুজ সম্পর্কে আপনি যে তাফসির করেছেন এবং তাদের পারস্পারিক সংঘাতের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা আণবিক যুগের যুদ্ধের সাথে সঙ্গতিশীল নয়। বর্তমান যুগে তো তীর ধনুকের পরিবর্তে আণবিক বোমা দ্বারা পৃথিবী কয়েক মিনিটে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

জবাবঃ আমার কর্মক্ষমতা যেহেতু দিন দিন কমে আসছে এবং ব্যস্ততাও ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে, তাই আমাকে অত্যন্ত মেপেজুখে সময় ব্যয় করতে হয়। এ জন্য যেসব বিধির বিস্তারিত জবাব দেয়া আবশ্যক, সেগুলো নিয়ে আমাকে নিদারুণ সমস্যায় পড়তে হয়। তবুও আপনার প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি।

১. নফ্স শব্দটা কখনো জীবিত প্রাণীর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'প্রত্যেক প্রাণী মরণশীল'। আবার কখনো তার অর্থ হয়ে থাকে মন (Mind) অথবা সচেতন মন মস্তিষ্ক। যেমনঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا

কখনো এর অর্থ হয় আত্মা বা রূহ। যেমন, فَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ (অর্থাৎ যখন রূহগুলোকে পুণরায় দেহের সাথে যুক্ত করা হবে।) আবার কখনো এর দ্বারা দেহ ও রূহসমেত গোটা মানব সত্তাকে বুঝায়। যেমন, وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ (তোমাদের সত্তার মধ্যেও নিদর্শন রয়েছে। তোমরা কি তা দেখতে পাওনা?) কখনো এ দ্বারা মানুষের মনের সেই অংশকে নির্দেশ করা হয়, যেখানে ইচ্ছা ও আবেগের অবস্থান। যেমন, وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُس (বেহেশতে মন যা যা চায় তার সবই থাকবে) আবার কখনো এ দ্বারা মানব মনের সেই অংশকে বুঝানো হয়, যা স্বীয় বিচার বিবেচনা ক্ষমতা (Judgement) প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নেয় কোন্ পথ অবলম্বন করতে হবে এবং কোন্ কর্মপ্রণালী বা

জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এই নফ্‌স যদি কোনো খারাপ পথ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেয় তবে তাকে 'নফ্‌সে আম্মারা' বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন, اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ (নিশ্চয়ই নফ্‌স খারাপ কাজের প্ররোচনা দেয়।) আর যদি সে খারাপ কাজ করে অনুশোচনা ও ভর্ৎসনা করে তবে তাকে 'নফ্‌সে লাওয়ামা' (আধুনিক পরিভাষায় বিবেক) বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (ভর্ৎসনাকারী নফ্‌সের শপথ করছি)। আর যদি নফ্‌স পূর্ণ হৃদয়ের সন্তুষ্টি সহকারে সত্যের পথ অবলম্বন করে, এর দুঃখকষ্ট ধৈর্য ও স্থিরতার সাথে মেনে নেয় এবং সত্যের বিরুদ্ধে চলার অপকারিতাকে প্রত্যাখ্যান করে পস্তায় না বরং খুশি থাকে, তবে তাকে বলা হয় 'নফ্‌সে মুতমায়িন্না'। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ

يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْ اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً •

(হে নফ্‌সে মুতমায়িন্না (তৃপ্ত মন) নিজে সন্তুষ্ট হয়ে ও প্রভুর সন্তুষ্টিভাজন হয়ে আপন প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তিত হও)। কুরআনের وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا এ আয়াতটিতে 'নফ্‌স' শব্দ দ্বারা সচেতন মন তথা বিবেককে বুঝানো হয়েছে, যাকে চিন্তাশক্তি, বোধশক্তি, মতামত পোষণ, বাছবিচার ও বিচার ফায়সালা করার অত্যাবশ্যকীয় যোগ্যতা ও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, জ্ঞান বুদ্ধি ও যৌক্তিকতা অনুধাবনের সেই সমস্ত উপকরণ তাকে সরবরাহ করা হয়েছে, যা ঐসব যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে প্রয়োগ ও ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন। سويه এর অর্থ হচ্ছে কোনো জিনিসকে যথাযথভাবে তৈরি করে দেয়া। যেমন একটি মোটরগাড়িকে এমনভাবে তৈরি করে দেয়া, যাতে তা ঠিকমত রাস্তায় চলার যোগ্য হয়। فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا এর অর্থ হলো, আল্লাহ মানুষের বিবেককে এমন এক স্বতস্ফূর্ত জ্ঞান দান করেছেন, যা দ্বারা সে ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং কোনটা ন্যায়ের পথ, কোনটা অন্যায়ের পথ তা চিনতে পারে।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا •

এ আয়াত দুটিতে বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন এবং দমিত ও স্তিমিত করার দ্বারা মানুষের সেই 'আমিত্ব' ও স্বকীয়তা বা অহংবোধকে (self, ego) বুঝানো হয়েছে, যা আমার মন, আমার বিবেক, আমার বুদ্ধি, আমার আত্মা, আমার প্রাণ, আমার জীবন ইত্যকার শব্দ উচ্চারণ করে থাকে। এই আমিত্বকেই সেই সচেতন বিবেকের অধিকারী করা হয়েছে। তাকে এই বিবেক এজন্য দেয়া হয়েছে যাতে সে তার প্রতিভা ও ক্ষমতাগুলোকে ব্যবহার করে নিজের ভালো বা মন্দ যেমন ব্যক্তিত্বই বানাতে চায় বানাতে পারে। সে যদি এই সচেতন বিবেককে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে বিকশিত করে এবং তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগায়, তাহলে সফলতা লাভ করবে।

আর যদি সে নাফসে আম্মারা তথা কুপ্ররোচনাদায়ক প্রবৃত্তির গোলামী অবলম্বন করে নিজের সর্বোত্তম যোগ্যতাগুলোকে তার স্বভাবসুলভ পথে চলার সুযোগ না দেয়, যে পথে চলার জন্যই ঐ যোগ্যতাগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে, বরং উক্ত সচেতন বিবেককে নাফসে আম্মারার দাবি ও খায়েশ পূরণ করার জন্য রকমারি কৌশল উদ্ভাবন, ফন্দি

আঁটা এবং উপায় ও পন্থা খুঁজে বের করতে বাধ্য করে, আর সেই সাথে আত্মসমালোচনাকারী নফ্সকেও (নফ্সে লাওয়ামা) দাবিয়ে রাখতে থাকে, তাহলে সে ব্যর্থ ও বিফল হয়ে যাবে।

২. মস্তিষ্ক হলো বিবেকের অবস্থানস্থল এবং তার কার্য সম্পাদনের বস্তুগত হাতিয়ার। আর মস্তিষ্কের মাধ্যমে বিবেক যে নির্দেশ দেয়, তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের যন্ত্র হচ্ছে দেহ। এর একটা স্থূল উদাহরণ হলো, মানুষের ব্যক্তিসত্তা যেনো একটা মোটরগাড়ি ও তার চালকের সমষ্টি। বিবেক হচ্ছে ড্রাইভার। ইঞ্জিন ও স্টিয়ারিং হুইলের সাথে সংযুক্ত যন্ত্রসমূহ হলো সামগ্রিকভাবে মস্তিষ্ক। যে জ্বালানি ও শক্তি ইঞ্জিনের ভেতরে সক্রিয় তা হচ্ছে রূহ। আর মোটরগাড়ির কাঠামোটা হলো দেহ।

৩. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবীসুলভ পর্যবেক্ষণ এবং সুফী দরবেশদের আধ্যাত্মিক তপস্যাকালীন রহস্যময় অভিজ্ঞতার (Mystic experience) পার্থক্য তরজমানুল কুরআনে প্রকাশিত সূরা নাজমের তাফসির দ্বারা আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন।[১] এ প্রসঙ্গে হেরা গুহায় তাঁর ধ্যানের প্রকৃতি কি ছিলো, তা আমি ইসলাম পরিচিতি গ্রন্থে কিছুটা বিশ্লেষণ করেছি। আগামীতে তাফহীমুল কুরআনে সূরা দোহা, আলাম নাশরাহ এবং সূরা আলাকের তাফসির করার সময়ও আরো বিশ্লেষণ করবো।[২] আসলে হেরা গুহায় রসূল সা.-এর চিন্তা ভাবনার বিষয় ছিলো জাহিলিয়াতের রসম রেওয়াজ, আকিদা বিশ্বাস ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড। তা তাঁর দৃষ্টিতে একেবারেই অর্থহীন ও অসার মনে হতো। আহলে কিতাব অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুসারী ইহুদি ও খৃস্টানরা যে ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতো, সেটাও তার মনে কোনো আবেদন ও আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারতোনা। যেসব মারাত্মক আকিদাগত নৈতিক ও সামাজিক অনাচারে আরবরা লিপ্ত ছিলো, তা দেখে তিনি ভীষণ বিব্রত থাকতেন এবং এমন কোনো পথ খুঁজে পেতেন না যাতে করে তিনি ধর্মের একটা পূর্ণাঙ্গ সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও পেতে পারেন, আবার নিজ সমাজ ও আশপাশের সমাজে বিদ্যমান অনাচার ও কুসংস্কারের সংশোধনও করতে পারেন। এ অবস্থাটাই সূরা অলাম নাশরাহে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ

'আমি তোমার মনের উপর থেকে সেই বোঝাটা সরিয়ে দিয়েছি, যা তোমার কোমড় ভেঙ্গে দিচ্ছিলো।' আর এই একই বিষয় সূরা দোহাতে এভাবে বিবৃত হয়েছে: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى 'তোমার প্রতিপালক তোমাকে দিশেহারা পেয়েছিলেন, তারপর তোমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।' ضال আরবি ভাষায় সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যে, পথ না জানার কারণে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং কোনদিকে যাবে এই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে।

---

১. ঐ সময়ে তাফহীমুল কুরআন পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়নি। এখন তাফহীমুল কুরআনে সূরা নাজমের ১০নং টীকা দেখুন।

২. বর্তমানে পুস্তক আকারে প্রকাশিত তাফহীমুল কুরআন আমপারায় দেখুন। -অনুবাদক

৪. আপনার সেই মানসিক চিকিৎসকটি যা যা বলেছেন, সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো, একজন নবী যে পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞানের দীপ্তির সাক্ষাত পান, ঐ বেচারার পক্ষে নিজের শক্তি অনুসারে তার যেমন ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব সেটাই তিনি দিয়েছেন। এছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা দেয়া তার পক্ষে অসম্ভব। আধুনিক মনোবিজ্ঞান আল্লাহকে বাদ দিয়েই মানুষের মানসিক জটিলতা নিরসন করতে চায়। এটা চাবি ছাড়া তালা খোলার চেষ্টার সাথে তুলনীয়। কুরআনকে বুঝে পড়ার সৌভাগ্য যদি তার হতো, তাহলে স্বীয় মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ প্রশ্নের কোনো জবাব তিনি খুঁজে পেতেন না যে, একজন মানসিক রোগীর মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ থেকে কুরআনের মতো গ্রন্থ এবং মুহাম্মদ সা.-এর মতো পূর্ণাঙ্গ, সর্বগুণ সম্পন্ন, সুষম ও কালজয়ী (Everlasting) নেতৃত্ব কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে। এটা যে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা শাস্ত্রের নাগালের বাইরের ব্যাপার এবং তা থেকে অনেক উচ্চতর ও প্রশস্ততর, তা সুস্পষ্ট। মানুষ যদি নিরপেক্ষ ও মুক্তমনা হয় এবং হঠকারী স্বভাবের না হয়, তাহলে সে এ বিষয়টাকে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা শাস্ত্রের মুঠোর মধ্যে আনার চেষ্টা না করে আপন বিদ্যার অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করবে। বস্তুত একজন খোদা যে আছেন, পৃথিবীতে তিনিই যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানবজাতিকে পথপ্রদর্শনের কাজটা স্বয়ং মানুষের মধ্য থেকেই কিছু ব্যক্তিকে দিয়ে করানোর দায়িত্ব যে তিনিই গ্রহণ করেছেন, আর এই উদ্দেশ্যেই যে তিনি নবীকে কিছু রহস্যময় জিনিস পর্যবেক্ষণ করান এবং এক ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতিতে তাকে তত্ত্বজ্ঞান দান করেন, সে কথা মেনে না নেয়া পর্যন্ত এই তালা খোলার চাবি কখনো তার হস্তগত হতে পারে না। এ তত্ত্ব না জেনে কেউ নবীর পর্যবেক্ষণ ও তার কাছে উদ্ভাসিত অদৃশ্য তত্ত্ব ও তথ্যের এরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে বসতে পারে যে, ওটা এক ধরনের মানসিক ব্যাধিজনিত মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও প্রশ্ন থেকে যায়, স্বীয় গোটা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্য নিয়েও সে কি এমন কোনো মানসিক রোগীর দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে, যে আপন মানসিক বিকার ও চিন্তার বিভ্রান্তিজনিত অবস্থায় (Hallucenation) কুরআনের মতো একখানা গ্রন্থ রচনা করে ফেলেছে। সেই গ্রন্থ নিয়ে সে সারা দুনিয়ার মানুষের নেতৃত্ব দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং শুধু নিজের জাতির জীবনে নয় বরং গোটা মানবজাতির একটি বিরাট অংশের জীবনে এমন সর্বাত্মক বিপ্লব সাধন করতে পেরেছে?

৫. ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে ইসলাম সত্যিই এ তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছে যে, মানবজাতির প্রথম আবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশ জ্ঞানের আলোকদীপ্ত পরিবেশেই ঘটেছে এবং তাওহীদ তথা একমাত্র আল্লাহর উপাসনা ও আনুগত্যই ছিলো মানবজীবনের আদিমতম ধর্ম। আল্লাহর সাথে অন্যান্য জিনিসের মিশ্রিত উপাসনা ও আনুগত্য তথা শিরক ছিলো পরবর্তীকালের আবিষ্কার। ইসলামের উপস্থাপিত এ মতবাদকে আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব (Anthropology) দ্বারা উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। কেননা ইসলাম যে যুগের কথা বলে তা হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ। পক্ষান্তরে প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব এখনো পর্যন্ত ঐতিহাসিক যুগের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলীর জ্ঞান যেমন এখন পর্যন্ত আদিম মানুষের তথ্যের নাগাল পায়নি, তেমনি প্রাচীন মানবগোষ্ঠীসমূহের

যে জীবনধারা জানা গেছে তা আদিম মানুষের পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল চিত্র বলে দাবি করাও যথার্থ নয়। এগুলো নিছক আন্দাজ অনুমান ছাড়া কিছু নয়। অথচ একে অনর্থক 'নিশ্চিত জ্ঞান' বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়।

৬. শুধু মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসাশাস্ত্রই নয়, আধুনিক আইন শাস্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাও সর্বতোভাবে অপরাধীর প্রতি সমর্থন ও অপরাধকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। যারা অপরাধীদের দুস্কৃতির শিকার, তাদের প্রতি সহানুভূতির মাত্রা দিন দিন কমে যাচ্ছে। আর অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়াতে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারকরা একটু বেশি রকম মর্মাহত হচ্ছে। বস্তুত আধুনিক শাস্ত্রগুলো যে অপরাধীদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ সংঘটনকারী সমাজবিরোধী আখ্যায়িত না করে তাদেরকে মূলত রোগী বলে সাফাই গেয়ে চলেছে, তার পেছনে এই অপরাধ প্রশ্রয়ী বিকৃত মানসিকতাই সক্রিয়। প্রশ্ন হলো, এই দর্শনের আওতায় আপনাদের মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা বিজ্ঞান কি অপরাধ রোধ করা বা তা হ্রাস করার কাজে আজ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করেছে? বরঞ্চ আমি জানতে চাই, অপরাধের ক্রমবর্ধমান হারকে কিছুমাত্র সীমিত করাও কি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে? এর জবাব যদি নেতিবাচক হয়ে থাকে তাহলে ইসলামি আইন শাস্ত্রের কি দায় পড়েছে যে, এসব দর্শনের ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে খামাখা নিজের বিধি ব্যবস্থাকে পুনর্বিবেচনা করবে?

৭. জিন জাতি সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের কোথাও বলা হয়নি যে, তাদেরকে খেলাফত দেয়া হয়েছে। তবে একথা বলা হয়েছে যে, মানুষের মতো জিনও একটা দায়িত্বশীল সৃষ্টি। মুমিন হওয়া বা কাফের হওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্য করা ও নাফরমানী করার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। অনুরূপভাবে কুরআন ও হাদিস থেকে এ কথাও জানা যায়না যে, জিন মানুষের দেহ ও মন দখল করতে পারে। কেবল এতোটুকু বলা হয়েছে যে, জিনদের ভেতরে যারা শয়তান, তারা মানুষের কুপ্রবৃত্তির (নাফসে আম্মারা) সাথে এমনভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে তাকে বিপথে চলার প্ররোচনা দেয় যে, মানুষ তা টেরই পায়না। ইবলিশ সর্বত্র বিরাজমান এবং সবকিছু দেখতে পায় এমন কথাও কুরআন ও হাদিসে বলা হয়নি। বলা হয়েছে শুধু এতোটুকু যে, শয়তান শ্রেণীর জিনের মধ্য থেকে একটা শয়তান প্রত্যেক মানুষের সাথে লেগে রয়েছে এবং সে তাকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টায় নিয়োজিত। ইবলিশ সর্বত্র সকল মানুষের কাছে যায় না। সে হলো শয়তানদের নেতা। সম্ভবত সে কেবল বড় বড় নেতাদের কাছেই যেয়ে থাকে।

৮. আখিরাত সম্পর্কে আমি যে যুক্তি দিয়েছি, তার সাথে আসলে তওবা তত্ত্বের কোনো বিরোধ নেই। মানুষ যেসব অপরাধ করে তার প্রভাব তার নিজের উপরও পড়ে, সমাজেও ব্যাপকভাবে সংক্রমিত হয়। এমনকি অপরাধীর মৃত্যুর পরও তার ধারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। সে যদি তওবা না করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঐসব অপকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে, তাহলে তাকে আল্লাহর কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে ও শাস্তি ভোগ করতে হবেই। কিন্তু সে যদি তওবা করে এবং আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে জবাবদিহি ও শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেবেন। আর যারা তার অপরাধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের তিনি অন্য কোনো

উপায়ে ক্ষতিপূরণ করে দেবেন। তওবা দ্বারা ক্ষমাপ্রাপ্তির দুয়ার যদি বন্ধ হয়, তাহলে একবার যে ব্যক্তির নৈতিক অধঃপতন হয়েছে, তার জন্য হতাশা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। এ হতাশা তাকে শুধু যে চিরতরে অধঃপতিত করে রাখবে তা নয়। বরং ক্রমান্বয়ে আরো নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করবে।

৯. গীবত সম্পর্কে 'তাফহীমাত' তৃতীয় খণ্ডে আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। তা পড়লে আপনি বৈধ ও অবৈধ গীবতের পার্থক্য ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।

১০. ইয়াজুজ মাজুজ ও দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা আ.-এর অবতরণ সম্পর্কে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, সে সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত জবাব দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আগামীতে পৃথিবীতে কি কি ঘটবে, তা আমার জানা নেই। কুরআন ও হাদিস থেকে আমি ভবিষ্যত সম্পর্কে যা কিছু বুঝতে পেরেছি, তা তাফহীমুল কুরআনে ও খতমে নবুয়ত নামক পুস্তিকায় বর্ণনা করেছি। তবে এর বিস্তারিত বিবরণ জানার কোনো উপায় আমার কাছে নেই। আণবিক অস্ত্র থাকাসত্ত্বেও প্রাচীন অস্ত্রের ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন হয়ে যায় না, হাতাহাতি যুদ্ধের প্রয়োজন পড়াও অসম্ভব নয়। (তরজমানুল কুরআন, মার্চঃ ১৯৬৭)

০৯. 'নূর' ও 'কিতাবুম্ মুবীন' কি এক জিনিস?

প্রশ্নঃ তাফহীমুল কুরআন পড়লে মনে শান্তি ও তৃপ্তি আসে। কিন্তু সূরা মায়েদার তৃতীয় রুকুতে ১৫নং আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আপনি এমন একটা ভুল করে ফেলেছেন, যার দ্বারা একশ্রেণীর লোক নিজেদের ভ্রান্তমতের স্বপক্ষে একটা যুক্তি পেয়ে যেতে পারে। আর অন্য একটি গোষ্ঠী আপনার তাফসির জ্ঞান নিয়ে উপহাস করার সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। আপনি قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ এই আয়াতাংশের অনুবাদ এভাবে করেছেন, 'তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা আলো এবং একখানা সত্য প্রদর্শক গ্রন্থ এসেছে' (যা দ্বারা আল্লাহ তার সন্তোষ প্রত্যাশীদেরকে শান্তির পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন)।

উপরোক্ত অনুবাদ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়, আপনি 'আলোকে একটা আলাদা জিনিস এবং সত্য প্রদর্শক গ্রন্থকে একটা ভিন্ন জিনিস মনে করেন। এ অনুবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট আপনার ৩৮নং টীকা থেকেও এই ধারণাই জন্মে। কেননা আপনি সেখানে লিখেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব ও তার রসূলের জীবন থেকে জ্যোতি আহরণ করে।' অর্থাৎ কিনা, আপনি নূর বা আলো দ্বারা রসূল সা.-এর সত্তা বা জীবন এবং 'কিতাবুম্ মুবীন' তথা সত্য দিশারী গ্রন্থ দ্বারা কুরআনকে বুঝাচ্ছেন। অথচ পরবর্তী আয়াতের দ্বিতীয় শব্দ بِهِ اللهُ (যা দ্বারা আল্লাহ স্পষ্টতই নির্দেশ করছে যে, 'নূর' ও 'কিতাবুম্ মুবীন' দ্বারা আসলে একই জিনিসকে বুঝায়, দুটো ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে নয়। যদি দুটো পৃথক জিনিসকে বুঝাতো তাহলে بِهِ ('যা দ্বারা') না হয়ে بِهِمَا ('যে দুটো জিনিস দ্বারা') শব্দ ব্যবহৃত হতো। আপনার অনুবাদ থেকেও একথাই বুঝা যায়, 'যা দ্বারা (যাদের দ্বারা নয়) আল্লাহ তার সন্তোষ প্রার্থীদেরকে...'।

এখন প্রশ্ন ওঠে, দুটোই যদি এক জিনিস হয়ে থাকে তবে তা কোন্ বস্তু? রসূল না কুরআন? একথাতো আপনিও স্বীকার করবেন যে, রসূল সা.-কে সমগ্র কুরআনে

কোথাও 'নূর'ও বলা হয়নি, 'কিতাবুম্ মুবীন' ও বলা হয়নি। অবশ্য কুরআনকে বেশ কয়েকটি জায়গায় (যেমন সূরা নিসার ১৭৪নং আয়াতে, সূরা আরাফের ১৫৭নং আয়াতে, সূরা শূরার ৫২নং আয়াতে এবং তাগাবুনের ৮নং আয়াতে), 'নূর' শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। আর 'কিতাবুম মুবীন' তো সে আছেই।

এখন এটাও জিজ্ঞাস্য যে, 'নূর' ও 'কিতাবুম্ মুবীন'-এর মধ্যে যে 'ওয়াও' অব্যয়টি রয়েছে, তা কি ধরনের? ওটা কি সংযোজক অব্যয় এবং তার অর্থ কি 'এবং' না অন্যকিছু। একথা ঠিক যে, 'ওয়াও' সংযোজক অব্যয় হয়ে থাকে এবং তার অর্থ 'এবং'ই হয়ে থাকে। কিন্তু 'ওয়াও' কোথাও কোথাও বিশ্লেষক অব্যয়ও হয়ে থাকে। (এবং তার অর্থ হয়ে থাকে 'অর্থাৎ')। এ অর্থে কুরআন তার ব্যবহার একাধিক জায়গায় রয়েছে। কুরআন যে নিজের ব্যাখ্যা নিজেই করে থাকে সে কথাতো আপনার সুবিদিত। যেমন সূরা আল হিজরের ১নং আয়াতে: الٓر ، تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ 'এ হচ্ছে কিতাবের অর্থাৎ সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াতসমূহ।'

এখানে এরূপ অনুবাদ কি ঠিক হবে যে, 'এ হচ্ছে কিতাব ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াতসমূহ'? (অথচ কিতাব ও সুস্পষ্ট কুরআন একই জিনিস)। অনুরূপভাবে সূরা নামলের প্রথম আয়াতটি দেখুন, طٰسٓ ، تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ 'তোয়াসীন, এ হচ্ছে কুরআনের অর্থাৎ একটা সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহ।'

যদি অনুবাদ এভাবে করা হয় যে, 'এ হচ্ছে কুরআনের এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহ', তাহলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হবে যে, হয়তো কুরআন এক জিনিস এবং সুস্পষ্ট কিতাব আর এক জিনিস। অথচ এই দুটো একই জিনিসের দুই নাম।

মোটকথা, 'ওয়াও' ব্যাখ্যা বিশ্লেষণবাচক অব্যয় হিসাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতেও قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ 'ওয়াও' ব্যাখ্যা বিশ্লেষণবাচক অব্যয়ই বটে।

আপনার অনুবাদ এরূপ হওয়া উচিত ছিলো, 'তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো অর্থাৎ এমন এক সত্যদিশারী গ্রন্থ এসেছে, যা দ্বারা....'

আর ৩৮নং টীকা এভাবে লেখা হলে ঠিক হতো, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে জ্যোতি আহরণ করে তাকে চিন্তা ও কর্মে...'

রসূলের উল্লেখ তো এ আয়াতের প্রথমাংশেই রয়েছে: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا

সাম্প্রতিককালের তাফসিরকারদের মধ্যে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. স্বীয় তাফসির বয়ানুল কুরআনে এ অংশটির অনুবাদ করেছেন, 'তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা জ্যোতির্ময় জিনিস এসেছে এবং (তা হচ্ছে) একটা স্পষ্টভাষী কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা...'

তাঁরই শিষ্য মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী স্বীয় ইংরেজি তাফসিরে এই জায়গায় 'মুবীন' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তার অনুবাদ হলো, 'মুবীন (স্পষ্টকারী) শব্দটি দ্বারা এরূপ আভাস পাওয়া যায় যে, কুরআন শুধু নিজেই জ্যোতির্ময় নয় বরং অন্যান্য জিনিসকেও উজ্জ্বল ও আলোকিত করে।'

আশা করি আপনি আমার এ কথাগুলোর আলোকে তাফহীমুল কুরআনের এই অংশটি সংশোধন করবেন, যাতে একটি গোষ্ঠী তাদের ভ্রান্ত ধ্যানধারণার ব্যাপারে আস্কারা না পায় এবং অপর গোষ্ঠী সমালোচনার সুযোগ না পায়।

জবাব: আপনার চিঠি পেলাম। قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُبِيْن -এর যে অনুবাদ আমি করেছি, ইতোপূর্বে বেশ কয়েকজন অনুবাদক এই অনুবাদই করেছেন। আমি এর যে তাফসির করেছি, তাও আমার একচেটিয়া নয়। একাধিক খ্যাতনামা তাফসিরকার এর একই তাফসির করেছেন। প্রথমে কয়েকটি উর্দু ও ফারসি অনুবাদ লক্ষ্য করুন।

শাহ ওলিউল্লাহর অনুবাদ: 'আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তোমাদের কাছে এক জ্যোতি এবং উজ্জ্বল গ্রন্থ অর্থাৎ কুরআন।'

শাহ রফিউদ্দীন সাহেব: 'এসেছে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো এবং বর্ণনাকারী কিতাব।

শাহ আব্দুল কাদের সাহেব: 'তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্যোতি এবং বর্ণনাকারী কিতাব।'

মাওলানা মাহমুদুল হাসান: 'নি:সন্দেহে তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো এবং প্রকাশকারী কিতাব।'

সাম্প্রতিককালের মনীষীদের এ অনুবাদ তো দেখলেন। এবার নাম করা তাফসিরকারদের তাফসির লক্ষ্য করুন।

আল্লামা ইবনে জারীর 'নূর' বা জ্যোতির তাফসির প্রসঙ্গে বলেন, 'আল্লাহ নূর বা জ্যোতি দ্বারা মুহাম্মদ সা.-কে বুঝিয়েছেন। কেননা তাকে দিয়েই তিনি সত্যকে প্রদীপ্ত ও উদ্ভাসিত করেছেন, ইসলামকে বিজয়ী করেছেন এবং শিরককে নির্মূল করেছেন।'

ইমাম রাজী বলেন, এ সম্পর্কে একাধিক অভিমত রয়েছে। প্রথমটি হলো, নূর দ্বারা মুহাম্মদ এবং কিতাব দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো, নূর দ্বারা ইসলাম এবং কিতাব দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। তৃতীয় মত এই যে, নূর ও কিতাব উভয় শব্দ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। এ মতটি অপেক্ষাকৃত দূর্বল। কেননা সংযোজক ও সংযোজিত পদ (مَعطوف عليه و معطوف) ভিন্ন ভিন্ন জিনিস হওয়া জরুরি।

তাফসিরে রুহুল মায়ানীর লেখক আল্লামা আলুসীও এই অভিমতকে অগ্রগণ্য মনে করেছেন যে, নূর দ্বারা রসূল সা.-এর ব্যক্তিত্বকে বুঝানো হয়েছে।

মাওলানা শব্বীর আহমাদ সাহেব যদিও নূর দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে সেই সাথে 'সম্ভবত' কথাটা যোগ করেছেন। কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো তাফসির তিনি বর্ণনা করেননি, এ থেকে মনে হয়, তিনিও এই ব্যাখ্যাকে অগ্রগণ্য মনে করেছেন। তবে সম্ভবত কথাটা এজন্য লিখেছেন যে, নূর শব্দটা দ্বারা যে হুজুর সা. কে বুঝানো হয়েছে, সে কথাটা কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়নি।

আপনি يهدى به উক্তিটির মধ্যে একবচন যুক্ত সর্বনাম দেখে যে প্রশ্ন তুলেছেন তা ঠিক নয়। কুরআনে واؤعطف, সংযোজন অব্যয় 'ওয়াও' দ্বারা একাধিক ব্যক্তির উল্লেখ করার

পরও একবচন ব্যবহারের একাধিক নজীর রয়েছে। সেক্ষেত্রে ওয়াওকে বিশ্লেষণবাচক অব্যয় (عطف تفسير) হিসেবে গ্রহণ করারও অবকাশ নেই। উদাহরণস্বরূপ সূরা নূরে বলা হয়েছে: وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ (যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তার রসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে তিনি তাদের বিরোধ মিটিয়ে দেন') এখানে কি আপনি ওয়াওকে عطف تفسير (বিশ্লেষণবোধক অব্যয়) হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন? আসলে এরূপক্ষেত্রে একবচন ব্যবহারের কারণ হলো, উভয়ে একই পর্যায়ে অবস্থান করে। আল্লাহর ফায়সালা ও রসূলের ফায়সালা আলাদা দুটো ফায়সালা নয় বরং একই ফায়সালা। উভয়ের ভিতরে বিরোধ থাকা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে কুরআনের হিদায়াত ও রসূলের হিদায়াত আলাদা আলাদা জিনিস নয় বরং উভয়ে একই হিদায়াত দিয়ে থাকে।

আপনার ধারণা লোকেরা এ তাফসির দ্বারা ভ্রান্ত যুক্তি দাঁড় করানোর সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো, রসূল সা.-এর ব্যক্তিসত্তাকে হিদায়াতের আলো আখ্যায়িত করাটাই আসল গোমরাহী নয়, আসল গোমরাহী হলো রসূলকে মানুষ মনে না করা। তাঁকে কুরআনে নূর বা আলো আখ্যায়িত করা দ্বারা কেউ যদি প্রমাণ করতে চায় যে, তিনি মানুষ ছিলেন না, তাহলে কুরআনে তো তাকে 'সিরাজাম মুনিরা' (আলো বিতরণকারী প্রদীপ) বলা হয়েছে। তাই বলে কি একথা মেনে নেয়া জরুরি হয়ে পড়ে যে, তিনি কেবল প্রদীপই ছিলেন, মানুষ ছিলেন না? (তরজমানুল কুরআন, মার্চ: ১৯৬৭)

১০. গাছপালা ও কীটপতঙ্গের জীবন ও মৃত্যু।

প্রশ্ন: নিম্নলিখিত দুটো বিষয়ে আপনার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ দুটো বিষয়ে আপনি আরো গভীরভাবে চিন্তা, গবেষণা ও অনুসন্ধান চালালে আমারও খট্‌কা দূর হবে, আর তাফহীমুল কুরআনের পাঠকদেরও জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

১. সূরা নাহলের ৬৫নং আয়াতের আপনি এভাবে অনুবাদ করেছেন, 'তোমরা প্রত্যেক বর্ষাকালে দেখতে পাও যে) আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন আর তার কল্যাণে মৃত পড়ে থাকা মাটিতে সজীবতার সঞ্চার করেন। শ্রবণকারীদের জন্য এতে অবশ্যই এক নিদর্শন রয়েছে।'

এ আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে আপনি ৫৩নং টীকাতে যা লিখেছেন তার সংক্ষিপ্ত রূপ হলো, 'বিগত বর্ষার পর যে তৃণলতা মরে গিয়েছিলো কিংবা যে অসংখ্য কীটপতঙ্গের নাম নিশানাও গ্রীষ্মকালে ছিলনা (অর্থাৎ মরে গিয়েছিলো), সহসা তারা আবার আগের মতো চমক নিয়ে আবির্ভূত হয় (অর্থাৎ পুনরুজ্জীবিত হয়)। তা সত্ত্বেও রসূলের মুখে মানুষ মরার পর আবার জীবিত হবে শুনে তোমরা অবাক হয়ে যাও।'

মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার এ উদাহরণ বাস্তবতারও পরিপন্থী, চাক্ষুস পর্যবেক্ষণেরও বিপরীত। কোনো গুল্ম বা তৃণলতা সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণের পর জীবিত হয় না, চাই যতো বর্ষাই তার উপর দিয়ে কেটে যাক। যেসব শিকড় ও

মূলে জীবনের কিছুমাত্র রেশ অবশিষ্ট থাকে, কেবলমাত্র সেগুলোরই অংকুরোদগম হয়ে থাকে। কীটপতঙ্গ গ্রীষ্মকালে নির্ঘাত মারা যায়। তবে এগুলোর ভেতরে কতক এমনও থাকে, যারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত অচেতন ও অসাড়ভাবে (Hibernated) পড়ে থাকে, অথবা ডিম ভ্রূণ ইত্যাদির আকারে মাটিতে, শুকনো কাঠে, ছিদ্রে, ফাটলে, পানিতে অথবা অন্য কোথাও বিদ্যমান থাকে এবং প্রয়োজনীয় মাত্রার তাপ, আর্দ্রতা ও লাগসই আবহাওয়া পাওয়া মাত্রই নিজ নিজ আবরণ বা খোসা থেকে বেরিয়ে আসে। মশা, মাছি, পতঙ্গ, ছারপোকা এবং পৃথিবীর যাবতীয় কীটপতঙ্গের জন্মের বিভিন্ন স্তর থাকে। পৃথিবীর প্রত্যেক ভূখণ্ডের আবহাওয়া অনুসারে সেইসব স্তর বিভিন্ন সময়ে পরিণতি লাভ করে। সুতরাং তৃণলতা ও কীটপতঙ্গ মরার পরে পৃথিবীতেই পুনরুজ্জীবিত হয়, এ উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব।

এই তাফসির লেখার আগে আপনি যদি উদ্ভিদবিদ্যা (Botany) ও কীটবিদ্যার (Entomology) কোনো ছাত্র বা বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে নিতেন অথবা এ সংক্রান্ত কোনো বই পড়ে নিতেন, তাহলে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এমন মারাত্মক ভুল করতেন না। এমন তথ্যবহুল ও মর্যাদাপূর্ণ তাফসিরে এমন অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব বক্তব্য পড়ে যারা আপনার তেমন ভক্ত নয় অথবা যারা আপনার মনীষা ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অবহিত নয় বা তা স্বীকার করেনা, তারা আপনার অন্যান্য লেখাকেও এই মাপকাঠিতেই মূল্যায়ন করবে। আমি নিজে যতোটুকু জানি এবং জনৈক কীটবিশারদের সাথে পরামর্শক্রমে যা অবহিত হয়েছি, তার আলোকেই এ কথাগুলো নিবেদন করছি।

২. তাফহীমুল কুরআন সূরা আরাফের ৮৭নং টীকার কথাগুলো লক্ষণীয়, 'আল্লাহর হুকুমে লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া মোটেই বিস্ময়োদ্দীপক ব্যাপার নয়, যেমন বিস্ময়োদ্দীপক নয় সেই আল্লাহর হুকুমেই ডিমের ভেতরে অবস্থিত কতোক নির্জীব পদার্থের সাপে পরিণত হওয়া'।

উপরোক্ত বাক্যটিতে বিস্ময়োদ্দীপক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন না তুলেই বলছি, যে ডিমের ভেতর থেকে কোনো জীব জন্ম নেয়, যথা সাপ, মাছ, মুরগী, কবুতর, গোসাপ ইত্যাদি, সে ডিমের ভেতরকার পদার্থ নির্জীব হয়না। বরং অবশ্যই তা সজীব পদার্থ হয়ে থাকে। সে ডিমের ভেতরে সংশ্লিষ্ট নর ও নারী জাতীয় প্রাণীর মিলিত প্রজননবীজ বা ভ্রূণ (Ovumsperni) বিদ্যমান থাকে। নরের সাথে মিলন ছাড়াই নারী জাতীয় প্রাণী যে ডিম পাড়ে, সেটাই হলো নিষ্প্রাণ ভ্রূণ সম্বলিত ডিম। প্রচলিত ভাষায় একে মরা ডিম বলা হয়। এ ডিম থেকে কোনক্রমেই বাচ্চা জন্মাতে পারেনা। এই বাস্তবতার নিরিখে আপনার যুক্তি হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতাকে অবৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করা আরো উদ্ভট ব্যাপার।

জবাবঃ আপনি আমাকে শুধরে দেয়ার যে চেষ্টা করেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। সূরা নাহলের আয়াত সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো বর্ষাকালে যে সাধারণ দৃশ্য সচরাচর দর্শকরা উপভোগ করে থাকে, তার সাথেই এর সম্পর্ক। সেই সাধারণ দৃশ্যের ব্যাখ্যাই আমি করেছি।

আমার ব্যাখ্যার মূল ভাষা ছিলো, 'প্রতি বছরই এ দৃশ্য তোমাদের চোখে পড়ে যে, উষর ভূপৃষ্ঠ খা খা করছে, জীবনের কোনো চিহ্নই তাতে নেই। না আছে ঘাসপাতা তৃণলতা, না আছে শস্য ও ফলমূল। না আছে কুসুমকলি, আর না আছে কোনো ধরনের কীটপতঙ্গ। এমতাবস্থায় বৃষ্টির মৌসুম এলো। মাটির নিচে প্রোথিত অসংখ্য শেকড় ও মূল সহসা জীবন্ত হয়ে উঠলো এবং প্রত্যেকটির মধ্য থেকে সেইসব উদ্ভিদ আবার গজিয়ে উঠলো, যা আগের বর্ষায় জন্ম নেয়ার পর মরে গিয়েছিলো। গ্রীষ্মকালে যেসব কীটপ্রতঙ্গের নাম নিশানাও ছিলনা, হঠাৎ আগের বর্ষাকালে যেমন দেখা গিয়েছিলো, তেমনি জমকালোভাব আবার আত্মপ্রকাশ করলো...।'

তবে জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও কীটবিদ্যার আলোকে বিষয়টা নিয়ে আরো গভীর চিন্তাভাবনা করা যায় কিনা, সেটা একটা ভেবে দেখার মতো কথা বটে। এ ব্যাপারে আমি ইনশাআল্লাহ আপনার পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের কাছে জিজ্ঞাসা করবো। আপনাকেও অনুরোধ করছি, আপনি নিজের জানা তথ্যাবলি এবং আপনার তথ্যভিজ্ঞ বন্ধুদের মতামতের আলোকে আমাকে জানাবেন। আপনার অভিমতটা কি যথার্থই বিজ্ঞানসম্মত? 'স্বাভাবিক মৃত্যবরণের পর তৃণলতার মূল ও কীটপতঙ্গের বৃষ্টির পানি পেয়ে গজিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। বরং শুধুমাত্র সেইসব মূল ও কীটপতঙ্গই বেঁচে ওঠে, যাদের মধ্যে কোনো না কোনো আকারে প্রাণের অস্তিত্ব ছিলো', এ ধারণাটা কি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত? না এর পেছনে শুধু এই অনুমানই কাজ করছে যে, স্বাভাবিক মৃত্যুর পর কোনো কিছুর জ্যন্ত হওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন বৃষ্টির পর যে জিনিসই পুনরুজ্জীবিত হয়ে আবির্ভূত হয়, তা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু প্রাণের রেশ নিয়ে ঘুমিয়েছিলো।

'আররব্যুল খালি' নামে আরবের মরু অঞ্চলে যে উষরতম অঞ্চলটা রয়েছে, তা অনেক সময় পুরো দশ বছর ধরে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকে। গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চলের তাপমাত্রা ১২৪ ডিগ্রী থাকে ১৪০ ডিগ্রিতে গিয়ে ঠেকে। তা সত্ত্বেও সেখানে যখন বৃষ্টি হয়, তখন মরুভূমির বালুর উপরে ঘাস জন্মে যায় এবং কীটপতঙ্গ চলাচল করতে আরম্ভ করে। এ অঞ্চল ঘুরে দেখা অনেক পর্যটকই এ কথা জানিয়েছেন। ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে আমি যখন আরব জাহান সফর করতে করতে তাবুক পৌছলাম, ঘটনাক্রমে সেই দিনই সেখানে বৃষ্টি হলো। সেখানকার গভর্নর ও বিচারপতি আমাকে জানালেন, এবার পুরো পাঁচ বছর পরে বৃষ্টি হয়েছে। এরপর আমি যখন তাবুক ত্যাগ করে যাই তখন দেখি, আসার সময় যে মরুভূমি আমি একেবারেই উষর দেখে গেছি, তাতে ঘাস জন্মে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে কীটপতঙ্গ খুঁজে দেখার কথা আমার খেয়াল হয়নি বটে। তবে ঘাসতো আমার চোখের সামনেই বিরাজ করছিলো। প্রশ্ন হলো, পাঁচ দশ বছর ধরে ঘাসের শেকড় কোনো না কোনো পর্যায়ে প্রাণ ধারণ করে ভেতরে লুকিয়ে ছিলো এবং বৃষ্টি পেয়েই তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে, এটা কী কেবল আন্দাজ অনুমান? না সত্যিই কোনো পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, যে শেকড়গুলো বৃষ্টিতে জীবিত হয়েছে, তা ঐভাবে কোনো রকমে বেঁচে থাকা শেকড়ই? তাছাড়া বিজ্ঞান কি সত্যিই শেকড়ের

স্বাভাবিক মৃত্যু এবং তার সামান্যতম প্রাণের রেশ ধারণ করে বেঁচে থাকার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে সীমানা চিহ্নিত করতে পেরেছে।

কীটপতঙ্গ সম্পর্কেও আমার একই জিজ্ঞাসা। দীর্ঘ অনাবৃষ্টি ও প্রচণ্ড গরমের পর বৃষ্টি হলে মরুভূমির বালুতে যে কীটপতঙ্গ দেখা দেয়, তাদের সম্পর্কে কি অনুসন্ধান চালিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, তারা বৃষ্টির পূর্বে একেবারে মারা পড়েনি বরং যৎসামান্য জীবনের রেশ ধারণ করে কেবল অসাড় হয়ে পড়েছিলো, না এটা নিছক অনুমান? এ প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে আপনি যদি একটু আলোকপাত করেন, তাহলে আমি তাফহীমুল কুরআনে এ ধরনের বক্তব্য সম্বলিত সব ক'টি টীকার ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্যের ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা করতে পারবো। এ বিষয়টা নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গবেষণা চালানো প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস হলো, কিছু কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদকে আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীতেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করে থাকেন। যাতে করে মরণোত্তর জীবন যে ধ্রুব সত্য, সেটা প্রমাণ করা যায়। এ কারণে কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টির কল্যাণে মৃত পৃথিবীর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকে মরণোত্তর জীবনের প্রমাণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

লাঠি থেকে সাপ তৈরি হওয়ার মোজেজা সম্পর্কে আমি যা লিখেছি, সে সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আবার বিশ্লেষণ করছি। একটা প্রজননযোগ্য (Fertilized) ডিমের ভেতরে নর ও নারী ঘটিত যে সজীব প্রজনন বীজ বিদ্যমান থাকে, তাও একটা জড় প্রতিকৃতি ছাড়া কিছু নয়। তাতে যে জীবনীশক্তি থাকে, সেটা আল্লাহরই দেয়া। নচেত যে জড়পদার্থ দ্বারা তার দেহ নির্মিত, তা মূলত প্রাণহীন। পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে সাপ সচরাচর সেই ডিম থেকেই জন্মে, যার মধ্যে প্রথমে নরনারীর মিলন দ্বারা জড় প্রতিকৃতিতে জীবনীশক্তির সঞ্চার করা হয়। অতঃপর সেই প্রতিকৃতিতে পর্যায়ক্রমে বিকশিত করে সাপে পরিণত করা হয়। কিন্তু অলৌকিকভাবে লাঠি থেকে যে সাপ জন্ম নিলো, তাতে লাঠির জড় প্রতিকৃতিতে আল্লাহ সরাসরি সাপের প্রাণ সঞ্চার করলেন এবং তাকে সাপের আকৃতিও দিলেন। আমার যুক্তি হলো, লাঠি থেকে সরাসরি সাপ বানানো কেবল এজন্যই মোজেজা বলে গণ্য হয়েছে যে, এ ঘটনা প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম হিসেবে সংঘটিত হয়েছে। নচেত যে সাপ স্বীয় মা বাপের প্রজনন বীজ থেকে জন্মে, তাও মোজেজা বটে। ওটাকে আমরা স্বাভাবিক ব্যাপারে ভাবি বলেই আমাদের কাছে ওটা মোজেজা বা অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হয়না। (তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর: ১৯৬৮)

১১. নবী মহিষীদের উপর 'অসংযত কথাবার্তা বলার' দোষারোপ।

প্রশ্নঃ আপনি সূরা তাহরীমের আয়াত

إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّـهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ •

-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফহীমুল কুরআনে ওমর রা.-এর যে রেওয়ায়েত বুখারি ও মুসনাদে আহমদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তাতে ওমর রা.-এর উক্তি (স্বীয় কন্যা উম্মুল মুমিনীন হাফসা রা. কে لَا تُرَاجِعِي এর অনুবাদ, রসূল সা.-এর সাথে তুমি

'অসংযত কথাবার্তা বলো না' (তরজমানুল কুরআন, ভলিউম ৭২, সংখ্যা ৪, পৃ. ২২৩, শেষ ছত্র)) যদিও শুদ্ধ, তথাপি আমার অনুরোধ, আপনারা এ শব্দটা বদলানোর কথা ভেবে দেখবেন। কেননা বিকারগ্রস্ত লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে অন্যান্য অপবাদের পাশাপাশি এ অপবাদও খুব জোরেশোরে রটাচ্ছে যে, মাওলানা মওদূদী নবী মহিষীদেরকে 'অসংযতভাষিণী' বলে তাদের সাথে বেয়াদবী করেছেন। আমার পরামর্শ, আপনি যদি তাফহীমুল কুরআনে 'অসংযত কথাবার্তা বলো না' এর পরিবর্তে 'বাদানুবাদ করো না' বা 'তর্ক করো না' লিখে দেন, তাহলে অনুবাদেও তেমন হেরফের হবে না, আবার বিকারগ্রস্ত লোকেরা অপপ্রচারেরও সুযোগ পাবে না।

জবাব: ওমর রা.-এর রেওয়ায়েত থেকে এ কথাতো প্রমাণিতই হয়ে গেছে যে, নবী মহিষীগণ তাঁর সাথে বাদানুবাদ করা শুরু করে দিয়েছিলেন। এখন আপনি নিজেই বুঝতে পারেন, কোনো নিম্নপদস্থ লোক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির সাথে বাদানুবাদ করলে বা মুখে মুখে তর্ক করলে তাকে অসংযত ভাষণ ছাড়া আর কি বলা যায়? আর স্বয়ং রসূল সা.-এর সাথে এই আচরণ হলে তো কথাই নেই। তখন কেউ যদি নবী মহিষীদের মর্যাদা সম্পর্কে স্বয়ং রসূল সা.-এর চেয়েও বেশি উদ্বিগ্ন হন, তাহলে আমার আর বলার কিছু থাকে না। একথাতো এমনিতেই বুঝা যায় যে, নবী মহিষীদের আচরণ একটু বেশি রকম আপত্তিকর হয়ে উঠেছিলো বলেই প্রথমে ওমর রা. তাঁর মেয়ের উপর রেগে যান, অতপর একে একে মহিষীদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহর সম্ভাব্য গজবের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দেন। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়ে ২৯ দিন পর্যন্ত তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজের নিভৃত কক্ষে অবস্থান করেন। পরিস্থিতি এতোদূর গড়াতে দেখে সাহাবায়ে কেরাম উৎকণ্ঠিত হয়ে ভাবতে থাকেন, রসূল সা. তাঁর স্ত্রীদেরকে হয়তো তালাকই দিয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও কুরআনে তাঁদেরকে হুঁশিয়ার করে দেন। এখন এ ঘটনাটা যদি নিছক মুখোমুখি তর্ক বা বাদানুবাদ করার মতো নগণ্য ব্যাপার হতো, তাহলে আমার প্রশ্ন হলো, আমার ভাষা নিয়ে যারা আপত্তি তুলছেন, তারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কি মত পোষণ করেন যে, তিনি এমন একটা ক্ষুদ্র ব্যাপারে একেবারে একটা আয়াত নাযিল করে ফেললেন, তারা কি রসূল সা. কে (নাইজুবিল্লাহ) এতোই রগচটা মনে করেন যে, একটা মামুলী ব্যাপার নিয়ে তিনি স্ত্রীদের উপর এতো ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন? ওমর রা. কেই বা তারা কি ভাবেন যে, সামান্য একটা ব্যাপারে নিজের মেয়েকে ধমকালেন এবং একে একে নবী মহিষীদের প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখালেন? এসব ব্যাপারতো কুরআন ও হাদিস থেকেই প্রমাণিত। আমার অপরাধ শুধু আমি এগুলো উদ্ধৃত করেছি। আপত্তিকারীদের কথা আর কি বলবো। আমার প্রত্যেক কথায় খুঁত ধরাই তাদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য আমি স্থির করেছি, তাদের কোনো কথাতেই আর কর্ণপাত করবো না। যতোদিন তাদের ইচ্ছা নিজেদের আমলনামাকে কলুষিত করতে থাকুক। (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর: ১৯৭০)

১২. সামুদ জাতির আবাসভূমি।

প্রশ্ন: ১. ডক্টর নিকলসন 'এ লিটারারি হিস্ট্রী অব দি আরাবস' (আরব জাতির সাহিত্যিক ইতিহাস) নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে 'সামুদের কাহিনী' শিরোনামে মন্ত ব্য করেছেন, 'কুরআনে সামুদের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে যে, তারা পর্বত কেটে বাড়ি বানিয়ে তাতে বাস করতো। এইসব খোদাইকৃত গুহা আজও হিজর (মাদায়েনে সালেহ) অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। তবে মুহাম্মদ যে ঐসব গুহার সঠিক পরিচয় জানতেন না, তা সুস্পষ্ট। এগুলো মদিনা থেকে উত্তর দিকে এক সপ্তাহের দূরত্বে অবস্থিত। এসব গুহার উপর নাবতী ভাষায় যেসব শিলালিপি অংকিত রয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয়, এগুলো বসতবাড়ি নয় বরং কবর।' (পৃ. ৩) **এ ব্যাপারে আপনার গবেষণালব্ধ তথ্য জানিয়ে অধমকে সংশয়মুক্ত করবেন এই প্রত্যাশ্যা রইলো।**

জবাব: বেচারা নিকলসনের এও জানা নেই যে, রসূল সা. নবুওয়তের আগেও একাধিকবার সামুদ জাতির বসতবাড়ি সম্বলিত এ অঞ্চলের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেছিলেন। আবার নবুয়তের পরেও তবুক অভিযানকালে তিনি ও তাঁর সেনাবাহিনী এ স্থান অতিক্রম করেছিলেন। সামুদের এলাকা যে এটাই এবং সামুদের লোকেরাই যে পাহাড় খোদাই করে এসব বাড়িঘর নির্মাণ করেছিলো, সে কথা তৎকালীন আরববাসী বিলক্ষণ জানতো। জানতো বলেই কুরআনের বর্ণিত এ ইতিহাসকে তৎকালীন আরববাসী কখনো চ্যালেঞ্জ করেনি।

আমি নিজে হিজর অঞ্চলে সামুদদের ভবনগুলো দেখেছি। আমি নাবতী অঞ্চলেও গিয়েছি এবং তাদের অট্টালিকা দেখেছি। উভয়ের নির্মাণ কৌশলে আকাশপাতাল ব্যবধান। সামুদ জাতির ইমারতগুলোতে নাবতী ভাষার শীলালিপি রয়েছে শুধুমাত্র এই যুক্তিতে তাকে নাবতীদের ইমারত বলা চলে না। এমনও হতে পারে যে, পরবর্তীকালে যখন এ অঞ্চল নাবতীদের দখলে এসেছে, তখন তারা ওগুলোর উপর নিজেদের লিপি খোদাই করে দিয়েছে।

প্রশ্ন: ২. আপনার জবাবি পত্র পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনার বক্তব্য থেকে আমি চিন্তা গবেষণার প্রচুর খোরাক পেয়েছি। তবুও আমার মনে হচ্ছে, গতবারের চিঠিতে আমি আমার বক্তব্য পুরোপুরিভাবে তুলে ধরতে পারিনি। ইমারতগুলো সামুদের না নাবতীদের, সেটা আসল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলনা। নিকলসনও এটা অস্বীকার করেনি যে রসূল সা. এ সব ভবন প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং আরবরা এগুলোকে সামুদের তৈরি বলে স্বীকার করতো। এমনকি এগুলো যে সামুদের তৈরি ভবন, তা নিকলসন নিজেও অস্বীকার করেন না। আসল ব্যাপার হলো, কুরআনে এগুলোকে 'বুয়ূত' (ঘর) বলা হয়েছে।

সাধারণভাবে যদিও এর অর্থ ভবন মনে করা যেতে পারে (যা যে কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে), তবুও নিকটতম ধারণা এটাই জন্মে যে, এগুলো আবাসিক ঘর বা বাড়ি। নিকলসনের বক্তব্য হলো, এগুলো বাড়ি নয় বরং কবর। ইতিমধ্যে আমি আরো কিছু পড়াশুনা করে জানতে পেরেছি, নিকলসন এ বক্তব্য দিয়েছেন ডাওটীর (Doughty) বরাত দিয়ে। ইংরেজ পরিব্রাজক ডাওটী ১৮৭৫ সালে হাজী কাফেলার

সাথে ভ্রমণ করার সময় হিজর অঞ্চলে যাত্রাবিরতি করে, এ ভবনগুলোর চিত্র আঁকেন এবং তার উপর খোদাইকৃত লিপিগুলো লিখে নিয়ে ফ্রান্সের প্রখ্যাত সেমিটিক ভাষাবিদ জোসেফ রিনাকে পাঠিয়ে দেন। এরপরে কি হয়েছে আমি জানতে পারিনি। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, এই ব্যক্তির বরাত দিয়েই নিকলসন বলেছেন, কুরআনে বুয়ুত শব্দ দ্বারা বর্ণিত এই ভবনগুলো যে আসলে সমাধি তা প্রমাণিত হয়েছে।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ যা বলেছেন সেটাই সঠিক। এর বিপরীতে যে যাই বলুক, তা অবশ্যই কোনো না কোনো ভুল বুঝাবুঝির ফল। তথাপি যখন কোনো ব্যক্তি নিরেট তাত্ত্বিক পর্যায়ে ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী থেকে প্রমাণ দর্শিয়ে কোনো বিতর্কিত বক্তব্য উপস্থাপিত করেন, তখন ঠিকই সেই পর্যায়েই তার অনুসন্ধান চালিয়ে তাকে খণ্ডন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বিস্ময়ের ব্যাপার, নিকলসনের এই বই দীর্ঘকাল যাবত আমাদের এ অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ প্রতিবছর স্বচক্ষে এই শিলালিপিগুলো দেখতে ও উদ্ধৃত করতে সক্ষম। অথচ আজ পর্যন্ত কেউ তাত্ত্বিক পন্থায় এই বিভ্রাট নিরসন করতে এগিয়ে এলো না।

আপনি তাফহীমুল কুরআনে সামূদ ও তাদের ইমারতগুলো সম্পর্কে যেসব তথ্য উপস্থাপিত করেছেন, তার কিয়দংশ (কিয়দংশ এ জন্য বলছি যে, আমি পুরো তাফহীম পড়ে দেখিনি) সম্প্রতি আমি পড়েছি। আমার মনে হয়, এছাড়াও আপনি এ সমস্যার ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারেন। একবার আপনি এগুলোর ছবি তোলার অভিযানও চালিয়েছিলেন। সেই সব ছবির অনেকটা আমি দেখেছিও। তাতে ঐসব ইমারতেরও ছবি ছিলো। প্রশ্ন হলো, ঐসব ইমারতে খোদাইকৃত শিলালিপির কোনো আলাদা ছবি উদ্ধার করা যায় কিনা। এসব শিলালিপির সংখ্যা কত হবে? তা কোন্ ভাষায় লিখিত? কোন্ বর্ণমালায়? আমরা কি কোনো ভাবে তার পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম? সত্যিই কি এ কথা প্রমাণিত হয় যে, এগুলো কবর? যদি হয় তাহলে কুরআনের বক্তব্যের সাথে তার সমন্বয় কিভাবে হতে পারে? কুরআন থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, ওগুলো আবাসিক ভবন? তা যদি হয়, তাহলে তাতে সমাধিসূচক শিলালিপি খোদাই হলো কেন?

আপনার ধারণা যে, হয়তো নাবতীরা পরে এসে এসব লিপি খোদাই করে দিয়েছে। এ অনুমান চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম। তবে এ ব্যাপারেও গবেষণামূলক তথ্যানুসন্ধান অপরিহার্য। কুরআনের সত্য ভাষণের পক্ষে একটা অকাট্য প্রমাণ সংগৃহীত হোক এবং প্রাচ্যবিদদের বিভ্রান্তিকে নিরেট তাত্ত্বিক পর্যায়ে খণ্ডন করা হোক, এটাই আমার কাম্য।

জবাবঃ আমি কুরআনে বর্ণিত ভূখণ্ডগুলোতে সফর করার আগে ডাওটীর ভ্রমণকাহিনীটা সম্পূর্ণরূপে পড়েছিলাম। ডাওটী সামূদ নির্মিত ভবনগুলোর ব্যাপারে কুরআন ও রসূল সা. সম্পর্কে যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেছে, সেটা নজরে রেখে আমি আল হিজর ও মাদায়েনে সালেহ অঞ্চলে গিয়ে সামূদের ভবনগুলো দেখেছি। অতঃপর নাবতী অঞ্চলে গিয়ে নাবতীদের নির্মিত ইমারতগুলোও পরিদর্শন করেছি। উভয় ধরনের ইমারতগুলোর আমি ছবি নিয়েছি এবং তাফহীমুল কুরআন তৃতীয় খণ্ডে

(উর্দু) তা ছেপে দিয়েছি, যাতে সামুদ ও নাবতীদের নির্মাণ কৌশলে পার্থক্য কি, তা যে কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে। সামুদ জাতি এবং নাবতী জাতি উভয়েই নিজ নিজে যুগে পাহাড় খোদাই করে ভবন নির্মাণ করেছিলো। সামুদের শত শত বছর পরে আবির্ভাব ঘটে নাবতীদের। এজন্য তাদের আমলে পাহাড় খোদাই করে ঘর নির্মাণের শিল্পের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়। সামুদ অঞ্চলে যে সব ভবন রয়েছে তার কতকগুলো এমন যে, তা দেখে মনে হয় ওগুলো হয়তো বা সংসদ ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। কোনো কোনোটা দুই তিন কক্ষ বিশিষ্ট। সম্ভবত সেগুলো বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হতো। কোনো কোনোটায় একটি মাত্র ছোট বা বড় কক্ষ রয়েছে। এগুলো শুরুতে কবর হিসেবে তৈরি হয়েছে এমন কোনো লক্ষণ সেখানে আমার চোখে পড়েনি। এর শত শত বছর পর যখন নাবতীরা এ অঞ্চল দখল করে, তখন তারা ওগুলোকে কবর হিসেবে ব্যবহার করেও থাকতে পারে। তবে বর্তমানে সেখানে কবর ধরনের কোনো জিনিস পাওয়া যায় না।

শিলালিপিসমূহের ভাষা ও বর্ণমালা সম্পর্কে এ কথা বুঝে নেয়া দরকার যে, প্রাচীন সেমেটিক ভাষা ও বর্ণমালাসমূহ পরস্পর থেকে গৃহীত এবং পরস্পরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রীতিতে চলে আসছিলো। সামুদী, লিহইয়ানী ও নাবতী ভাষা ও লিখন রীতিতে সামান্য প্রভেদ ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে হয়ে চলেছে। আরব নৃতত্ত্ব গবেষকদের পক্ষে নির্ভেজাল সামুদী কোন্‌টি, নাবতী কোন্‌টি এবং লিহইয়ানী কোন্‌টি তা নির্ণয় করা খুবই অসাধ্য হয়ে পড়েছে। সামুদ নির্মিত ভবনগুলোতে পরে নাবতীরা অথবা তাদের আগে লিহইয়ানীরা কিছু শিলালিপি খোদাই করে থাকতে পারে, আবার কিছু শিলালিপি শুরুতে স্বয়ং সামুদরাও লিখে থাকতে পারে। নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট করে আমরা বলতে পারিনা, এগুলো কাদের লেখা। এ সম্পর্কে ডক্টর জাওয়াদ আলী তার 'প্রাগৈসলামিক আরবদের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আপনি তাফহীমুল কুরআন সূরা শুয়ারা ৯৯নং টীকা ও ছবি দেখলে প্রকৃত ব্যাপারে উপলব্ধি করতে পারবেন। (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর: ১৯৭১)

১৩. মানুষের দেহে মানব সৃষ্টির উপাদানের উৎস কোথায় অবস্থিত?

প্রশ্ন: আমি একজন চিকিৎসক। সেপ্টেম্বর মাসের তরজমানুল কুরআনে আপনি সূরা তারেকের ৫ম থেকে ৭ম আয়াতের যে অনুবাদ ও তাফসির করেছেন তা আমার বোধগম্য হয়নি। অনুবাদ এরূপ, 'মানুষ শুধু এটাই দেখুক যে, কি দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সবেগে স্খলিত পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা বক্ষ ও পাঁজরের হাড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে।'

এর টীকায় আপনি যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা আমি মনোযোগ দিয়ে অনেকবার পড়েছি, কিন্তু আমার বুঝে আসেনি। বাস্তব পর্যবেক্ষণ থেকে যতোটা জানা যায়, তাতে এ উপাদানটির জন্ম অণ্ডকোষ (Testicle) থেকে। জন্মের পর তা সরু সরু নালীর মধ্যে দিয়ে বড় নালীতে গিয়ে সেখান থেকে পেটের পাশে অবস্থিত পাঁজরের হাড়ের ঠিক সমান্তরাল এক নালীর (Inginal canal) ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নিকটেরই একটি গ্রন্থিতে প্রবেশ করে। এটি মূত্রাশয় ও মূত্রনালীর চারপাশে অবস্থিত

গ্রন্থি। এর নাম প্রোস্টাট (Prostate)। অতঃপর সেখান থেকে পিচ্ছিল পদার্থে মিশ্রিত হয়ে নির্গত হয়। বুকের হাড় ও পাঁজরের হাড়ের মধ্যে দিয়ে তা কিভাবে বেরোয় আমি বুঝতে পারলাম না। তবে এ কথা সত্য যে, বুকের হাড় ও পাঁজরের হাড়ের মাঝখানে জালের আকারে ছড়ানো একটা স্নায়ুতন্ত্রী দ্বারা এটি নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে এই নিয়ন্ত্রণও আংশিক। মস্তিষ্কে অবস্থিত একটি গ্রন্থির পিচ্ছিল পদার্থ দ্বারাও এর নিয়ন্ত্রণ কার্য সম্পাদিত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় হলো নির্গত হওয়া, যা একটা নালী দ্বারাই হতে পারে। আমার অনুরোধ, আপনি এর প্রকৃত ব্যাখ্যা কি হবে বিস্তারিতভাবে লিখবেন। (আমাকে মাফ করবেন) আপনাকে কষ্ট দিয়েছি শুধু এ জন্য যে, আপনি বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বে আস্থাশীল।

জবাবঃ ডাক্তার হিসাবে এ কথা আপনার আরো ভালোভাবে বুঝতে পারার কথা যে, শরীরের বিভিন্ন অংশের কাজ (Function) আলাদা আলাদা হলেও কোনো অংশই বিচ্ছিন্নভাবে ও একাকী কোনো কাজই করেনা। বরং অন্যান্য অংশের সহযোগিতাক্রমেই (Co-operation) নিজের করণীয় কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। নিঃসন্দেহে অণ্ডকোষই বীর্যের উৎপত্তিস্থল এবং সেখান থেকে তা নির্গতও হয় একটা বিশেষ পথ দিয়ে। কিন্তু পাকস্থলী, কলিজা, ফুসফুস, হৃদপিণ্ড, মূত্রাশয় ও মস্তিষ্ক যদি নিজ নিজ ভূমিকা পালন না করে, তাহলে বীর্য উৎপাদন ও নির্গমনের এই প্রক্রিয়া বিচ্ছিন্নভাবে কি নিজের কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম? উদাহরণস্বরূপ আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন। প্রস্রাব তো মূত্রাশয়েই উৎপন্ন হয় এবং একটা নালীর মাধ্যমে তা মূত্রথলিতে গিয়ে সেখান থেকে মূত্রনালী দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু কিসের পরিণতিতে তা হয়? যে সব অঙ্গ রক্ত উৎপাদন করে এবং তাকে সমগ্র দেহে ঘুরিয়ে মূত্রাশয় পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, সেগুলো যদি নিজ নিজ কাজ না করে, তাহলে মূত্রাশয় একাকী রক্তের মধ্য থেকে প্রস্রাবের উপাদানগুলোকে পৃথক করে মূত্রথলিতে পাঠাতে পারে কি? এ জন্যই কুরআনে এ কথা বলা হয়নি যে, মানব সৃষ্টির এ উপাদানটি পাঁজরের হাড় ও বুকের হাড় থেকে বের হয়। বরং বলা হয়েছে, উভয় হাড়ের মাঝখানে শরীরের যে অংশ অবস্থিত তা থেকে এ উপাদান বের হয়। এ কথা দ্বারা এটা অস্বীকার করা হয় না যে, বীর্য উৎপাদন ও নির্গমনের একটা বিশেষ প্রক্রিয়া (Mechanism) রয়েছে, যা শরীরের কয়েকটা নির্দিষ্ট অংশ দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ কথা দ্বারা বরঞ্চ এটাই বুঝা যায় যে, এ প্রক্রিয়া স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আল্লাহ পাঁজরের হাড় ও বুকের হাড়ের মাঝখানে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রেখে দিয়েছেন, সেগুলোর সামষ্টিক কর্মকাণ্ডের ফলেই এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ জন্যই আমি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখ করেছি যে, সমগ্র দেহ এ প্রক্রিয়ার অংশীদার নয়। কেননা হাত ও পা কাটা গেলেও এ প্রক্রিয়া চালু থাকে। তবে বুকের হাড় ও পাঁজরের হাড়ের মাঝখানে যে প্রধান অংগপ্রত্যংগ রয়েছে, তার কোনো একটাও যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে এ কার্যক্রম চালু থাকতে পারে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমার এ বিশ্লেষণে কোনো ভুল থাকলে অনুগ্রহপূর্বক সেটা আমাকে অবহিত করবেন। (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বরঃ ১৯৭১) পুনশ্চঃ আরো দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, শেষ খণ্ড, পরিশিষ্ট ৪।

১৪. তাফহীমুল কুরআনে 'আলহামদুলিল্লাহ' -এর অনুবাদ।

প্রশ্ন: তাফহীমুল কুরআনে আপনি 'আলহামদুলিল্লাহ'র অনুবাদ করেছেন: (উর্দু) (প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। অথচ প্রাচীন ও আধুনিক অনুবাদকগণ এর অনুবাদ করেছেন: (উর্দু) (যাবতীয় সদগুণাবলী আল্লাহর) (উর্দু) (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদ কিছুটা অসম্পূর্ণ ও অতৃপ্তিকর মনে হয়।

জবাব: উর্দু ভাষায় (উর্দু) (আল্লাহর জন্য প্রশংসা) এবং (উর্দু) (প্রশংসা আল্লাহর জন্য) এ দুই ধরনের বাক্যের অর্থের দিক দিয়ে অনেক পার্থক্য রয়েছে। প্রথমোক্ত বাক্যের অর্থ হবে শুধু অন্যের জন্য যেমন প্রশংসা হতে পারে, তেমনি আল্লাহর জন্যও প্রশংসা আছে। কিন্তু যখন দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারিত হবে তখন তার অর্থ হবে, প্রশংসা বলতে যা কিছু বুঝায় তা কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট, অন্য কারোর এ প্রশংসা প্রাপ্য নয়। আমি যে অনুবাদ করেছি, তাতে অবিকল 'আলহামদুলিল্লাহ' বাক্যটিতে যা বুঝানো হয়েছে সেটাই বুঝাতে চেষ্টা করেছি। অন্যান্য অনুবাদকগণ 'যাবতীয় সদগুণাবলী আল্লাহ'র অথবা 'সকল প্রশংসা আল্লাহর' এবং এ ধরনের অন্যান্য বাক্য দ্বারা যে তাৎপর্য ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, আমার গৃহীত এ বাচনভঙ্গী দ্বারা এই তাৎপর্যই আরো সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। (তরজমানুল কুরআন, মার্চ: ১৯৭৫)

১৫. প্রাচীন আরবদের মধ্যে 'বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা'র حروف مقطعات ব্যবহার প্রথা।

প্রশ্ন: তাফহীমুল কুরআনের কতিপয় সূরার প্রারম্ভে ব্যবহৃত 'বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা' সম্পর্কে আপনি লিখেছেন যে, এ বাকরীতি জাহিলিয়াত যুগের কবিদের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত ছিলো। পরে তা পরিত্যক্ত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কয়েকটা প্রশ্ন তুলছি।

১. জাহিলিয়াত যুগের কবিদের কবিতায় ও বাগ্মীদের বক্তৃতায় কি এর উদাহরণ পাওয়া যায়?

২. সাহাবায়ে কেরামের কথাবার্তায় কি এর সমর্থন পাওয়া যায়?

৩. বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার ব্যবহার যদি পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তাহলে এ বাকরীতি প্রাঞ্জল আরবি সংক্রান্ত দাবির পরিপন্থী নয় কি?

জবাব: حروف مقطعات তথা বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা সম্পর্কে বিস্তারিত পড়াশুনার সুযোগ যদি আপনার না থেকে থাকে, তাহলে অন্তত প্রখ্যাত আরবি অভিধান 'লিসানুল আরব' প্রথম খণ্ডে حروف مقطعات এর ব্যাখ্যা সংক্রান্ত অধ্যায়টিই পড়ে দেখুন। এতে প্রথমত আপনি তাফসিরকারগণ যে এর বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা করেছেন, তা জানতে পারবেন। দ্বিতীয়ত প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ হুজ্জায-এর এ উক্তি আপনি দেখতে পাবেন যে, আরবরা কখনো কখনো একটা অক্ষর উচ্চারণ করে এমন কোনো শব্দ বুঝাতেন, যার ভেতরে ঐ অক্ষরটা থাকতো। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি নিম্নের কবিতা ছত্র তুলে ধরেছেন।

قلت لها قفى فقالت ق এখানে ق দ্বারা اقف বুঝানো হয়েছে। ছত্রটির অর্থ দাঁড়ায়, 'আমি তাকে বললাম দাঁড়াও। সে বললো দাঁড়াচ্ছি।' তিনি আরো একটি কবিতাংশ দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরেছেন।

ناديهم ان الجمعوا الا تا – قالوا جميعا كلهم الا فا

এখানে ا لا ت অর্থ الاتركبون এবং الا فا এর অর্থ الافاركبوا 'অর্থাৎ আমি কাফেলাকে সম্বোধন করে বললাম, তোমরা রওনা হবে নাকি? তখন সকলে বললো, চলো রওনা হই।'

এ থেকে বুঝা যায়, প্রাচীন আরবদের মধ্যে এ বাক্যরীতির প্রচলন ছিলো। তাই তারা এ ধরনের অক্ষরগুলোর সংকেত বুঝে নিতো। এ জন্যই কুরআন নাযিল হওয়ার সময় কোনো আরব এসব অক্ষর ব্যবহারে আপত্তি তুলেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে এ রীতি অচল হয়ে পড়ায় কুরআনের حروف مقطعات এর মর্ম উদ্ধার করা অর্থাৎ কোনো অক্ষর দ্বারা কি শব্দ বুঝাচ্ছে, তা নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এ জন্যই এগুলোর ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ হয়েছে এবং কোনো একটা নির্দিষ্ট ব্যাখ্যার উপর মতৈক্য স্থাপিত হতে পারেনি।

এখন প্রশ্ন ওঠে, কুরআনের এতো বেশি সংখ্যক জায়গায় এ ধরনের অজ্ঞাত অর্থ বিশিষ্ট অক্ষরের ব্যবহার দ্বারা কুরআনের একটা সহজবোধ্য গ্রন্থ হওয়ার দাবি কি অবাস্তব হয়ে যায় না? এর জবাব হলো, কুরআনে মানুষকে যে হেদায়াত দেয়া হয়েছে, এসব অক্ষরের অর্থ না জানাতে তার কোনো অসুবিধা হয় না। এতে যদি বিন্দুমাত্রও অসুবিধা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে আল্লাহ নিজেই এর ব্যাখ্যা করে দিতেন অথবা রসূল সা.-এর দায়িত্ব পালন করতেন। (তরজমানুল কুরআন, আগষ্টঃ ১৯৭৫)

১৬. আবু বকর রা. ও ওসমান রা. -এর আমলে কুরআন সংকলন।

প্রশ্নঃ সেপ্টেম্বর মাসের তরজমানুল কুরআনে রাসায়েল ও মাসায়েল পড়ে একটা সংশয়ের শিকার হয়েছি। আশা করি আপনি এ সংশয়ের নিরসন করে আমাকে শান্তি দেবেন।

'রদবদল' এর সুস্পষ্ট উদাহরণ প্রসঙ্গে আপনি লিখেছেন, কুরআন নানা রকমের জিনিসে লিখিত ছিলো এবং তা একটা থলিতে রক্ষিত ছিলো। রসূল সা. সেগুলোকে সূরার ধারাবাহিকতা অনুসারে কোথাও এক জায়গায় লিপিবদ্ধ করে রাখেননি। আপনি এও লিখেছেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের বহু সংখ্যক হাফেজ শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। প্রশ্ন হলোঃ

১. হাফেজরা কি কোনো ধারাক্রম অনুসারে কুরআন কণ্ঠস্থ করতেন, না ধারাক্রম ছাড়াই করতেন?
২. এই ধারা বিন্যাসের কাজটা কি আবু বকর রা.-এর আমলে হয়েছে?
৩. ধারা বিন্যাস যদি রসূল সা.-এর কৃত ধারা বিন্যাস অনুসারেই হয়ে থাকে, তাহলে আর রদবদল কিভাবে হলো?
৪. আল্লাহ যে কুরআনের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন সেটা কি?

অনুরূপভাবে 'হ্রাসকরণ' এর উদাহরণ প্রসঙ্গে আপনি লিখেছেন, কুরআন সাত রকমের আঞ্চলিক ভাষায় নাযিল হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পঠনে হেরফের হওয়ার কারণে শুধুমাত্র কুরাইশদের ভাষায় লিখিত কপি সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং বাদবাকি সকল কপি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, আল্লাহ কি বাকি ছয়টি কপির হেফাজত করলেন না এবং তাকে নষ্ট হয়ে যেতে দিলেন? অথচ আল্লাহ কুরআনের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন।

জবাবঃ রাসায়েল ও মাসায়েলের আলোচনা পড়ে আপনার মনে যে সংশয় জন্মেছে, নিম্নের কথাগুলো ভালোভাবে বুঝে নিলে তা সহজে নিরসন হতে পারে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় কুরআনকে পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত রেখে গিয়েছিলেন। প্রথমত তা হাফেজদের বুকে সংরক্ষিত ছিলো পূর্ণাঙ্গভাবে ও সুবিন্যস্তভাবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রসূল সা.-এর কাছ থেকে শুনে তারা মুখস্থ করে রেখেছিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি লিখিতভাবেও তা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে এটা ছিলো বিচ্ছিন্ন কিছু টুকরোর উপর লিখিত, ধারাবাহিক বইয়ের আকারে নয়। কোনো কোনো সাহাবি এর অংশবিশেষ নিজ উদ্যোগে লিখে রাখেন। তবে সমগ্র কুরআন কারো কাছেই লিখিতভাবে বর্তমান ছিলনা। অনেকে কুরআনের বিভিন্ন অংশ মুখস্থও করে রেখেছিলেন। তবে পুরো কুরআন মুখস্থ করেছিলেন এমন লোকের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। এ কারণেই আবু বকর রা.-এর আমলে যখন বেশ কিছু সংখ্যক হাফেজ শহীদ হয়ে গেলেন তখন ওমর রা. এই ভেবে শংকিত হয়ে পড়লেন যে, কুরআনের হাফেজরা এভাবে শহীদ হতে থাকলে এবং উম্মতের কাছে কেবল বিক্ষিপ্ত টুকরোয় লিখিত ও আংশিকভাবে কণ্ঠস্থ কুরআন থেকে গেলে কুরআনের একটা বিরাট অংশ হারিয়ে যেতে পারে। কেননা পরিপূর্ণ ধারাবাহিক কুরআন কেবল হাফেজদেরই মুখস্থ ছিলো।

এ আশংকার ভিত্তিতে যখন ওমর রা. আবু বকর সিদ্দিক রা.-কে সমগ্র কুরআন একটা বইয়ের আকারে সংকলিত করার পরামর্শ দিলেন, তখন প্রথমে তিনি খানিকটা দ্বিধান্বিত হয়ে বলেন, রসূল সা. নিজে যে কাজ করেননি, তা আমি কিভাবে করি? অতঃপর উভয়ে একমত হয়ে যখন যায়েদ বিন সাবেত রা.-কে কুরআন সংকলনের কাজ সম্পন্ন করতে বললেন, তখন যায়েদও অনুরূপ দ্বিধা প্রকাশ করেন। আবু বকর রা. ও যায়েদ রা.-এর দ্বিধান্বিত হওয়ার যুক্তি ছিলো, কুরআন সংরক্ষণের জন্য হাফেজদের হাফিজীর উপর নির্ভর করা এবং একখানা বইয়ের আকারে তাকে একত্রিত ও সংকলিত না করাটাই রসূল সা.-এর সুন্নত। এ সুন্নতকে পাল্টে দেয়া আমাদের জন্য কিভাবে বৈধ হতে পারে। কিন্তু ওমর রা. যখন এই যুক্তি দিলেন যে, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ এতেই নিহিত, তখন উভয়ে তাতে সম্মত ও আশ্বস্ত হলেন। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ওই যুক্তিতে যদি রসূল সা.-এর অনুসৃত কর্মপন্থা থেকে ভিন্নতর পন্থায় কোনো কাজ করার অবকাশ শরিয়তে একেবারেই না থাকতো, তাহলে আবু বকর রা. ও ওমর রা. তা কেমন করে বৈধ বলে গ্রহণ করতে পারতেন? আর তাদের এ পদক্ষেপকে সমগ্র উম্মতই বা কেমন করে সর্বসম্মতভাবে মেনে নিতে পারতো?

আমি এ ব্যাপারটাকে যে 'রদবদল' এর দৃষ্টান্ত হিসাবে আখ্যায়িত করেছি, সেটা এ অর্থে নয় যে, আবু বকর রা. ও তাঁর সহচরগণ কুরআনের বচন ও বিন্যাসে 'রদবদল' ঘটিয়েছিলেন (নাউজুবিল্লাহ!)। বরং ওমর রা-এর পরামর্শের জবাবে আবু বকর রা. ও যায়েদ রা. প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় যে পরিবর্তনের কথা ধ্বনিত হয়েছিল, আমার

কথায়ও সেটাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হাফেজদের উপর নির্ভর করতে ও বইয়ের আকারে সংকলন থেকে বিরত থাকার নীতির রদবদল।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হলো, কুরআন আসলে তো কুরাইশদের ভাষায় নাযিল হয়েছিল এবং প্রাথমিক নির্দেশও এটাই ছিলো যে, কুরাইশদের ভাষাতেই তা পড়তে ও পড়াতে হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআন সংরক্ষণের যে ওয়াদা করা হয়েছিল, তা এই কুরাইশী ভাষায় নাযিলকৃত কুরআন সম্পর্কেই। কিন্তু হিজরতের পর রসূল সা.-এর আবেদনক্রমে কুরাইশদের ভাষা ব্যতীত আরবের অন্য ৬টি আঞ্চলিক ভাষাতেও কুরআন নাযিল করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের যাতে নিজ নিজ অঞ্চলের উচ্চারণ ও বাকরীতি অনুসারে কুরআন পড়ার সুবিধা হয়, সে উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়। কুরআনের বহুল প্রচারকে সহজতর করার লক্ষ্যে সাময়িকভাবে এই নমনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এ ব্যবস্থা চিরস্থায়ীভাবে বহাল রাখা যেমন অভিপ্রেত ছিলনা, তেমনি আরবের সাত সাতটি আঞ্চলিক ভাষাতেই সারা দুনিয়ায় কুরআনকে পৌঁছাতে হবে, এটাও কাম্য ছিলনা। কিন্তু কাম্য না হলেও এটা একটা বাস্তব সত্য যে, সে সময় আল্লাহর তরফ থেকে দেয়া এই সুবিধাটা রসূল সা.-এর আমলে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বহাল ছিলো। এটাকে বাতিল বা রহিত করার কোনো আদেশ আল্লাহর তরফ থেকেও দেয়া হয়নি, রসূল সা.-এর মুখ দিয়েও উচ্চারিত হতে শোনা যায়নি। এ সুবিধা কেবল ওসমান রা-এর আমলে বাতিল করা হয়। যখন দেখা গেলো, সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় কুরআনের রকমারি পঠন মুসলমানদের জন্য বিশেষত অনারব নব্য মুসলমানদের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক ও বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন আমীরুল মুমিনীন ওসমান রা. মুসলিম জাতিকে ফেৎনা থেকে এবং আল্লাহর কিতাবকে শাব্দিক বিভেদ থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র কুরাইশী আরবিতে কুরআনের কপি লিপিবদ্ধ করে মুসলিম জগতের কেন্দ্রস্থলগুলোতে ছড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং অন্যান্য ছয়টি আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলার ফায়সালা করলেন। যাতে কখনো ইসলামের কোনো শত্রু কুরআনের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সেগুলোকে ব্যবহার করতে না পারে। সাতটি নাযিলকৃত আঞ্চলিক ভাষা থেকে ছয়টিকে রহিত করা যে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিলো, সে কথা বলাই বাহুল্য। শরিয়তে যদি এ কাজটির অবকাশ না থাকতো তাহলে ওসমান রা. ও এমন পদক্ষেপ নিতে পারতেন না, আর সমগ্র উম্মতও এটিকে মেনে নিতে পারতো না। (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বরঃ ১৯৭৫)

১৭. সাবা সাম্রাজ্যে বাঁধভাঙ্গা বন্যা কবে সংঘটিত হয়েছিল?

প্রশ্নঃ ১. তাফহীমুল কুরআনে আপনি বাঁধভাঙ্গা বন্যা সংঘটিত হওয়ার সময় ৪৫০ ঈসায়ী বলেছেন। কিন্তু এ তথ্য আপনি কোত্থেকে পেলেন (অর্থাৎ এর উৎস কি) তা বলেননি।

২. 'আরদুল কুরআন' (কুরআনের স্থানসমূহ) গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার আগেও কোনো কোনো গ্রন্থে এটিকে ৪৫০ ঈসায়ীর ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই 'আরদুল কুরআন' প্রকাশিত হওয়ার পরই ৪৫০ ঈসায়ীতে ঐ বন্যা সংঘটিত হওয়ার তথ্য জানা গেছে, এ কথা বলা চলে না। নিকলসনের 'আরব সাহিত্যের ইতিহাস'

গ্রন্থও এই প্রলংকরী বন্যাকে ৪৪৭ অথবা ৪৫০ ঈসায়ীর ঘটনারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু একাধিক কারণে এ তথ্য সন্দেহজনক।

৩. তাফহীমুল কুরআনসহ কুরআনের বিভিন্ন তাফসির নির্দিষ্টভাবে পড়লে মনে হয়, কুরআনে যে বাঁধভাঙ্গা বন্যার উল্লেখ রয়েছে, ওটা হিময়াব বংশোদ্ভুত সাবার নয়, যাকে 'কওমে তুববা' বলা হয়েছে। বরং তার দ্বিতীয় শাখার ঘটনা। এতে করে সাবা জাতির ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়াকে ঈসার জন্মের পরের নয় বরং পূর্বের ঘটনা বলে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

৪. এই প্রলয়ংকরী বন্যার দরুন মারেবের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং সাবার বাগবাগিচা ধ্বংস হয়ে যায়। এর অব্যবহিত পর (বাণিজ্যিক যাতায়াত পথের উপর বিভিন্ন জাতিসমূহের দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে) সাবার গোত্রসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

৫. বাঁধভাঙ্গা বন্যার সময় যদি ৪৫০ ঈসায়ী ধরে নেয়া হয়, তাহলে মেনে নিতে হয়, সাবার জনগণের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়াটাও ৪৫০ সালের পরেই ঘটেছে। কিন্তু আরব জাতির (বিশেষত মদিনা শরীফের) বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ পড়ে জানা যায়, সাবার গোত্রগুলো ৪৫০ সালেরও অনেক আগে সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

এটা ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, সাবা থেকে আগত আসাদ বা আজ্‌দ গোত্র মদিনায় বসতি স্থাপন করলে ইহুদি সরদার কাইতুন বা কাতিয়ুন তাদের উপর লোমহর্ষক জুলুম চালায়। গাসমানী সরদার আবু জুবাইলা এই জুলুমের প্রতিশোধ নেয়। এ ঘটনার পর প্রখ্যাত তুব্বা সরদার আবু কারাব আসাদ ও হাসসান বিন আবু কারাব ইয়াসরিবে আগমন করে। (আবু কারাব আসাদের শাসনকাল ৪০০ থেকে ৪২৫ ঈসায়ী এবং হাসসানের শাসনকাল ৪২৫ থেকে ৪৫৫ ঈসায়ী পর্যন্ত) আরব ঐতিহাসিকগণ তুব্বা শাসকদের বিস্তারিত ইতিহাস লিখেছেন তা ভুল বা শুদ্ধ যে রকমই হোক। তবে কেউই লেখেননি যে, বাঁধভাঙ্গা বন্যা তুব্বা শাসকদের আমলে সংঘটিত হয়েছিল। যদি এই বন্যার কাল ৪৫০ ধরা হয় তাহলে এ কথা না মেনে উপায় থাকে না যে, সাবা গোত্রসমূহ ৪৫০ সালের পরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। অথচ ইতিহাস থেকে তো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সাবার বাণিজ্যিক রাস্তাগুলো তার অনেক আগেই অন্যদের করতলগত হয় এবং সে কারণেই তারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এসব বিক্ষিপ্ত গোত্রসমূহের মধ্যে পরে যদি কোনোটার পুনরুত্থান ঘটে থাকে, তবে সেটা ভিন্ন কথা। এ কথাও সত্য যে, গোত্রগুলোর বিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে বাঁধভাঙ্গা বন্যার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কিন্তু সূরা সাবাতে যে বাঁধভাঙ্গা বন্যার বর্ণনা রয়েছে, তার পূর্বাপর বিবেচনা করলে বুঝা যায়, এটা সাবার দ্বিতীয় শাখার ঘটনা, যার পতন ঘটেছে ঈসায়ীপূর্ব ১১৫ অব্দে। নিঃসন্দেহে মারেরের বাঁধ এরপরও কার্যকর ছিলো। এ বাঁধ কে মেরামত করেছিলো, সে সম্পর্কে ইতিহাস নীরব।) তবে ঐ সূরায় جَنَّتَيْنِ শব্দটি দ্বারা যে দুটো বাগানের কথা বলা হয়েছে, তা উজাড় হয়ে যাওয়ার পর আর জন্মেনি।

মারেবের বাঁধ হিমায়াবী সাবাদের আমলে এবং তার পরেও কার্যকর ছিলো। ৫৪৩ ঈসায়ীতে এ বাঁধ আবারও ভেঙ্গে গেলে আবরাহা তার সংস্কার সাধন করে। এ বাঁধ সর্বশেষ কখন ভাঙ্গে সে সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে।

৬. সকল ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, সাবার প্রথম শাখার (এবং দ্বিতীয় শাখার) আবাসভূমি ছিলো মারেব শহর (তথা সাবা) এবং বাঁধভাঙ্গা বন্যায় এই বাঁধই ধসে গিয়েছিলো। এ বাঁধ মারেবের সম্মিলিত এলাকায়ই নির্মিত হয়েছিল। হিময়ারী সাবার আবাসভূমি মারেব ছিলনা। এ জন্য কুরআন বর্ণিত বাঁধভাঙ্গা বন্যা যে হিময়ারী সাবাদের আমলে সংঘটিত হয়নি, সে কথা সন্দেহাতীত। যদিও হিময়ারী শাসকরা তাদের শাসনকে মারেব পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলো, কিন্তু তাই বলে মারেবকে হিময়ারের আবাসভূমি বলা চলে না। অথচ কুরআন বলে, আমি সাবা'র আবাসভূমিতে বাঁধভাঙ্গা বন্যা সংঘটিত করেছিলাম। (আবাসভূমি বলতে সাবা সাম্রাজ্যের রাজধানী বা তার প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের কেন্দ্র বুঝায়।)

জবাবঃ ইয়েমেনের যে ইতিহাস ঐ এলাকায় প্রাপ্ত প্রধান শিলালিপির সাহায্যে রচিত হয়েছে, তাতে আগেকার অনেক তথ্য সংশোধিত হয়েছে। সবচেয়ে পুরানো যে শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে তা ঈসায়ীপূর্ব ৬৬০ অব্দের। এতে বলা হয়েছে, ঐ সময় মারেবের বাঁধ তৈরি হচ্ছিলো। শুরাহবিল বিন ইয়াগফুর নামক বাদশাহর আরো একটা শিলালিপি পরে পাওয়া গেছে। এতে বলা হয়েছে, অমুক তারিখে (৪৪৯ ঈসায়ীতে) মারেবের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, তবে তা মেরামত করা হয়েছে। পরে আবার অমুক তারিখে (৪৫০ অথবা ৪৫১ ঈসায়ীতে) এ বাঁধ মারাত্মকভাবে ভেঙ্গে গেছে এবং বিপুল সংখ্যক অধিবাসী গৃহহারা হয়ে দূর দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। পরে বাদশাহ হিময়ার ও হাজরামাওত গোত্রসমূহের সাহায্য নিয়ে তা মেরামত করেন। এ শিলালিপি ৪৬৫ ঈসায়ীতে লিখিত বলে মনে করা হয়।

মারেবের বাঁধ ভেঙ্গে ব্যাপক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হওয়া এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের গৃহহারা হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ার প্রমাণ সর্বপ্রথম যে ঐতিহাসিক দলিল থেকে পাওয়া যায় সেটা এই শিলালিপি।

আরব ঐতিহাসিকগণ বলেন, মারেবের বাঁধ ভাঙ্গার ধ্বংসলীলার ফলে যে গোত্রগুলো উত্তর ও মধ্য আরবে ছড়িয়ে পড়ে তারা ছিলো জাফনা বংশোদ্ভূত গাসসান, আওস ও খাজরাজ গোত্র এবং লাখম, তানুখ, তাই ও কিন্দা প্রভৃতি গোত্র।

হামযা ইসপাহানী স্বীয় গ্রন্থে 'তারীখু সিনী মুলুকুল আরদ ওয়াল আম্বিয়া' (রাজা ও নবীদের ইতিহাস) যা বর্ণনা করেছেন, গাসসান গোত্রপতি জাফনা বিন আমর মুযাইকিয়াকে রোম সম্রাট নাসতুরাসের আমলে সিরীয় আরবদের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। এই রোম সম্রাটের আসল নাম ছিলো Anastasius এবং তার শাসনকাল ছিলো ৪৯১ থেকে ৫১৮ ঈসায়ী। এ থেকেও বুঝা যায় যে, গাসসানীরা স্বদেশ ইয়ামান থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বেরিয়েছে। অনুরূপভাবে ইয়ামান থেকে বেরিয়ে আসা আরো একটা গোত্র হীরায় গাসসানীদের অধীন শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে এবং এটাও পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কার ঘটনা।

এ বিষয়ে ইরাকী পণ্ডিত ডক্টর জাওয়াদ আলী প্রণীত 'প্রাগৈসলামিক আরবের ইতিহাস' অত্যন্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারিঃ ১৯৭৬)

১৮. তাফসির সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্নঃ তাফহীমুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড (উর্দু) পড়ে নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলো আমার বুঝে আসেনি। অনুগ্রপূর্বক বুঝিয়ে দিয়ে উপকৃত করবেন। আল্লাহ্ আপনাকে পুরস্কৃত করুন।

১. সূরা সাবা আয়াত ১৪ টীকা ১৪: সোলায়মান আ.-এর মৃতদেহ লাঠিতে ভর দিয়ে এতো দীর্ঘদিন দাঁড়িয়েছিলো যে, লাঠিটা ঘুনে খেয়ে দুর্বল করে দেয়। এই সময়ে জিনেরা (নিশ্চয়ই মানুষেরাও) তাঁর মৃত্যুর কথা জানতে পারেনি। এ ব্যাপারটা যুক্তির বিরোধী। কুরআন এটিকে মোজেজা হিসেবে বর্ণনা করেনি। প্রশ্ন হলো জিনদের এবং অন্যান্য রাজ কর্মকর্তাদের কি এতোটুকু কাণ্ড জ্ঞানও ছিলনা যে, সোলায়মান যিনি কথাবার্তা বলতেন, চলাফেরা, খাওয়াদাওয়া, মামলা মোকদ্দমার বিচার ফায়সালা, নালিশ শ্রবণ এবং নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটাতেন, তিনি এতো দীর্ঘদিন যাবত নীরব নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন তাও বুঝতে পারলেন না? শুধু দাঁড়িয়ে থাকাটাই কি বেঁচে থাকার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট? তাছাড়া তার পরিবার পরিজনই বা কোথায় ছিলো? তারাও কি বুঝতে পারলোনা যে উনি মারা গেছেন (এটা অসম্ভব)? অথবা তারাই কি একটা ফন্দি বের করে এটা করেছিলো? তাফহীমুল কুরআনের সম্মানিত লেখক তাফসির করতে গিয়ে ব্যাপারটাকে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বলে যে বক্তব্য দিয়েছেন, সেটাই একটা যুক্তিসাপেক্ষ ব্যাপার।

২. সূরা আহকাফ আয়াত ২৯ টীকা ৩৫: ক. জিনেরা মক্কী যুগেই ঈমান এনেছিলো। কিন্তু তারা রসূল সা. ও মুসলমানদের সংকটকালে কোনো সাহায্যই করেনি। আর তার পরবর্তীকালে কোনো জেহাদেও অংশ নেয়নি। সমগ্র কুরআন (যাবতীয় আদেশ নিষেধসহ) যেমন মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয়, জিনদের জন্যও তেমনি নয় কি? নামায, রোযা, যাকাত, জেহাদ (জান ও মাল দ্বারা) যদি জিনদের উপরও ফরয না হয়ে থাকে, তাহলে কিসের ভিত্তিতে তাদেরকে এই অব্যাহতি দেয়া হলো? আর যদি ফরয হয়ে থাকে তবে জিনেরা তা কবে এবং কিভাবে পালন করেছে?

খ. এই সূরা থেকে জানা যায়, জিনেরা নেহাৎ ঘটনাক্রমে ঈমান এনেছিলো এবং তারা স্বউদ্যোগে অন্যান্য জিনদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলো। রসূল সা. যদি মানুষের ন্যায় জিনদের কাছেও রসূল হয়ে এসে থাকেন, তাহলে তিনি নিজেই জিনদেরকে দাওয়াত দিলেন না কেন? তাদের ইসলামি শিক্ষা দীক্ষায় কিরূপ গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং কি ব্যবস্থা করেছিলেন? তাদের বেলায় কি ধরণের শরিয়তবিধি প্রযোজ্য ছিলো? কুরআনের সামাজিক নিয়মবিধি কি মানুষের মতো জিনদের জন্যও অবশ্য পালনীয়, না তাদের নিয়মবিধি অন্য রকম?

৩. সূরা সোয়াদ টীকা ৩৬: বিশ্বাসযোগ্য সনদ থাকা সত্ত্বেও যদি হাদিস সন্দেহজনক হতে পারে (এবং হয়েছেও) তাহলে হাদিসের মাপকাঠি কি রইলো? শুধুই কি নির্মল বিবেক? যদিও কেবল দুই একটা ঘটনাই এ ধরনের হোক না কেন?

৪. সূরা শুরা আয়াত ২৩ টীকা ৪১: মুফাসসির মহোদয় নিজের মতামত ব্যক্ত করেননি। قُرْبٰى কুরবা (আত্মীয়তা) এর ব্যাপারে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দেয়া জরুরি ছিলো। একটি মহল যে আলাদা ফের্কা গঠন করে নিয়েছে, তার মূল কারণ তো এখানেই নিহিত।

৫. সূরা সফ্ফাত আয়াত ৬৫ টীকা ৩৬: যিনি উপমাটা দিয়েছেন (অর্থাৎ আল্লাহ) তার চোখের সামনে তো যাকে উপমা দিয়েছেন এবং যার সাথে উপমা দিয়েছেন উভয়ই দৃশ্যমান। কিন্তু মানুষের কাছে দৃশ্যমান নয়। মানুষ শয়তানের মাথা দেখেনি, তবে যাক্কুমের ডালপালা, পাতা ও ফলফুল দেখতে পাচ্ছে। যে জিনিসটার সাথে যাক্কুমকে তুলনা করা হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে যাক্কুম কেমন জিনিস, তা কিছু না কিছু অনুমান করা যায়। সুতরাং এটির একটা কাল্পনিক উপমা, যা সঙ্গত হয়েছে বলে মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে আপনি যেসব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তা প্রযোজ্য নয়, কারণ এগুলোর বর্ণনাকারী হচ্ছে মানুষ, যার পক্ষে এসব জিনিস দেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আল্লাহ তো শয়তান ও তার মাথা দেখেছেন।

৬. সঠিক প্রবাদটি কি?

৭. 'সে ভীষণ উত্তেজিত হলো এবং তার মুখমণ্ডল হলুদ হয়ে গেলো।' এই উত্তেজিত অর্থাৎ 'আবেগে উদ্বেলিত হওয়া' দ্বারা কি রেগে যাওয়া বুঝায়, না লজ্জিত বা ভীত হওয়া?

জবাবঃ ১. পবিত্র কুরআনে যে কথা যেভাবে লেখা হয়েছে, আমি তা সেভাবেই বর্ণনা করেছি। এর উপর আপনি যেসব প্রশ্ন তুলেছেন তার জবাব কুরআনে নেই। আমি নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কোনো কথা কুরআনের ভেতরে ঢুকাতে পারিনা।

২. ক. জিনদের ঈমান আনার অর্থ এ নয় যে, মানুষের ভেতরে ঈমান ও কুফরী নিয়ে যে সংঘর্ষ বেঁধেছে তাতেও তাদের অংশগ্রহণ করতে হবে। জিনদের ভেতরেও কাফের ও মুমিন জিনদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। অথচ মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করেনা।

খ. জিনেরা ঘটনাক্রমে ঈমান আনেনি। মানুষের ভেতর থেকে যতো নবী এসেছেন, তাদের উপর ঈমান আনা জিনদের জন্যও বাধ্যতামূলক ছিলো। তবে তাদের জন্য শরিয়তের বিধি কি ছিলো এবং তাদের ইসলামি শিক্ষা দীক্ষার কি ব্যবস্থা ছিলো, সেসব খুঁটিনাটি তথ্য আমাদের জানা নেই।

৩. শক্তিশালী সনদ থাকা সত্ত্বেও হাদিসের বক্তব্যে এমন কোনো বিষয় থাকতে পারে, যা ঐ হাদিসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করে।

৪. সূরা শুরার ২৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা তো আমার সাধ্যমত পুরোপুরিভাবেই করে দিয়েছি। আপনার কাছে তা তৃপ্তিদায়ক না হয়ে থাকলে সেটা ভিন্ন কথা।

৫. আপনি যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থেকে থাকেন যে, শয়তানের মাথা অবিকল যাক্কুমের মতোই এবং যাক্কুমকে শয়তানের মাথার সাথেই তুলনা করা হয়েছে, তাহলে আপনি এ ধরনের তাফসির অবাধে করতে পারেন।

৬. উর্দুতে প্রবচন হিসেবেই বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ নৈরাজ্যময় দেশ, উদাসীন রাজা

৭. رَبَّا الرَّجُلُ رَبْوَةً এর অর্থ শ্বাস স্ফীত হওয়া, আবার লজ্জিত হওয়াও। তবে ইবনে আব্বাসের উক্তি 'ছবি যদি বানাতেই হয়, তবে গাছের ছবি বানাও' এর আলোকে

আমি উত্তেজিত হওয়া অনুবাদ করেছি। কেননা ইবনে আব্বাসের উক্তি থেকে বুঝা যায়, ছবি আঁকার উপর নিষেধাজ্ঞা ঐ ব্যক্তির পছন্দ হয়নি এবং সে ছবি আঁকতে বদ্ধপরিকর ছিলো। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি, ১৯৭৬)

১৯. রসূলুল্লাহ সা.-এর মেয়েদের বয়স।

প্রশ্ন: তাফহীমুল কুরআন আমপারার সূরা কাওসারের ভূমিকায় আপনি ইবনে সা'দ রা. এবং ইবনে আসাকেরের বরাত দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, যে রসূল সা.-এর জ্যৈষ্ঠ পুত্র ছিলেন কাসেম রা., তাঁর ছোট যয়নব রা. এবং তাঁর ছোট আবদুল্লাহ রা.। এরপর ক্রমানুসারে তিন কন্যা উম্মে কুলসুম রা., ফাতেমা রা. ও রোকেয়া রা.। এদের মধ্যে সর্ব প্রথম কাসেম রা. ইন্তেকাল করেন। তারপর মৃত্যু বরণ করেন আবদুল্লাহ রা.। এভাবে সকল পুত্র সন্তান মারা গেলে কোরেশ সরদার আস ইবনে ওয়ায়েল টিপ্পনী কাটলো, মুহাম্মদের আর কোনো বংশধর রইলনা। এখন সে লেজবিহীন (অর্থাৎ নির্বংশ) হয়ে গেলো।

উক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেলো, রোকেয়া রা. কনিষ্ঠতম কন্যা ছিলেন। কিন্তু ফাতেমা রা. কনিষ্ঠতম কন্যা ছিলেন বলেই জনশ্রুতি রয়েছে। আর এই রেওয়ায়েত অনুসারে আবদুল্লাহ রা. নবী বংশধরের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন। কিন্তু 'রহমাতুললিল আলামিন' গ্রন্থের লেখক বলেছেন, আবদুল্লাহ রা. নবুয়ত লাভের পর ভুমিষ্ঠ হন। এ জন্যে ইবনে আব্বাস নবী বংশধরদের যে ক্রমিক তালিকা দিয়েছেন, তা বিবেচনাসাপেক্ষ। অনুগ্রহণপূর্বক বুঝিয়ে বলবেন।

কাসেম রা. নবুয়তের আগে ভূমিষ্ঠ হয়ে নবুয়তের আগেই মারা গেছেন। তাঁর নামের সাথে 'রাজিয়াল্লাহু আনহু' লেখা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?

জবাব: রসূল সা.-এর সন্তান সন্ততির জন্মকাল পরম্পরা কি, সে সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। আমার গবেষণা অনুসারে নবী দুলালীদের মধ্যে যয়নব রা. সবার বড়। কেননা নবুয়তের আগেই আবুল আস রা.-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, নবুয়তের দশ বছর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আমার মতে রোকেয়া রা. সবার ছোট ছিলেন না। ওসমান রা.-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল এবং তিনি স্বামীর সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। কাজেই তাঁর বয়স নবুয়তের ৫ম বর্ষে ১৩/১৪ বছরের কম হওয়ার কথা নয়। আর ফাতেমা রা. সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, তাঁর জন্মের সময় রসূল সা.-এর বয়স ছিলো ৪১ বছর।

রসূল সা.-এর যে সন্তানেরা নবুয়তের আগে জন্মগ্রহণ করে এবং অল্প বয়সে মারা যায়, তাদের নামের সাথে রাজিয়াল্লাহু আনহু লিখলে আপত্তির কিছু নেই। (তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬)

২০. কুরআনের নির্দেশাবলীর খুঁটিনাটি বিষয়ে 'রদবদল' করা যায় কি?

প্রশ্ন: আমি একজন তরুণ ছাত্র। ১৯৭০ সাল থেকে আমি জামায়াতে ইসলামির প্রতি মানসিকভাবে আকৃষ্ট এবং আপনার অনুরক্ত। কিন্তু আপনার ভক্তই হই কিংবা অন্য

কারোর শত্রুই হই, আমি সবসময় শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসটি অনুসরণ করে থাকি যে, 'সব সময় কুরআন ও সুন্নাহকে প্রীতি ও শত্রুতার মানদণ্ড রাখো।' আমি আপনার বইগুলো পড়েছি। আমি মহান আল্লাহর দরবারেও একথা বলতে পারি যে, ঐ বইগুলো আমার মধ্যে ইসলামের সার্থক উপলব্ধি এবং ইসলামের উপর আমল করা, ইসলামের খিদমত করা এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহৎ দায়িত্ব পালন করার প্রেরণা উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

ভূমিকা হিসাবে এই কটা কথা বলার পর এক্ষেত্রে যে সমস্যাটা আমাকে উদ্বেগের মধ্যে ফেলেছে তার কথা বলছি। এ ব্যাপারটা বাস্তবিকই আমার মনে খটকার সৃষ্টি করেছে। আপনার 'ইসলামি বিধানের উৎস হিসাবে সুন্নাহর মর্যাদা' নামক বইতে সন্নিবেশিত একটা বক্তব্য থেকেই এ খটকা জন্মেছে। আমার কাছে এ বইয়ের ১৯৭০ সালের মার্চ সংস্করণ রয়েছে। ডক্টর আব্দুল ওয়াদুদ সাহেব প্রশ্ন করেছেন, রসূলুল্লাহ সা. ইসলামের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের জন্য যেসব পন্থা ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, কোনো যুগের চাহিদা ও স্বার্থের বিচারে তার খুঁটিনাটি বিষয়ে রদবদল করা যায় কি? কুরআনের নির্দেশাবলীর খুঁটিনাটি বিধিতেও কি অনুরূপ রদবদল করা চলে? এর জবাবে আপনি লিখেছেন, কোনো নির্দেশের শাব্দিক কাঠামোতে যখন এবং যতোটুকু রদবদলের অবকাশ থাকে, ঠিক ততোটুকুই রদবদল করা যায়। এক্ষেত্রে আপনি কুরআনকেও শামিল করে দিয়েছেন। আপনি আপনার গ্রন্থ 'ইসলামি বিধানের উৎস হিসাবে সুন্নাহর মর্যাদা' (সুন্নাত কি আইনী হাইসিয়াত) এর ১৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রশ্নোত্তরটা আর একবার পড়ে দেখুন। আমার মতে এ বক্তব্য কুরআনের প্রামাণ্যতাকেই সন্দেহের ব্যাপার করে তোলে। শুধু আমার নগণ্য মতেই নয় আল্লাহর ঘোষণা অনুসারেও কুরআন একটি সুরক্ষিত গ্রন্থ, এর একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা যায় না। বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হাদিসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আপনি বলেছেন, নির্দেশ অনুসারে রদবদল করা হবে। এ ব্যাপারে নিম্নের প্রশ্নগুলো জন্মে।

১. 'কুরআনের নির্দেশাবলীর খুঁটিনাটি বিধি' বলতে আপনি কি বুঝিয়েছেন?
২. এ দ্বারা আপনি যদি কোনো আয়াতকে বুঝিয়ে থাকেন তাহলে জিজ্ঞাস্য, নবী ছাড়া আর কেউ কি তাতে রদবদল ঘটানোর ক্ষমতা রাখে?
৩. রসূল সা.-এর তিরোধানের পর কি কুরআনের নির্দেশে পরিবর্তন হতে পারে?
৪. খোদ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কি কুরআনের নির্দেশাবলীতে নিজের ইচ্ছামত রদবদল ঘটাতে পারতেন?
৫. এ বক্তব্য কি রসূল সা.-এর শেষ নবী হওয়ার বিপক্ষে একটি যুক্তি ও প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয় না?
৬. আপনার এ উক্তির স্বপক্ষে কি কুরআন হাদিস অথবা চার ইমামের মাযহাব থেকে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন?
৭. এ ব্যাপারে আপনার কাছে কোনো প্রমাণ না থাকলে আপনি কি নিজের অভিমত প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত আছেন?
৮. জামায়াতে ইসলামিতে থাকতে হলে কি আপনার যাবতীয় লিখিত বক্তব্যের সাথে একমত হওয়া জরুরি?

মাওলানা সাহেব, যারা তিলকে তাল বানিয়ে অপপ্রচারে লিপ্ত হয় এবং তা দ্বারা কারো বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ায়, আমি তাদের দলভুক্ত নই। আমি যা লিখেছি হক কথা মনে করেই লিখেছি। আমার পড়াশুনা শুধু আপনার বইগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এই সংক্ষিপ্ত জীবনে আমি প্রাচীন মনীষীদের পবিত্র গ্রন্থাবলীও অধ্যয়ন করেছি। ঐসব গ্রন্থ অধ্যয়নেও আমার ভেতরে ইসলামি প্রেরণা সৃষ্টি করার ব্যাপারে আপনার গ্রন্থাবলীর অবদান শতকরা একশো ভাগ। এ জন্য আমি আপনাকে উত্তম প্রতিবাদন দানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি।

জবাবঃ 'সুন্নাত কি আইনী হাইসিয়াত' গ্রন্থের একটি বক্তব্যে যে বিভ্রাট ও সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে, সেদিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আসলে আমি প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তার প্রশ্নে ব্যবহৃত 'রদবদল' শব্দটাই প্রয়োগ করেছি। এ শব্দটা স্বভাবতই কিছু খটকা লাগায় বটে। তবে যে বাক্যে আমি তা প্রয়োগ করেছি, সেটা একটু নিবিষ্ট মনে পড়ে দেখলে তা থেকে কোনো সন্দেহ সংশয় জন্মাতে পারে না। আমার মূল কথাগুলো ছিলো 'কুরআনী নির্দেশাবলীর খুঁটিনাটি বিধিই হোক কিংবা প্রামাণ্য হাদিসের খুঁটিনাটি বিধিই হোক, উভয়ের মধ্যে কেবল তখনই এবং ততোটুকুই রদবদল হতে পারে, যখন এবং যতোটুকু রদবদলের অবকাশ উক্ত নির্দেশের শব্দ কাঠামোতে থাকে। অথবা কুরআন বা হাদিসের অন্য কোনো উক্তি এমন পাওয়া যায়, যা কোনো বিশেষ পরিস্থিতির জন্য কোনো বিশেষ ধরনের নির্দেশে রদবদল অনুমোদন করে। অন্যথায় কোনো মুমিন কোনো অবস্থাতেই নিজেকে আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশে রদবদল করার অধিকারী ও অনুমতিপ্রাপ্ত বলে কল্পনা করতে পারে না।'

এ উক্তিতে 'রদবদল' শব্দ দ্বারা স্বেচ্ছাচারমূলক রদবদল বুঝানো হয়নি। এখানে কেবল একথাই বুঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশের ভাষায় যখন দুটো মর্ম গ্রহণের অবকাশ থাকে, তখন তার একটা মর্ম বাদ দিয়ে আর একটা মর্ম গ্রহণ করা যায়। অথবা যখন অন্যত্র আল্লাহ বা রসূলের এমন কোনো উক্তি পাওয়া যায়, যা কোনো বিশেষ অবস্থার জন্য কোনো বিশেষ ধরনের নির্দেশকে বাদ দিয়ে অন্য ধরনের নির্দেশকে গ্রহণ করার অনুমতি দেয়, তখন সেই অনুমতিকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

আমার এই উভয় বক্তব্যের বিশ্লেষণে আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। প্রথমত লক্ষ্য করুন, (তালাকের ইদ্দত প্রসঙ্গে) কুরআনে বলা হয়েছেঃ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ 'তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন 'কুরু' সময় পর্যন্ত নিজেকে সামলে রাখবে।' এ আয়াতে قروء শব্দটার দুই রকম অর্থ গ্রহণের অবকাশ রয়েছে (রজস্রাব কাল ও রজস্রাব মুক্ত কাল, অনুবাদক) ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের এক গোষ্ঠী এর একটি অর্থ এবং অপর গোষ্ঠী অপর অর্থ গ্রহণ করেছেন। এখানে এক এক গোষ্ঠী যে এক অর্থকে বাদ দিয়ে আর এক অর্থ গ্রহণ করলেন। قروء শব্দটাতে উভয় অর্থের অবকাশ থাকার কারণে তা সঠিক ছিলো।

অনুরূপভাবে তায়াম্মুমের বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনে أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ('অথবা যদি তোমরা স্ত্রীকে স্পর্শ করো') বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'স্পর্শ' শব্দটার দু'রকম অর্থ গ্রহণের অবকাশ ছিলো (শুধু স্পর্শ অথবা সঙ্গম) এবং ফকীহদের একদল এর এক অর্থ এবং অপরদল অপর অর্থ গ্রহণ করেছেন। আয়াতের ভাষা উভয় অর্থের একটি গ্রহণ ও অপরটি বর্জনের অনুমতি দেয় বলেই এক্ষেত্রে উভয় দলের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিলো।

আল্লাহ ও রসূলের ভিন্ন কোনো উক্তি দ্বারাও যে কোনো বিশেষ বিধিকে বর্জন করে অন্য কোনো বিধিকে গ্রহণ করা যায়, এবার তারও উদাহরণ লক্ষ্য করুন। সূরা মুহাম্মাদে আল্লাহর নির্দেশ ছিলো, فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً এতে যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণের দৃশ্যত দুটো পদ্ধতিই নির্ধারণ করা হয়। একটি সৌজন্য ও সদাচার (অর্থাৎ ক্ষমা ও বিনাপণে মুক্তি) অপরটি মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তিদান। কিন্তু রসূল সা.-এর বাস্তব দৃষ্টান্ত দ্বারা জানা গেলো, বিনা পণে মুক্তি দিলে যেমন সদাচার হয়, তেমনি দাসদাসীতে পরিণত করে ভালো ব্যবহার করলেও সদাচার হতে পারে। এ দৃষ্টান্ত না থাকলে সদাচারের বাহ্যিক অর্থ শুধু পণ ছাড়া অনুকম্পা ও ক্ষমা প্রদর্শন করে মুক্তি দেয়াই বুঝাতো।

বনু কুরায়যার যুদ্ধে রসূল সা. মদিনা থেকে যাত্রাকারী মুজাহিদদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা বনু কুরায়যার বস্তিতে না পৌঁছা পর্যন্ত আছরের নামায পড়বে না। এক্ষেত্রে একদল সেখানে না পৌঁছা পর্যন্ত আছরের নামায পড়েননি। আর একদল পড়েছিলেন। প্রথম দলটি সঠিক সময়মত নামায পড়ার কুরআনী নির্দেশ ও হাদিসের জোরদার নির্দেশাবলী সাময়িকভাবে বাদ দিয়ে ঐ সময়কার জন্য বিশেষভাবে প্রদত্ত রসূল সা.-এর দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ অনুসারে কাজ করলেন। আর অপর দলটি রসূলের হুকুমের এরূপ অর্থ গ্রহণ করলেন যে, আসরের আগেই বুন কুরায়যার জনপদে পৌঁছে যাওয়া চাই। কিন্তু যেহেতু আমরা সেখানে যথাসময়ে পৌঁছাতে পারিনি, অথচ নামাযের ওয়াক্ত উৎরে যাবার উপক্রম হয়েছে, তাই নির্ধারিত সময়ে নামায পড়ার যে আদেশ রয়েছে, আমরা সে অনুসারেই কাজ করবো। উভয় দল যা করেছেন, সেটা রসূল সা.-এর গোচরে আনা হলে তিনি তাদের কারো কাজকেই ভুল বলে আখ্যায়িত করলেন না। কেননা উভয় দল আল্লাহ ও রসূলের সুস্পষ্ট নির্দেশ অনুসারেই কাজ করেছেন।

এই বিশ্লেষণের পর আমার মনে হয়, আপনার উত্থাপিত আটটি প্রশ্নের মধ্যে সাতটি প্রশ্নেরই জবাব হয়ে গেছে। কেবল অষ্টম প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে। এ প্রশ্নের জবাব হলো, জামায়াতে ইসলামিতে থাকা বা যোগদানের জন্য আমার রচনাবলীর সাথে একমত হওয়া কস্মিনকালেও জরুরি নয়। জামায়াত যেদিন গঠিত হয়, সেদিনই আমি একথা বলে দিয়েছিলাম। (তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর: ১৯৭৬)

২১. কুরআনের আয়াত থেকে কাদিয়ানীদের খোঁড়া যুক্তি উদ্ভাবন।

প্রশ্ন: আমি আপনার অনেক রচনা পড়েছি। কিন্তু যে আয়াত থেকে কাদিয়ানীরা যুক্তি দেখায়, সে সম্পর্কে আপনার কোনো পর্যালোচনা দেখিনি। এটি সূরা আরাফের ৩৫

নং আয়াত يَا بَنِىٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ (হে আদমের বংশধরগণ, তোমাদের কাছে যদি তোমাদের মধ্য থেকেই কোনো রসূল আসে)

এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হওয়া কুরআনে মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, তোমাদের মধ্য থেকে রসূলগণ আসবেন। এ থেকে বুঝা যায়, রসূল সা.-এর পরও নবীদের আগমনের পথ খোলা রয়েছে। কাদিয়ানীদের এ যুক্তির জবাব কি? অনুরূপভাবে সূরা মুমিনুনের ৫১নং আয়াত থেকেও তারা যুক্তি দিয়ে থাকে। তাছাড়া لَوْ عَاشَ اِبْرَاهِيْمُ لَكَانَ نَبِيًّا (রসূল সা.-এর পুত্র) 'ইব্রাহীম বেঁচে থাকলে নবী হতেন।' এসব বক্তব্যের জবাবে কি বলা যায়?

জবাব: সূরা আরাফের ৩৫নং আয়াতকে তার পূর্বাপর প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তা থেকে যে সিদ্ধান্ত উদ্ধার করা হয়, একে তো সে সিদ্ধান্ত পূর্বাপর আলোচনার সাথে মিলিয়ে পড়লে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত। উপরন্তু এ সংক্রান্ত অন্য যেসব আয়াত কুরআনের অন্যান্য জায়গায় রয়েছে, তাও কাদিয়ানীদের ব্যাখ্যার সাথে মেলেনা। অধিকন্তু কাদিয়ানীদের আগে বিগত তেরোশো বছরে কেউ এ আয়াতের এরূপ অর্থ গ্রহণ করেননি যে, এ আয়াতে রসূল সা.-এর পর নবুয়তের ধারা চলতে থাকবে বলা হয়েছে। আমি এই তিনটি বক্তব্যেরই আলাদা জবাব দিচ্ছি। এতে করে কাদিয়ানীদের যুক্তি দ্বারা প্রতারিত হবার কোনো অবকাশ থাকবে না।

১. সূরা আরাফের ৩৫নং আয়াতটা আসলে আদম আ. ও হাওয়া আ.-এর কাহিনী প্রসঙ্গে এসেছে। এ কাহিনী দ্বিতীয় রুকুর শুরু থেকে নিয়ে একাধারে চতুর্থ রুকুর মাঝখান পর্যন্ত চলেছে। প্রথমত দ্বিতীয় রুকুতে পুরো কাহিনীটা বর্ণিত হয়েছে। এরপর তৃতীয় ও চতুর্থ রুকুতে ঐ কিস্সা থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই পটভূমি মনে রেখে যদি আপনি আয়াতটা পড়েন তাহলে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, 'হে আদমের বংশধরগণ' এই সম্বোধন করে যে কথা বলা হয়েছে, তা আসলে সৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে যে মানবজাতি চলে আসছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট, কুরআন নাযিল হওয়ার সময়কার মানবজাতির সাথে নয়। অন্য কথায় বলা যায়, সৃষ্টির প্রথমদিনেই আদমসন্তানদেরকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয় যে, আল্লাহর প্রেরিত নবীগণের মাধ্যমে যে হেদায়াত এসেছে, তার অনুসরণ ছাড়া তোমাদের মুক্তির উপায় নেই।

২. এ বক্তব্য সম্বলিত আয়াত কুরআনে তিন জায়গায় রয়েছে এবং তিন জায়গাতেই আদম আ. ও হওয়া আ.-এর কিসসা প্রসঙ্গেই তা এসেছে। প্রথম আয়াত সূরা বাকারার ৩৮নং আয়াত, দ্বিতীয় আয়াত সূরা আরাফের আলোচ্য ৩৫নং আয়াত এবং তৃতীয়টি সূরা তোয়াহার ১২৩ নং আয়াত। এই তিনটি আয়াতের বক্তব্য এবং পটভূমি একই রকম।

৩. তাফসিরকারগণ অন্যান্য আয়াতের মতো সূরা আরাফের এ আয়াতকেও আদম ও হাওয়ার কিসসার সাথেই সংশ্লিষ্ট করার পক্ষে ছিলেন। আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী স্বীয় তাফসিরে এ আয়াত সম্পর্কে আবু সাইয়ার সুল্লামীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন:

'আল্লাহ তায়ালা এখানে আদম ও তাঁর বংশধরকে একত্রে এবং একই সময়ে সম্বোধন করেছেন।' ইমাম রাবী স্বীয় গ্রন্থ তাফসিরে কবীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, 'শেষ নবী হওয়া সত্ত্বেও এ সম্বোধন যদি রসূল সা.-কেই করা হয়ে থাকে, তাহলে এর অর্থ হবে, আল্লাহ তায়ালা এখানে সর্বযুগের সকল মানবজাতি ও গোষ্ঠী সম্পর্কে তাঁর শাশ্বত নীতি বর্ণনা করছেন। 'আল্লামা আলুসী স্বীয় তাফসির গ্রন্থ 'রুহুল মায়ানী'তে বলেন, এখানে প্রত্যেক জাতিকে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, সেটাই বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে আদম আ.-এর বংশধর দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত বুঝানো অসঙ্গত ও ভাষাগতভাবে বেমানান। কেননা এখানে রসূলের বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।' আল্লামা আলুসীর বক্তব্যের শেষাংশের তাৎপর্য হলো, এখানে যদি উম্মতে মুহাম্মাদীকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে, তাহলে এ উম্মতকে একথা বলার অবকাশ ছিলনা যে, 'যদি কখনো তোমাদের মধ্যে নবীগণ আসেন'। কেননা এ উম্মতের মধ্যে একজনের চেয়ে বেশি নবী আসার প্রশ্নই ওঠে না। সূরা মুমিনুনের ৫১ নং আয়াত:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

('হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য খাও এবং সৎ কাজ করো। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমি পরিজ্ঞাত।') এ আয়াতকে যদি তার পূর্বাপর আলোচনা থেকে বিচ্ছিন্ন না করা হয়, তাহলে কাদিয়ানীরা এ আয়াত থেকে যে মর্ম উদ্ধার করেছে, তা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় রুকু থেকে চলে আসা একটা ধারাবাহিক আলোচনা প্রসঙ্গে এ আয়াতটি সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে নূহ আ.-থেকে ঈসা আ. পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের নবীগণ এবং তাদের জাতিসমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সকল জায়গায় ও সকল যুগে নবীগণ একই শিক্ষা দিয়েছেন। তাদের সকলের কর্মপদ্ধতি একই রকম ছিলো এবং একই নিয়মে তাদের সকলের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষিত হয়েছে। ঠিক এর বিপরীত অবস্থা ছিলো বিভ্রান্ত জাতিগুলোর। তারা সবসময় আল্লাহর পথ ছেড়ে অসৎ কাজে লিপ্ত থাকতো। এ পটভূমিতে এ আয়াতের এরূপ অর্থ হতে পারে না যে, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে আগত ওহে নবীগণ। তোমরা সকলে পবিত্র খাদ্য খাও এবং নেক আমল করো।' বরঞ্চ এর মর্ম হলো যে, নূহ আ.-এর পর থেকে এ যাবত যতো নবী এসেছেন, তাদের সকলকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র খাদ্য খাওয়া ও সৎ কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এ আয়াত থেকেও তাফসিরকারগণ কখনো এরূপ মর্ম উদ্ধার করেননি যে, এ আয়াত মুহাম্মদ সা.-এর পরে নতুন নতুন নবী আগমনের পথ উন্মুক্ত করে। কেউ যদি এ ব্যাপারে আরো তত্ত্বানুসন্ধান করতে চায় এবং আরো নিশ্চিত হতে চায়) তবে সে বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থে এই আয়াতের ব্যাখ্যা পড়ে দেখতে পারে।

('রসূল সা.-এর ছেলে) ইবরাহিম বেঁচে থাকলে নবী হতো' এ হাদিস থেকে কাদিয়ানীরা যে যুক্তি দেয় তা চারটি কারণে ভুল।

প্রথমত, যে বর্ণনায় এটিকে স্বয়ং রসূল সা.-এর উক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে তার সনদ দুর্বল। হাদিস বিশেষজ্ঞদের কেউ সে সনদকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি।

দ্বিতীয়ত, ইমাম নবাবী এবং ইবনে আবদুল বারের মতো শীর্ষস্থানীয় হাদিস বিশারদগণ এ বক্তব্যকে একেবারেই অবিশ্বাসযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম নবাবী স্বীয় تهذيب الاسماء واللغات নামক গ্রন্থে বলেন, 'এবার আসা যাক ইবরাহিম বেঁচে থাকলে নবী হতো এই মর্মে প্রাচীন মনীষীদের কারো কারো উক্তি প্রসঙ্গে। ঐ উক্তি সম্পূর্ণ ভূয়া, অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে একটা অন্যায় ধৃষ্টতা এবং চিন্তাভাবনা না করে মুখ দিয়ে একটা মারাত্মক কথা বলার শামিল।'

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার 'তামহীদ' নামক গ্রন্থে লেখেন, 'এটা কি ধরনের কথা আমি বুঝি না। নবী নয় এমন সন্তানতো নূহ আ.-এরও জন্মেছিলো। নবীর ছেলে নবী হবে এটা যদি জরুরি হতো তাহলে আজ সবাই নবী হতো। কেননা সবাইতো নূহ আ.-এর বংশধর'।

তৃতীয়, এ উক্তিটি যেসব রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে, তার অধিকাংশই একে রসূল সা.-এর নয় বরং কোনো সাহাবির উক্তি হিসাবে উল্লেখ করে। আর সেই সব সাহাবি সাথে সাথে এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আর কোনো নবী আসার অবকাশ নেই বিধায় আল্লাহ তাঁর ছেলেকে তুলে নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বুখারির বর্ণনা নিম্নরূপঃ

'ইসমাইল বিন খালেদ বলেন, আমি (সাহাবি) আবদুল্লাহ বিন আবি আওফাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছেলে ইবরাহিমকে দেখেছেন? তিনি বলেন, ইবরাহিমতো শিশুকালেই মারা যায়। আল্লাহর যদি সিদ্ধান্ত থাকতো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কেউ নবী হবে, তাহলে তাঁর ছেলে বেঁচে থাকতো। কিন্তু তাঁর পরে আর কোনো নবী নেই।'

আনাস থেকেও এর কাছাকাছি বক্তব্য সম্বলিত উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। উক্তিটি নিম্নরূপঃ 'তিনি বেঁচে থাকলে নবী হতেন। কিন্তু তিনি বেঁচে রইলেন না। কেননা তোমাদের নবী শেষ নবী।'

চতুর্থত, যদি সাহাবায়ে কেরামের এসব উক্তি উদ্ধৃত নাও হতো এবং হাদিসবেত্তাগণের সেই মন্তব্যও না থাকতো, যাতে রসূল সা.-এর উক্তি বলে কথিত এই বর্ণনাকে দুবর্ল ও অবিশ্বাস্য বলে রায় দেয়া হয়েছে, তাহলেও এটি কোনোক্রমেই মেনে নেয়ার যোগ্য হতো না। কেননা হাদিস শাস্ত্রের একটা সর্বস্বীকৃত মূলনীতি হলো, কোনো রেওয়ায়েত থেকে যদি এমন বক্তব্য পাওয়া যায় যা বহু সংখ্যক সহীহ হাদিসের পরিপন্থী, তবে তা গ্রহণ করা যায় না। এখন এক দিকে যখন বিপুল সংখ্যক সহীহ ও বিশ্বস্ত সনদযুক্ত হাদিসের অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, রসূল সা.-এর পরে নবুয়তের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে, আর তার বিপরীতে এই একটি মাত্র হাদিস নবুয়তের দরজা খোলা থাকার সম্ভাবনা ব্যক্ত করছে, তখন এই একটিমাত্র হাদিসের মোকাবিলায় অতোগুলো হাদিসকে কিভাবে ছেড়ে দেয়া যায়? (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৭৬)

২২. কুরআনের কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা।

প্রশ্ন: فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا

আল বাকারা, ৬ রুকু, তাফহীমুল কুরআন, প্রথম খণ্ড। আপনি এ আয়াতের অনুবাদ এভাবে করেছেন, তোমার খোদার নিকট প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমাদের জন্য জমির ফসল, শাক, সবজী, গম, রসুন, পেঁয়াজ, ডাল ইত্যাদির উৎপাদন করেন।'

শাকের পরে আপনি একটি কমা দিয়ে সবজি লেখেছেন, بقلها এর অনুবাদ শাকসবজি ঠিক আছে। কিন্তু এই দুটো শব্দের মাঝে কমা দিলেন কেনো এটাই চিন্তার বিষয়। আপনার অনুবাদ থেকে মনে হয়, আপনি قثوها এর অনুবাদ সবজি করেছেন। অথচ قثاو কাঁকড়কে বলা হয়। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসানও এই অনুবাদই করেছেন। আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীও ইংরেজিতে এর অনুবাদ করেছেন (Cucumber)। بصل পিঁয়াজকে বলা হয়, না রসুন পিঁয়াজকে? রসুন কুরআনের কোন্ শব্দের অনুবাদ? তাছাড়া আপনার অনুবাদে আগে পিঁয়াজ তারপর ডাল উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ পেঁয়াজ শেষে আসা উচিত ছিলো। সবার শেষে আপনি যে 'ইত্যাদি' শব্দটা ব্যবহার করেছেন, তা কি তাফসিরকারগণ করেছেন?

জবাবঃ আপনি আমার অনুবাদের যে কয়টি শব্দের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তার অর্থের বিশদ বিবরণ আমি صراح নামক আরবি-ফারসী অভিধান থেকে এবং منهى الادب এর অনুবাদ থেকে তুলে দিচ্ছি।

অর্থাৎ بقل অর্থ শাক ও তরকারি, তাছাড়া মাটি সবুজ আকার ধারণ করে এমন যে কোনো উদ্ভিদকে بقل বলা হয়। যে শাক ও তরকারি বীজ থেকে উৎপন্ন হয়, চারা থেকে নয়। منتهى الادب ফারসীতে تره শব্দটা শাক ও তরকারি উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উপরে আমি যে উদ্ধৃতি দিয়েছি, তাতে শাক ও তরকারি واو عطف (সংযোজক অব্যয়) সহকারে লেখা হয়েছে। তাই শাক, সবৃজি কমা দিয়ে লেখা অধিকতর শুদ্ধ।

قثاء খিরাই (সুরাহ)। যে তরকারি খিরাই থেকে লম্বা হয় (অর্থাৎ কাঁকড়) এবং خيار (অর্থাৎ খিরাই) এ শব্দটার অনুবাদ সত্যিই বাদ পড়ে গেছে পরবর্তী সংস্করণে এটা জুড়ে দেবো।

فوم রসুন ও গম (সুরাহ)। রসুন ও গম এবং এমন যে কোনো দানা, যা দিয়ে রুটি বানানো হয় এবং রসুন ও পিঁয়াজ (মুনতাহাল আদব)। سير শব্দটার অর্থ ফারসিতে রসুন।

عدس ডাল, এক ধরনের শস্য, হিন্দীতে মশুর (সুরাহ) ডাল (মুনতাহাল আদব) بصل ، بصل ، فياز (صراح ومنتهى الادب) অর্থাৎ সুরাহ ও মুনতাহাল আদব উভয় অভিধান মতেই بصل অর্থ পিঁয়াজ।

যেহেতু এ আয়াতে ব্যবহৃত বেশিরভাগ শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক এবং প্রত্যেকটার যাবতীয় অর্থ অনুবাদে দেয়া সম্ভব ছিলনা, এ জন্য আমি 'ইত্যাদি' শব্দটা ব্যবহার করে বুঝাতে চেয়েছি যে, এ শব্দগুলোতে এ জাতিয় অন্যান্য জিনিসও বুঝায়। যেহেতু আমি শাব্দিক গণ্ডির মধ্যে থেকে এরূপ শব্দাবলী সংযোজন করেছি যা কুরআনের উক্তির মূল বক্তব্যের দিকে ইংগিত দেয়। (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বরঃ ১৯৭৬)

২৩. তাফহীমুল কুরআনের কয়েকটি জায়গা নিয়ে প্রশ্ন।

তাফহীমুল কুরআনের কয়েকটি জায়গা সম্পর্কে আমাদের কাছে কিছু প্রশ্ন এসেছে। আমি প্রশ্নগুলো যেরূপ গভীরভাবে তলিয়ে দেখা উচিত, সেভাবেই তলিয়ে দেখেছি। নিম্নে প্রতিটি প্রশ্ন উদ্ধৃত করে তার জবাব দিচ্ছি।

প্রশ্ন ১: সুরা ইউসুফ, আয়াত: ৩ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ

এখানে القصص শব্দটা مصدر (ক্রিয়া বিশেষণ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। কেননা مصدر আরবি ব্যাকরণ অনুসারে نكره ব্যবহৃত হয়। احسن القصص শব্দটা আসলে احسن الحديث ধরনের শব্দ বিন্যাস। আর قصص শব্দটা এখানে مقصوص (কিসসা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দের এ ব্যবহার আরবি বাচনরীতি অনুসারে হয়েছে। قص يقص ক্রিয়াটা সব সময় متعدى (সকর্মক ক্রিয়া) হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং কুরআনের সর্বত্র مفعول অর্থেই এর প্রয়োগ হয়েছে।

কাজেই উপরোক্ত আয়াতাংশের সঠিক তরজমা এ রকম হবে, 'আমি তোমাকে সবচেয়ে চমকপ্রদ কাহিনী শুনাচ্ছি।'

প্রখ্যাত আরবি অভিধান لسان العرب এ এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, نحن نبين لك احسن البيان 'আমি তোমার কাছে সুন্দরতম বিবরণ তুলে ধরছি।' এ ব্যাখ্যা উপরোক্ত তরজমারই সমার্থক। কেননা অভিধানের এই উক্তিতে بيان শব্দটা مصدر হিসাবে নয় اسم হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

জবাব: তাফহীমুল কুরআনে উল্লিখিত আয়াতাংশের বক্তব্য ভাষান্তরে নিম্নরূপ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। 'আমি সুন্দরতম ভঙ্গীতে তোমার কাছে ঘটনাবলী ও তথ্যাবলী ব্যক্ত করেছি।'

শাব্দিক তরজমা করলে এভাবে করতে হতো 'আমি তোমার কাছে সুন্দরতম বর্ণনায় বর্ণনা করছি।'

কিন্তু এটা উর্দু ভাষায় একটা অপরিচিত ও উদ্ভট ধরনের বাচনভঙ্গী হতো। এ জন্য আমি 'কাহিনী বলা' এবং 'সর্বোত্তম ভঙ্গীতে বর্ণনা করা' এই দুটো কথার দ্বারা যা বুঝা যায়, সেটা উর্দু ভাষার প্রচলিত বাকধারা অনুসারেই ব্যক্ত করেছি। এবার ব্যাকরণ বিধির আলোকে এ নিয়ে আলোচনা করার আগে দেখা যাক, খ্যাতনামা আলেমগণ এ আয়াতাংশের কিরূপ তরজমা করেছেন।

শাহ অলিউল্লাহর তরজমা: ماقصه خوانیم برتوبهترین قصه خواندن 'আমি তোমার কাছে কাহিনী বলছি সর্বোত্তম কাহিনী বলা।'

শাহ রফীউদ্দিন সাহেব: 'আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা।'

শাহ আবদুল কাদের সাহেব: 'আমি বর্ণনা করছি তোমার কাছে সর্বোত্তম বর্ণনা।'

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব: 'আমি আপনার কাছে একটা খুব মজার কাহিনী বর্ণনা করছি।'

প্রথমোক্ত দুই মনীষীর উভয়েই আপনি যেটাকে ভুল মনে করেন সেটাই করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা القصص কে مصدر অর্থে গ্রহণ করে 'কিস্সা বলা' ও 'বর্ণনা করা' তরজমা

করেছেন। তবে অন্য দু'জনে একে اسم। (বিশেষ্য) ধরে নিয়ে তার অনুবাদ করেছেন 'বর্ণনা ও কিসসা'। এ থেকে বুঝা গেলো, আরবি ভাষায় এই উভয় রকমের অভিব্যক্তির অবকাশ রয়েছে। শাহ্ ওলিউল্লাহ সাহেব ও শাহ্ রফিউদ্দীন সাহেব আরবির সর্বজনবিদিত ব্যাকরণ বিধি জানতেন না, এমন কথা বলার সাহস খুব কম লোকই করতে পারে।

এবার ব্যাকরণ বিধির দৃষ্টিতে ব্যাপারটা বিচার করুন। যামাখশারীর মতে القصص শব্দটা مصدر হতে পারে কিস্‌সা বলার অর্থে। আবার বর্ণিত কিস্‌সা অর্থেও হতে পারে যেমন خبر শব্দটা হওয়া সত্ত্বেও তার অর্থ সংবাদ দেয়া না হয়ে 'প্রদত্ত সংবাদ'। مفعول কে مصدر দ্বারা নামকরণ করাও চলে, যেমন مخلوق এর নাম রাখা হয়ে থাকে। তখন القصص কে যদি مصدر অর্থে নেয়া হয়, তাহলে আয়াতাংশের বক্তব্য দাঁড়াবে এ রকম যে نحن نقص عليك احسن الاقتصاص (আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি উৎকৃষ্টতম বর্ণনা) আর যদি القصص অর্থ হয় مقصوص (বর্ণিত জিনিস) তাহলে আয়াতাংশের বক্তব্য দাঁড়াবে এ রকম نحن نقص عليك احسن ما يقص من الاحاديث (আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি এমন এক জিনিস, যা যাবতীয় বর্ণিত জিনিসের মধ্যে উত্তম।)

ইমাম রাযীও একই বক্তব্য দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি এও বলেছেন যে, قصص এর অর্থ যদি اقتصاص (কিস্‌সা বর্ণনা করা) হয়, তাহলে احسن القصص এর অর্থ হবে সর্বোত্তমভাবে কিস্‌সা বর্ণনা করা, সর্বোত্তম কিস্‌সা নয়। আর যদি قصص অর্থ হয় مقصوص (অর্থাৎ বর্ণিত কিস্‌সা) তাহলে তার অর্থ হবে বর্ণিত সর্বোত্তম কিস্‌সা।

আল্লামা আলুসী 'কাসাস'কে مصدر তথা কিস্‌সা বলার অর্থবোধক আখ্যায়িত করে আরো একটা তত্ত্ব সংযোজন করেছেন। সেটি হলো, এই বাক্যে احسن القصص শব্দটা نقص এর مفعول নয়, বরং এর مفعول উহ্য রয়েছে। مفعول হচ্ছে এই সূরার বিষয়বস্তু। এ কারণেই আমি উক্ত উহ্য مفعول কে 'ঘটনাবলী ও তথ্যাবলী' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছি।

প্রশ্ন ২ : সূরা মুমিনুনঃ আয়াত ৬৭ مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سَامِرًا تَهْجُرُوْنَ

এ আয়াতাংশে استكبار এর ب অব্যয়ের ব্যবহার সাক্ষ্য দেয় যে, এ শব্দটা এখানে استهزاء উপহাস অর্থজ্ঞাপক। কেননা আরবি ভাষায় ব্যবহৃত কোনো صله (অব্যয়) যখন সংশ্লিষ্ট শব্দের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়না, তখন সেখানে একটা মানানসই শব্দ উহ্য থাকে। যেমন فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ (তোমার প্রভুর নির্দেশের জন্য ধৈর্য ধারণ কর) صبر এর সাথে ل অব্যয়টি মানানসই নয়। তাই পুরো বাক্যটা এ রকম ধরে নিতে হবে فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ('তোমার প্রভুর নির্দেশের জন্য ধৈর্য ধারণ ও অপেক্ষা করো।') অনুরূপ خلا শব্দটার সাথে إلى সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বিধায় وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ বাক্যটির পূর্ণরূপ এরূপ হবে, وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى وَذَهَبُوْا شَيٰطِيْنِهِمْ ('আর যখন তারা শয়তানের কাছে যায় ও নিরিবিলিতে মিলিত হয়')। আলোচ্য আয়াতে سَامِرًا শব্দটা تَهْجُرُوْنَ এর مفعول ও হতে পারে। আর سامر কে যদি به এর মধ্যস্থিত ضمير مجرور এর حال ও ধরা হয় তাতেও ক্ষতি নেই। تهجرون শব্দটা প্রচলিত অর্থেই (ছেড়ে যাচ্ছো) ব্যবহৃত হয়েছে এতে উক্ত আয়াতাংশের অনুবাদ দাঁড়াবে এ রকম।

'অহংকারের বশে যেন একজন গাল গল্পকারীকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছো।'

জবাবঃ এ বিষয়টা বুঝতে হলে যে আলোচনা প্রসঙ্গে এ বাক্যটা এসেছে তাকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে। পুরো বিষয়টা এই,

- قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ • مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ •

তাফহীমুল কুরআনে এ আয়াত দু'টির ভাষান্তর নিম্নলিখিতভাবে করা হয়েছে। 'আমার আয়াতগুলো তোমাদের সামনে যখনই পড়ে শোনানো হতো, অমনি তোমরা পেছনে ফিরে পালাতে, অহংকারের চোটে তার দিকে ভ্রুক্ষেপই করতে না, নিজেদের আড্ডায় বসে তোমরা এ সম্পর্কে কথা কাটাকাটি করতে এবং আজেবাজে কথা বলতে।'

অন্যান্য তাফসিরকারগণের অনুবাদ নিম্নরূপঃ

শাহ ওলিউল্লাহ রহ. 'যখনই পড়া হতো আমার আয়াতগুলো তোমাদের সামনে, অমনি পেছনের দিকে ফিরে চলে যেতে, কুরআনের ব্যাপারে অহংকার করতে করতে। বাজে গল্পগুজবে মশগুল হয়ে ছেড়ে চলে যেতে।'

শাহ রফীউদ্দীন সাহেব রহ. 'নিশ্চয়ই আমার আয়াতগুলো পঠিত হতো তোমাদের সামনে। আর তোমরা পিছিয়ে যেতে অহংকার করতে করতে, তার ব্যাপারে গল্পগুজব করতে করতে বাজে বকতে।'

শাহ আবদুল কাদের সাহেব রহ. তোমাদেরকে শুনানো হতো 'আমার আয়াতগুলো, তখন তোমরা পেছনে ফিরে পালাতে, তা থেকে আভিজাত্য ফলিয়ে একজন কাহিনীকারকে ছেড়ে চলে যেতে।'

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.: আমার আয়াতগুলো তোমাদেরকে পড়ে পড়ে (রসূলের মুখ দিয়ে) শুনানো হতো। তখন তোমরা পেছনে ফিরে পালাতে অহংকার করতে করতে, কুরআন নিয়ে মসকরা করতে করতে; (কুরআন সম্পর্কে) আজে বাজে বকাবকি করতে করতে।'

তাফহীমুল কুরআনে مُسْتَكْبِرِيْنَ بِه এর ضمير (সর্বনাম) দ্বারা রসূলকে বুঝানো হয়েছে। আর اِسْتِكْبَارًا (অর্থাৎ অহংকার করা) শব্দটার মধ্যে عدم اعتناء (অবজ্ঞা) শব্দটা উহ্য ধরে নিয়ে এর মর্ম ব্যক্ত করা হয়েছে 'অহংকারের চোটে তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করতে না' কথাটা দ্বারা। سمر আরবি বাকধারা অনুযায়ী রাতের গালগল্প অর্থে গৃহীত হয়েছে। প্রত্যেক গোত্রের আসরে যে গালগল্পের আড্ডা বসতো, তাতেই এ কাজ চলতো। تَهْجُرُوْنَ শব্দটা প্রলাপ বকা অর্থে গৃহীত হয়েছে।

শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব, তাঁর উভয়পুত্র এবং মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব হতে বিদ্যমান ضمير দ্বারা কুরআন অথবা তা আবৃত্তিকারী রসূলকে বুঝিয়েছেন। পরবর্তী অংশে শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব, শাহ রফিউদ্দীন সাহেব এবং মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব سامر শব্দটার ব্যাখ্যা করেছেন। গল্পগুজবে মশগুল হওয়া, গালগল্প করা এবং কুরআন নিয়ে তামাশা করা দ্বারা। শুধুমাত্র শাহ আবদুল কাদের সাহেব এর ব্যাখ্যা

করেছেন এই বলে যে, কুরাইশ বংশীয় কাফেররা রসূল সা. কে سامر অর্থাৎ গল্পকার বলে আখ্যায়িত করতো। تَهْجُرُوْنَ শব্দটার অর্থ শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব ও শাহ আবদুল কাদের সাহেবের মতে ত্যাগ করা ও ছেড়ে দেয়া এবং শাহ রফিউদ্দীন সাহেব ও মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের মতে বাজে প্রলাপ বকা। এবার লক্ষ্য করুন, প্রাচীন তাফসিরকারগণ এ আয়াত দু'টির কিরূপ ব্যাখ্যা করেন।

ইবনে জারীর বলেন, سمر অর্থ রাতে গল্প করা। আর تَهْجُرُوْنَ এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হলো, তারা কুরআন বা রসূল সা. কে অবজ্ঞা করতো, এবং তাকে ত্যাগ করে যেত। দ্বিতীয়টি হলো, তারা প্রলাপ বকতো। এরপর তিনি সাহাবিগণের ও তাবেয়ীগণের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. تَهْجُرُوْنَ এর অর্থ আল্লাহর যিকর ও সত্যকে ত্যাগ করা বুঝিয়েছেন। সাঈদ ইবনে জুবাইরের মতে سَامِرًا تَهْجُرُوْنَ এর অর্থ হলো, 'রাতের গল্পগুজবে ও ইসলাম বিরোধী কথাবার্তায় মশগুল হওয়া।' মুজাহিদের মতে تَهْجُرُوْنَ এর অর্থ কুরআন সম্পর্কে অশোভন উক্তি করা। ইবনে যায়েদের মতে এ শব্দের অর্থ: প্রলাপ বকা।

যামাখশারী مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُوْنَ এর তাফসির প্রসঙ্গে বলেন,

১. به এর ضمير দ্বারা اٰيَاتِىْ (অর্থাৎ اكتابى) বুঝানো হতে পারে। এমতাবস্থায় কুরআন নিয়ে استكبار বা অহংকার করার অর্থ হবে, তারা অহংকার ভরে কুরআনকে অস্বীকার করে অথবা তার অর্থ হবে কুরআন শুনে তাদের মধ্যে অহংকার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং এভাবে তারা কুরআনের সাথে অহংকারে মেতে ওঠে।

২. به এর সম্পর্ক سامرًا এর সাথেও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে অর্থ হবে এরূপ যে, তারা রাতের আসরগুলোতে কুরআনের উল্লেখ করে তার বিরুদ্ধে বিষোদগার করে। কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের রীতি ছিলো, তারা রাতের বেলা কাবা শরীফের চারপাশে আসর জমিয়ে বসতো এবং তাদের বেশিরভাগ সময় কুরআনের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্ত ব্য করে এবং রসূল সা. কে গালাগালি করে কাটাতো।

৩. به এর সম্পর্ক تهجرون এর সাথেও হতে পারে। এর এক অর্থ অশ্লীল কথা বলা এবং অপর অর্থ প্রলাপ বকা।

ইমাম রাযী ও বায়দাবির তাফসির যামাখশারী ও ইবনে জারীরের তাফসির থেকে মোটেই পৃথক নয়।

আলুসী বলেন, مستكبرين به তে ب অব্যয়টি استكبار কে সকর্মক বানানোর জন্য হতে পারে, যাতে আনুষঙ্গিকভাবে তার ভেতরে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের অর্থও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অথবা তা কারণ বর্ণনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে। কেননা কাফেররা রসূল সা.-এর নবুয়ত লাভের কারণেই অংকারে মেতে উঠেছিলো। এমনও হতে পারে যে, به এর ضمير দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। শুরুতে اٰيات শব্দটা এ কথার যথার্থতা প্রতিপন্ন করে। به এর সম্পর্ক سامر এর সাথেও হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ব্যাখ্যা হবে এ রকম, তারা রাতের আসরে কুরআনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতো। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি বলেন, تَهْجُرُوْنَ শব্দটা هجر ধাতু থেকে উৎপন্ন

হয়েছে। যার অর্থ ছেড়ে দেয়া ও সম্পর্কচ্ছেদ করা। এখানে تَهْجُرُوْنَ কথাটা حال হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম, তারা সত্যকে, কুরআনকে অথবা রসূল সা.-কে ত্যাগ করার মনোভাব নিয়ে এ রকম করে থাকে। তাছাড়া এর আরেকটা অর্থ প্রলাপ বকাও। সে হিসেবে এর ব্যাখ্যা হবে এ রকম যে, তারা কুরআন অথবা রসূল সা.-এর বিরুদ্ধে প্রলাপোক্তি করে থাকে। تَهْجُرُوْنَ এর মূল ধাতু هجر হওয়াও বিচিত্র নয়, যার অর্থ ঘৃণ্য কথাবার্তা।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, তাফহীমুল কুরআনের ভাষান্তর এবং অন্যান্য তরজমাকারীদের তরজমা, এর কোনটার ব্যাপারেই প্রশ্নকর্তার উত্থাপিত প্রশ্ন প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন: ৩. সুরা আল ইমরান, আয়াত ১৮২ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

এ বাক্যটার সঠিক অনুবাদ এরকম হবে, 'আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাহদের উপর একটুও জুলুমকারী নন।' (ظلام শব্দটা اسم فاعل مبالغة) আরবিতে نفى এর উপর نفى এলে তার উদ্দেশ্য হবে مبالغة فى النفى

জবাব: এটা কোনো নিরংকুশ বিধি নয় যে, যখনই مبالغة তে আসবে তখনই তার অর্থ بالغة فى النفى হবে। ظلام অর্থ বড় যালেম। যখন বলা হবে যে অমুক ظلام নয়, তখন তার এরূপ অর্থ হবে না যে, সে একবারেই যুলুম করে না। বরং তার অর্থ হবে, সে তেমন বড় যালেম নয়। শ্রোতা এ কথা শুনে এটাই বুঝবে যে, সে কিছু না কিছু যুলুম অবশ্যই করে থাকে। এ জন্যই তাফহীমুল কুরআনে এ বাক্যটির অনুবাদ এভাবে করা হয়েছে যে, 'আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাহদের উপর যালেম নন।' অন্যান্য অনুবাদকরাও এ ধরনের অনুবাদ করেছেন। শাহ্ ওলিউল্লাহ্ সাহেবের অনুবাদ হলো: 'আল্লাহ্ বান্দাহদের উপর যুলুমকারী নন।'

শাহ রফি উদ্দীন সাহেবের অনুবাদ এরূপ: 'আল্লাহ্ যুলুমকারী নন বান্দাদের জন্য'। শাহ আব্দুল কাদের সাহেব অনুবাদ করেছেন এভাবে: 'আল্লাহ যুলুম করেন না বান্দাহদের উপর'। মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব অনুবাদ করেন: 'আল্লাহ বান্দাদের উপর যুলুমকারী নন'।

এভাবে কাউকে যালেম নয় বলা দ্বারা সে যে বড় যালেম নয়, সে কথা আপনা আপনিই বলা হয়ে যায়। আলাদা করে এর প্রয়োজন থাকে না। যিনি যালেম নন, তাঁর বড় যালেম হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

এ প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বুঝে নিন। আল্লাহ শুধু এ কথাতেই নয়, আরো বহু আয়াত নিজের সম্পর্কে 'যালেম নন' বলে 'বড় যালেম নন' বলেছেন। এর কারণ হলো, সৃষ্টিকর্তা যদি নিজের বান্দাহদেরকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেন, তাহলে তিনি যে শুধু যালেমই হবেন না বরং সাংঘাতিক রকমের যালেম বলে গণ্য হবেন। সুতরাং একথাটা বলে তিনি আসলে স্বীয় বান্দাহদের মনে এ কথাই বদ্ধমূল করতে চান যে, যে খোদা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, তিনি তাদেরকে সহজে শাস্তি দেননা। যখন তারা ঔদ্ধত্য ও অহংকারের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং নিজেদের কৃতকর্ম দ্বারা নিজেদেরকে

শাস্তির যোগ্য করে তোলে, কেবল তখনই শাস্তি দেন। নচেত সৃষ্টিকর্তা স্বীয় সৃষ্টির প্রতি দয়াশীল হবেন এটাই স্বাভাবিক। যালেম তিনি কখনো হতে পারেন না।

প্রশ্ন: ৪. সূরা হজ্ব, আয়াত ১৫

ثُمَّ لِيَقْطَعْ এখানে لِيَقْطَعْ অর্থ হবে কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া। সূরা নামলের ৩২নং আয়াতে আছে,

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ

অর্থাৎ আমি কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেই না, যতোক্ষণ আপনারা উপস্থিত থেকে পরামর্শ না দেন। সুতরাং সূরা হজ্বের ১৫নং আয়াতের অর্থ হবে এ রকম, 'সে যেন একটা রশির সাহায্যে আকাশে গিয়ে পৌছে, অতঃপর নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়, তারপর সে দেখুক, তার চেষ্টা তার দুশ্চিন্তা দূর করতে পারে কিনা।'

জবাব: আরবিতে قطع শব্দের অর্থ সিদ্ধান্ত নেয়া একথা সম্পূর্ণ ভুল। অভিধানের কোনো গ্রন্থ থেকে এর সমর্থন পাওয়া যাবে না। সূরা নামলের আয়াতে শুধু নয় বরং قاطعة امرًا ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি বাগধারায় তো সত্যিই সিদ্ধান্ত নেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শুধু قطع এর এ অর্থ কিছুতেই হয় না। ضرب فى الارض অর্থ পৃথিবীতে চলাচল করা ও ভ্রমণ করা। তাই বলে কেউ যদি শুধু অর্থও ضرب ভ্রমণ করা বুঝে নেয় এবং فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ এর অর্থ এরূপ গ্রহণ করে যে, 'আমি মূসাকে বললাম: তোমার লাঠি নিয়ে পাথরের উপর আরোহণ করো' তাহলে যে অবস্থা দাঁড়াবে, শুধু قطع কে চূড়ান্ত ফায়সালা করা অর্থে গ্রহণ করাও তেমনি।

সূরা হজ্বে এ শব্দটা যে আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে তা একটা ধারাবাহিক আলোচনার অংশ। দ্বিতীয় রুকুর শুরু থেকেই এ আলোচনাটা চলে আসছে। সেখানে বলা হয়েছে, কতক লোক এমন রয়েছে যারা হক ও বাতিলের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে। যদি সে তাতে উপকার লাভ করে তাহলে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হয়। আর কোনো বিপদ এলে অমনি পেছনে ফিরে যায় এবং বিভিন্ন উপাসনালয়ে গিয়ে কপাল ঠেকাতে থাকে। অথচ সেখানে ক্ষতি বা উপকার করার কোনো ক্ষমতাই কারোর নেই। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে আল্লাহ তাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত থাকবে। আসলে আল্লাহ তায়ালাই যা ইচ্ছে করার একমাত্র ক্ষমতা রাখেন। এরপর বলা হয়েছে:

مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّـهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ

তাফহীমুল কুরআনে এ আয়াতটির ভাষান্তর এভাবে করা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার কোনো সাহায্য করবেন না, সে একটা রশি লাগিয়ে আকাশে আরোহণ করে সেখানে একটা ছিদ্র করুক। তারপর দেখুক যে, তার চেষ্টা তার অপছন্দনীয় জিনিসকে ঠেকাতে পারে কিনা।' এখানে ধারণাকারী বলে সেই ব্যক্তিকেই বুঝানো হয়েছে, যে প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করে এবং আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন না, এ ধারণা তারই বলে আখ্যায়িত করা

হয়েছে। এরপর পরবর্তী বক্তব্যের এ তাৎপর্য আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে বিভিন্ন উপাসনালয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, পারলে সে আকাশ পর্যন্ত গিয়ে দেখুক আল্লাহর নির্ধারিত অদৃষ্ট, যা তার অপছন্দনীয়, তাকে সে বদলাতে পারে কিনা।

এবার এটাও দেখুন যে, খ্যাতনামা আলেমদের অনুবাদের কোনোটিতেও ثُمَّ لْيَقْطَعْ এর যে অর্থ আপনি নিয়েছেন সে অর্থ নেয়া হয়নি।

শাহ ওলিউল্লা সাহেবের অনুবাদঃ 'তাহলে সে একটা রশি লটকিয়ে নিক উপরের দিকে, অতঃপর সে আরোহণ করুক। তারপর দেখুক, এ চেষ্টা সেই জিনিস হটিয়ে দেয় কিনা যা তাকে ক্রুদ্ধ করে।'

শাহ রফিউদ্দীন সাহেবঃ 'তাহলে সে যেন একটা রশি টেনে নিয়ে যায় আকাশের দিকে, অতঃপর সে যেন কেটে দেয়। তারপর সে যেন দেখে, তার চালাকি কি সেই জিনিস সরিয়ে নিয়ে যাবে, যা তাকে রাগান্বিত করে?'

শাহ আব্দুল কাদের সাহেবঃ 'তাহলে সে একটা রশি টানাক আকাশের দিকে, তারপর কেটে দিক। তারপর দেখুক, তার চেষ্টা দ্বারা কিছু অবসান হলো কিনা তার মনের রাগের।'

মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবঃ 'তাহলে তার উচিত আকাশ পর্যন্ত একটা রশি টানানো, তারপর (তা দ্বারা আকাশে পৌঁছা যদি সম্ভব হয়) সে যেন এই ওহীকে বন্ধ করিয়ে দেয়। সুতরাং এখন ভেবে দেখা উচিত, এই কৌশল তার অপছন্দের জিনিস (অর্থাৎ ওহীকে) বন্ধ করতে সক্ষম কিনা।'

তাফসিরকারদের যে সব উক্তি ইমাম রাযী ও আল্লামা আলুসী উদ্ধৃত করেছেন, তাও দেখুন।

১. মুসলমানদের একটি গোষ্ঠী মোশরেকদের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র আন্দোলনের দরুন আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বীয় রসূল ও স্বীয় দীনের সাহায্য আসতে দেরি হতে দেখে অত্যন্ত অস্থির হচ্ছিলো। এ জন্য বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি ভাবে যে, আল্লাহ তার রসূলের সাহায্য করবেন না, সে যতো পারে চেষ্টা করে দেখুক, এমন কি কোনো রশির মাধ্যমে আকাশ পর্যন্ত যেতে পারে তো তাও যেয়ে দেখুক তার এ কৌশল আল্লাহর সাহায্য আসার পথে যে বিলম্ব ঘটার কারণে তার ক্ষোভের উদ্রেক হয়েছে, তা দূর হয় কিনা।'

২. কাফেররা ভাবতো যে, আল্লাহ তার রসূলকে সাহায্য করবে না। তাই তাদেরকে বলা হয়েছে যে, কোনো রশীর সাহায্যে আকাশ পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারলে তাও করে দেখ যে, আল্লাহর যে সাহায্যের কথা শুনে তোমরা পুড়ে মরছ, আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলের কাছে তার আগমন রোধ করতে পার কিনা।

৩. এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যাও করা হয়েছে যে, যদি সাধ্য থাকে, তাহলে আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে রসূলের কাছে ওহি আগমনের ধারা, যা তোমাদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর, বন্ধ করার চেষ্টা করে দেখ।

৪. কোনো কোনো তাফসিরকার আকাশ দ্বারা ঘরের ছাদ বুঝিয়েছেন এবং আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর মদদের আশা রাখে না, সে যেন নিজের ঘরের ছাদের সাথে রশি ঝুলিয়ে ফাঁসি নিয়ে নেয় এবং তারপর সে যেন দেখে যে, আল্লাহর মদদ না আসায় তার যে রাগ হচ্ছিলো তা এ

কৌশল দ্বারা দূরীভূত হয় কিনা। যারা এই ব্যাখ্যাটা দেয়ার প্রবক্তা, তারা এর অর্থ গ্রহণ করেন শ্বাসনালী ছিন্ন করে দেয়া।

সুতরাং বুঝা গেলো, তাফসিরকারদের কারো মতেই অর্থ সিদ্ধান্ত নেয়া নয়। বরং সকলেই এ দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা রূপক অর্থে কর্তন করাই বুঝান।

প্রশ্নঃ ৫. সূরা আনফাল, আয়াত ৬৭-৬৯

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ • لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ • فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ •

সচরাচর উল্লিখিত আয়াত কয়টির অনুবাদ এভাবে করা হয়ে থাকে, 'নবীর জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, পৃথিবীতে চরমভাবে রক্তপাত না করা পর্যন্ত তার হাতে যুদ্ধবন্দী থাকুক' এই মর্ম ব্যক্ত করার জন্য اثخان فى الارض শব্দাবলী আদৌ সঙ্গত নয়। একথাই যদি বলতে চাওয়া হতো তাহলে حتى يثخنهم বলা হতো।

لولا كتاب من الله কথাটাও কুরআনে সাধারণভাবে কাফেরদেরকে সময় দেয়ার খোদায়ী নীতি বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সত্যি কথা হলো, বদর যুদ্ধে রক্তপাত নেহাৎ কম হয়নি।

فِيمَا أَخَذْتُمْ এ ধরনের বাচনভঙ্গীতে 'নীতি অবলম্বন' ও 'পদ্ধতি গ্রহণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আয়াতগুলোর পটভূমি হলো, বদর যুদ্ধের পর যখন মুক্তিপণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, তখন কাফেররা অপপ্রচারে মেতে উঠলো যে, মুসলমানরা কেবল দুনিয়াবী স্বার্থান্বেষী। এ সব যুদ্ধবিগ্রহ সত্যের জন্য নয়, কেবল গণিমতের সম্পদ আহরণের জন্য চালানো হয়েছে। যুদ্ধবন্দীদেরকে গ্রেফতার করলেও তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। নবুয়ত তো কেবল মুখের বুলি। আসল অভীষ্ঠ হলো অর্থ এবং তার জন্যই দল গঠন করা হয়েছে। এই অপপ্রচার খণ্ডনের জন্যই আল্লাহ বললেনঃ

"পৃথিবীতে রক্তপাত না করা পর্যন্ত যুদ্ধবন্দী হস্তগত হবে, এটা নবীর জন্য সংগত নয়। (হে মক্কার কুরাইশগণ!) তোমরা তো কেবল দুনিয়াই চাও। আল্লাহতো চান শুধু আখেরাত। আল্লাহ মহাপ্রতাপান্বিত মহাকৌশলী। আল্লাহর কাছে যদি আগে থেকেই নির্ধারিত না থাকতো (যে তোমাদেরকে সময় দেবেন), তাহলে তোমরা যে নীতি অবলম্বন করেছিলে, তার পরিণামে তোমাদের উপর কঠিন আযাব আসতো।"

জবাবঃ যে পটভূমির ভিত্তিতে এই নতুন অনুবাদ উদ্ভাবন করা হয়েছে, প্রথমত সেই পটভূমিই ভুল। হাদিস কিংবা ইতিহাসের কোথাও আদৌ এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, মুক্তিপণ গ্রহণে কুরাইশরা প্রশ্নকর্তার কথিত অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছিল এবং তার জবাবে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল। এটা একটা মনগড়া ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। এ ধরনের মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে কুরআনের আয়াতের তাফসির করা কোনক্রমেই জায়েয নয়। আসল পটভূমি এই যে, সূরা মুহাম্মাদের ৪ নং আয়াতে যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করার অনুমতি এই শর্তে দেয়া হয়েছিল যে, কাফেরদের সাথে

যখন লড়াই হবে তখন প্রথমে তাদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে তাদেরকে ভালোমত নির্মূল করে দিতে হবে। বাদবাকীদেরকে যুদ্ধবন্দী করতে হবে। এরপর মুসলমানদেরকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল যে, ইচ্ছে করলে তাদের প্রতি অনুকম্পা দেখতে পারে অথবা মুক্তিপণ আদায় করতে পারে। ঐ আয়াতের প্রারম্ভিক কথা فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের মোকাবিলা হবে) থেকে স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর এ নির্দেশ যখন নাযিল হয়, যুদ্ধবিগ্রহ তখনও শুরু হয়নি। এ জন্য সর্বপ্রথম বদর যুদ্ধের ক্ষেত্রেই এ নির্দেশ প্রযোজ্য হয়। বদর যুদ্ধে মুসলিম বীরযোদ্ধারা যে ইসলামের প্রতিরক্ষায় মরণপণ লড়াই করে নিজেদের চেয়ে তিনগুণ বৃহত্তর শক্তিকে পরাস্ত করেছিলেন, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু إِثْخَان তথা ব্যাপকভাবে শত্রু বধের শর্ত পূরণ না করেই তারা যুদ্ধবন্দী ধরার কাজে ব্যাপৃত হন। সাদ ইবনে মায়ায এ ব্যাপারটা তাৎক্ষণাত রসূল সা.-এর কাছে তুলে ধরেছিলেন। সে সময় তিনি একটা উঁচু জায়গা থেকে রসূল সা.-এর সাথে যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। মুজাহিদগণকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কুড়ানো এবং বন্দী ধরার কাজে ব্যাপৃত দেখে তাঁর মুখমণ্ডলে অসন্তোষের চিহ্ন ফুটে উঠেছিলো। তা দেখে রসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে সাদ, মনে হচ্ছে, এ ক্রিয়াকলাপ তোমার ভালো লাগছে না।' তিনি বললেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ, সত্যিই তাই। এ প্রথমবার আল্লাহ তায়ালা মোশরেকদেরকে পরাজিত করেছেন। এ সময় তাদেরকে গ্রেফতার করার চাইতে ভালো মতো নির্মূল করাই হতো উত্তম। (অর্থাৎ আতঙ্কিত হয়ে পলায়নরত কাফেরদেরকে বেশি করে হত্যা করে তাদের শক্তি চূর্ণ করে দিলে ভালো হতো।)' এ বক্তব্যকেই সমর্থন করে আল্লাহ তায়ালা সূরা আনফালের এ আয়াতগুলো নাযিল করেন।

এবার দেখুন, তাফহীমুল কুরআনেই বা এর ভাষান্তর কিভাবে করা হয়েছে, আর অন্যান্য মান্যগণ্য তরজমাকারীগণই বা তার কি তরজমা করেছেন।

তাফহীমুল কুরআন: 'কোনো নবীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি পৃথিবীতে শত্রুদেরকে ভালোমত নির্মূল না করা পর্যন্ত তার কাছে যুদ্ধবন্দীরা জড় হবে। তোমরা দুনিয়ার লাভ চাও অথচ আল্লাহ চান আখেরাত। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ। যদি আগে থেকে আল্লাহর লিপি লিখিত না থাকতো, তাহলে তোমরা যা আদায় করেছ তার দরুন তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হতো। এখন যে সম্পদ অর্জন করেছ, তা খাও। কারণ তা হালাল ও পবিত্র। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।' (উর্দু থেকে)

শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব: 'সঙ্গত নয় নবীর জন্য যে, তার হাতে যুদ্ধবন্দীরা থাকবে, যতোক্ষণ না ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করবে পৃথিবীতে। তোমরা চাও দুনিয়ার সম্পদ, আর আল্লাহ চান আখেরাতের কল্যাণ। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রাজ্ঞ। যদি না থাকতো আল্লাহর পূর্ব সিদ্ধান্ত, তোমরা যা কিছু নিয়েছ তার জন্য তোমাদের উপর আপতিত হতো কঠিন শাস্তি। অতএব যা গণিমত হিসেবে নিয়েছ, তা খাও হালাল ও পবিত্র হিসাবে। আর ভয় করো আল্লাহকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।' (ফারসী থেকে)

শাহ্ বদিউদ্দীন সাহেবঃ 'উপযুক্ত ছিলনা নবীর জন্য যে, তার কাছে বন্দীগণ থাকবে, যতোক্ষন না তিনি রক্তপাত ঘটাবেন পৃথিবীতে। তোমরা আকাঙ্খা করো দুনিয়ার উপকরণ, আল্লাহ্ আকাঙ্খা করেন আখেরাত। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যদি আগেই লিখিত না থাকতো, তাহলে অবশ্যই তোমরা যা নিয়েছ তার জন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করতো বিরাট শাস্তি। অতএব যে জিনিস তোমরা গণিতম হিসেবে নিয়েছ, তা থেকে খাও হালাল ও পবিত্র রূপে। আর ভয় করো আল্লাহ্কে। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী দয়ালু।' (উর্দু থেকে)

শাহ্ আব্দুল কাদের সাহেবঃ 'নবীর কি এটা উচিত যে, তার কাছে বন্দী আসবে যতোক্ষণ না তিনি দেশে হত্যাকাণ্ড ঘটাবেন? তোমরা চাও দুনিয়ার সম্পদ আর আল্লাহ্ চান আখেরাত। আর আল্লাহ্ পরাক্রান্ত সুবিজ্ঞ। যদি না থাকতো আগের লিখিত অথবা কথা, তাহলে তোমাদের উপর এই নেয়ার দায়ে এসে পড়তো বিরাট আযাব। অতএব যে হালাল ও নির্দোষ গণিমত হচ্ছে, তা খাও এবং ভয় করতে থাকো আল্লাহ্কে। আল্লাহ্ ক্ষমাকারী ও দয়ালু।' (উর্দু থেকে)

মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবঃ 'নবীর পক্ষে এটা শোভন নয় যে, তাঁর হাতে বন্দী অবশিষ্ট থাকুক (বরং তাদেরকে হত্যা করে ফেলা উচিত ছিলো)। যতোক্ষণ না তিনি পৃথিবীতে ভালোমত (কাফেকদের) রক্তপাত করেন। তোমরাতো দুনিয়ার সহায়সম্পদ চাও, আর আল্লাহ্ আখেরাত (এর কল্যাণ) চান। আর আল্লাহ্ অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অত্যন্ত প্রজ্ঞাবন। আল্লাহ্র একটা লিখন যদি আগে থেকে নির্ধারিত না থাকতো, তাহলে যে ব্যবস্থা তোমরা অবলম্বন করেছ, তার জন্য তোমাদের উপর কোনো কঠোর শাস্তি আসতো। যা হোক তোমরা যা কিছু নিয়েছ, তাকে হালাল পবিত্র মনে করে খাও এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, অতীব করুণাময়।' (উর্দু থেকে)

এখন তাহলে দেখুন, শুধু তাফহীমুল কুরআনেই নয়, অন্য সকল প্রামাণ্য অনুবাদেও সেই দৃষ্টিভঙ্গির কোনো আভাস পর্যন্ত পাওয়া যায় না, যেটা আপনি এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় গ্রহণ করেছেন। এরপর আপনি পূর্বতন তাফসিরকারগণের ভাষ্যও লক্ষ্য করুন।

ইবনে জারীরঃ حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ যতোক্ষণ তিনি পৃথিবীতে মোশরেকদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা না করেন এবং তাদেরকে শক্তি প্রয়োগে পরাভূত না করেন। অর্থাৎ হে বদর যোদ্ধাগণ, যদি লওহে মাহফুযে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য আগে থেকেই এই মর্মে ফায়সালা লিপিবদ্ধ হয়ে না থাকতো যে, তিনি তোমাদের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করবেন। তাহলে যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও মুক্তিপণ তোমরা আদায় করেছ, দার দরুন তোমাদের উপর এক ভয়াবহ শাস্তি নাযিল হতো।

যামাখ্শারীঃ اثخان অর্থ হলো ব্যাপক ও অত্যধিক হত্যাকাণ্ড। অর্থাৎ প্রথমে কাফেরদের মধ্যে ব্যাপকভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে খোদাদ্রোহী শক্তিকে দুর্বল ও পর্যুদস্ত এবং ইসলামকে পরাক্রম ও ক্ষমতার দাপট দ্বারা বিজয়ী ও দুর্দম করে তুলতে হবে। এরপরে বন্দী আটক করতে হবে।

ইমাম রাযীঃ পৃথিবীতে রক্তক্ষয় না করা পর্যন্ত বন্দী হস্তগত করা নবীর পক্ষে সঙ্গত নয়, আল্লাহর এ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বন্দী করাতো শরিয়ত সম্মত ছিলো। কিন্তু এই শর্তে যে, আগে পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে اثْخَانَ করে নিতে হবে। আর اثخان এর অর্থ হলো, ব্যাপকভাবে শত্রু নিধন করা এবং প্রবল ভীতি ও আতংক সৃষ্টি করা। সূরা মুহাম্মদে আল্লাহর এ উক্তি।

حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً

'অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে ভালোমত নিধন করে নেবে, তখন বন্দীদেরকে ধরা শুরু করো। তারপর ইচ্ছা হয় মহানুভবতার আচরণ করো, না হয় মুক্তিপণ আদায় করো।' তা দ্বারা আরো নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, আগে শত্রুনিধন সম্পন্ন করে তারপরে বন্দী আটক করাই শরিয়তের বিধান।

বায়যাবীঃ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ অর্থাৎ যদি আল্লাহর তরফ থেকে লওহে মাহফুযে আগেই এ সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়ে না থাকতো لَمَسَّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের উপর আপতিত হতো। فِيمَا اَخَذْتُمْ অর্থাৎ যে মুক্তিপণ তোমরা আদায় করেছ তা পরিণামে।

আলুসীঃ ثخانت (اثْخَان এর মূল ধাতুরূপে) এর মূল অর্থ হচ্ছে, কোনো তরল পদার্থের গাঢ় হওয়া ও ঘন হওয়া। অতঃপর রূপক অর্থে এ শব্দ হত্যা করা ও আহত করার ক্ষেত্রে আধিক্য ও আতিশয্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। কেননা হত্যা ও জখম প্রাণীদেহকে অচল ও স্তব্ধ করে দেয়, এর ফলে নিহত ও আহত ব্যক্তি সেই গাঢ় পদার্থের মতো হয়ে যায়, যা প্রবাহিত হয় না। অর্থাৎ তোমাদের উপর আপতিত হতো বা তোমাদের ভোগ করতে হতো (অর্থাৎ আযাব) فِيمَا اَخَذْتُمْ অর্থাৎ তোমরা যা নিয়েছ বা যে মুক্তিপণ আদায় করেছ তার ফলে।

আহকামুল কুরআন (জাস্‌সাস): مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ এর সুস্পষ্ট প্রতিপাদ্য এই যে, গণিমত আহরণ ও বন্দী আটক করা 'ইসখানের' (ব্যাপক শত্রু নিধনের) পর বৈধ। আল্লাহ তায়ালা আবার একটি আয়াতে (অর্থাৎ সূরা মুহাম্মদের আয়াতে) বলেছেন, فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَشُدُّوا الوَثَاقَ (যখন কাফেরদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ বাঁধবে, তখন তাদেরকে নিধন করো। এভাবে যখন তাদেরকে পর্যুদস্ত করে ফেলবে, তখন বন্দীদেরকে আটক করো।) সে সময়ে পয়লা কর্তব্য ছিলো হত্যা করা এবং হত্যা করে করে কাফেরদেরকে চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত করে দেয়া। তারপরে মুক্তিপণ নেয়া বৈধ ছিলো। হত্যা করে কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করার আগে মুক্তিপণ আদায় করা বৈধ ছিলনা। পরবর্তী পর্যায়ে ইমাম জাস্‌সাস এই মর্মে উমর রা.-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, فِيمَا اَخَذْتُمْ দ্বারা মুক্তিপণই বুঝানো হয়েছে।

যারা আরবি ভাষাজ্ঞানেও শীর্ষস্থানীয় ছিলেন এবং কুরআনের আয়াতসমূহের মর্ম ও তাৎপর্য উপলব্ধিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাদেরই তাফসির উপরে উল্লেখ করা হলো। আপনার মতে যে ব্যাখ্যা সঙ্গত নয়, তারা সকলে সেই ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেছেন। আপনি যেটাকে কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহর চিরস্থায়ী নীতি বলে মনে করেছেন।

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ কে সেই সময় দেয়ার অর্থে তাদের কেউ গ্রহণ করেননি। কুরাইশদের যে অপপ্রচারের জবাবে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল বলে আপনি বলেন, সেই অপপ্রচারের আভাসও তারা দেননি। প্রথম আয়াতের অর্থ কোনো তাফসিরকার এরূপ করেননি যে, اثخان فِى الْاَرْضِ (পৃথিবীতে ব্যাপক রক্তপাত করা) রসূল সা.-এর জন্য সমীচীন ছিলনা। تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا থেকে শুরু করে عَذَابٌ عَظِيْمٌ পর্যন্ত দুটি আয়াতের সমগ্র বক্তব্য কুরাইশ কাফেকদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এ কথা কেউ বলেননি। তা যদি হয়, তাহলে আপনার কাছে এ প্রশ্নের কি জবাব আছে যে, عَذَابٌ عَظِيْمٌ এর অব্যবহিত পর যে فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ (অতএব যে গণিমত তোমরা সংগ্রহ করেছ তা খাও) বলা হয়েছে, তা আপনার কথিত ব্যাখ্যা অনুসারে পূর্ববর্তী বক্তব্যের সাথে কিভাবে সংগতিপূর্ণ হয়?

(উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সূরা আনফাল ও সূরা মুহাম্মদের উপরোক্ত দুটি স্থানে যে 'ব্যাপক রক্তপাত' এর কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা প্রচলিত অর্থে 'গণহত্যা'র সমর্থন বুঝায় না। উল্লিখিত আয়াতগুলোতে যে 'ব্যাপক রক্তপাত' বা اثخان এর উল্লেখ করা হয়েছে তা শুধু রণাঙ্গনে এবং সক্রিয় যুদ্ধ চলাকালে আক্রমণরত প্রতিপক্ষীয় সৈনিকদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। আর প্রচলিত পরিভাষায় 'গণহত্যা' সামরিক বেসামরিক নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের হত্যাকাণ্ড বুঝায়, যা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। (অনুবাদক)

প্রশ্নঃ৬ সূরা যুখরুফ, আয়াত ৬১ 'সূরা যুখরুফের ৬১ নং আয়াত কোনোক্রমেই আল্লাহর উক্তি নয়। (বরং রসূলের উক্তির উদ্ধৃতি)। কেননা اِتِّبَاعٌ (অনুসরণ) শব্দটা কেবল নবীদের অনুসরণের ব্যাপারেই ব্যবহৃত হয়। তাই আয়াতের সঠিক অনুবাদ নিম্নরূপে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

'হে নবী! তাদেরকে বলো যে, তিনি (ঈসা আ.) হচ্ছেন কেয়ামতের নিদর্শন। কাজেই এ ব্যাপারে সন্দেহ করো না এবং আমার অনুসরণ করো। এটা সরল সোজা পথ।'

জবাবঃ এ আয়াতের তাফসিরের ব্যাপারে কুরআনের অনুবাদক ও তাফসিরকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ পুরো আয়াতটাকে আল্লাহ তায়ালার উক্তি বলে অভিহিত করেছেন। আবার কারো কারো মতে 'এ ব্যাপারে সন্দেহ করো না' পর্যন্ত আল্লাহর উক্তি এবং 'আমার অনুসরণ করো' থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত রসূল সা.-এর উক্তির উদ্ধৃতি। প্রথমে বিভিন্ন অনুবাদ লক্ষ্য করুন।

তাফহীমুল কুরআনঃ 'আর সে (ঈসা আ.) আসলে কেয়ামতের একটা নিদর্শন। কাজেই তাকে নিয়ে সন্দেহ পোষণ করো না। আমার কথা মেনে নাও। এটাই সঠিক পথ।' (এর বিশদ ব্যাখ্যা তাফহীমুল কুরআন, সূরা যুখরুফ, ৫৫ নং টীকায় দেখুন।)

শাহ ওলিউল্লা সাহেবঃ 'নিশ্চয়ই ঈসা কেয়ামতের নিদর্শন। অতএব কেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ করো না। আর হে মুহাম্মদ তুমি বলোঃ আমার অনুসরণ করো। এটাই সঠিক পথ।'

শাহ রফিউদ্দীন সাহেবঃ 'অবশ্যই তিনি কেয়ামতের আলামত। অতএব সন্দেহ করো না সে সম্পর্কে। আর অনুসরণ করো আমাকে। এটা একটা সোজা পথ।'

শাহ্ আব্দুল কাদের সাহেব: 'আর সে সেই মুহূর্তটির নিদর্শন। অতএব এ ব্যাপারে প্রবঞ্চনা করো না এবং আমার কথা মানো। এটা একটা সোজা পথ।'

মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব: 'আর তিনি (অর্থাৎ ঈসা) কেয়ামত বিশ্বাসের মাধ্যম। কাজেই তোমরা তার (যথার্থতা) সম্পর্কে সন্দেহ করো না। তোমরা আমার অনুসরণ করো। এটা সঠিক পথ।'

উপরোক্ত অনুবাদসমূহের মধ্যে একমাত্র শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব খোলাখুলি বলেছেন যে, 'আমার অনুসরণ করো। এটাই সঠিক পথ' এটা রসূল সা.-এর উক্তি যা আল্লাহর নির্দেশক্রমে তিনি বলেছেন। এরপর এখন প্রাচীন তাফসিরকারদের মতামত লক্ষ্য করুন।

ইবনে জারীর বলেন, আল্লাহর উক্তি এবং এর অর্থ হলো: 'আমার আনুগত্য করো। আমি যে আদেশ দেই তা পালন করো, আর যা করতে নিষেধ করি, তা থেকে বিরত থাকো।' যামাখশারীর মতও তাই। তার মতে وَاتَّبِعُوْنَ এর অর্থ হলো, আমার অনুসরণ করো। অর্থাৎ আমার হেদায়াত, আমার শরিয়ত এবং আমার রসূলের অনুসরণ করো। আবার এরূপ মতও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, রসূল সা.কে এর কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইমাম রাযী, কাযী বায়যাবী এবং আল্লামা আলুসীও এই ব্যাখ্যাই করেছেন। তারা সকলে وَاتَّبِعُوْنَ এর প্রথম ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'আমার হেদায়াত, আমার শরিয়ত এবং আমার রসূলের অনুসরণ করো।' দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটা এভাবে করেছেন, কারো কারো মতে এ কথাটা রসূল সা.কে বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সুতরাং এ কথা বলার কোনোই অবকাশ নেই যে, বা 'অনুসরণ' শব্দটা শুধু নবীদের অনুসরণ বুঝাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এটা কোনোক্রমেই আল্লাহর উক্তি নয়।

প্রশ্ন: ৭. সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৮৫ থেকে ৮৯ আলোচ্য স্থানে شَهِدَ بِالْحَقِّ কথাটার সাথে وَقِيْله এর عطف (সংযোজন) হয়েছে। আয়াত কয়টির মর্মার্থ এরূপ।

'তাঁকে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে ডাকে, তারা কোনো সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে না। তবে কেউ যদি সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয়, তবে সে কথা ভিন্ন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ যে, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে। তাহলে তারা স্বতই বলবে, আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। এরপরও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? তবে যে ব্যক্তি এই বলে সাক্ষ্য দেয় যে, হে প্রতিপালক, এরা এমন এক সম্প্রদায়, যারা মানতে চায়না। বেশ, হে নবী! তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং বলো, তোমাদের উপর সালাম! শ্রীঘ্রই ওরা জানতে পারবে।'

জবাব: এটা একটা জটিল বিষয়। এটা বুঝতে হলে সমগ্র আলোচনার ধারা নজরে থাকা দরকার। ৬৫ নং আয়াত থেকে ৬৯ নং আয়াত পর্যন্ত মূল কথাগুলো এরূপ:

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ • وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ • وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ • وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَـٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ • فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ •

তাফহীমুল কুরআনে এ আয়াতগুলোকে এভাবে ভাষান্তরিত করা হয়েছে, 'সেই সত্তা অত্যন্ত মহিমান্বিত, যার করায়ত্তে রয়েছে আকাশ, পৃথিবী ও আকাশ পৃথিবীর মাঝখানে বিদ্যমান সকল জিনিসের রাজত্ব। তিনিই কেয়ামতের সময়ের জ্ঞান রাখেন এবং তোমাদের সকলকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। তাকে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে ডাকে, তাদের কোনো সুপারিশ করার ক্ষমতা নেই। তবে কেউ নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দিয়ে থাকলে তার কথা আলাদা। তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, কে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তাহলে তারা নিজেরাই বলবে যে, আল্লাহ। তারপরও তারা কোথা থেকে এ ধোঁকা খাচ্ছে? রসূলের এই উক্তির কসম যে, হে প্রতিপালক, এরা এমন সম্প্রদায় যারা ঈমান আনেনা। ঠিক আছে, হে নবী, তুমি ওদেরকে মাফ করে দাও এবং বলো, তোমাদেরকে সালাম। অচিরেই তারা জানতে পারবে।'

শাহ ওলিউল্লাহ সাহেবের অনুবাদঃ 'অত্যন্ত বরকতময় তিনি, যিনি আকাশ, পৃথিবী এবং এই উভয়ের মাঝখানে অবস্থিত সকল জিনিসের রাজত্বের মালিক। তার কাছেই রয়েছে কেয়ামতের জ্ঞান এবং তার দিকেই তোমরা ফিরে যাবে। আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে কাফেররা পূজা করে থাকে, তারা সুপারিশ করতে পারবেনা, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে সত্যের সাক্ষ্য দেয় এবং তারা জানে।

আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, কে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ সৃষ্টি করেছে। অতএব তারা কোথায় ঘুরে যাচ্ছে। আর নবী এরূপ দোয়া বহুবার করে থাকেন যে, হে প্রভু! এরা এমন একটা গোষ্ঠী, যারা ঈমান আনার পাত্র নয়। আমি বললাম, বেশ, তাহলে তুমি তাদেরকে এড়িয়ে চলো এবং বিদায়ী সালাম বলো। তারা জানতে পারবে।' (ফারসী থেকে)

শাহ রফিউদ্দীন সাহেবের অনুবাদঃ 'অত্যন্ত বরকতময় তিনি, যার আধিপত্য রয়েছে আকাশ, পৃথিবী এবং তন্মধ্যকার সবকিছুর রাজত্ব। তার কাছেই রয়েছে কেয়ামতের জ্ঞান এবং তার দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। আর সুপারিশের ক্ষমতাও নেই তাদের, যাদেরকে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডাকে। তবে যে ব্যক্তি জেনেশুনে সত্যের সাক্ষ্য দেয় তার কথা ভিন্ন রকম। আর যদি জিজ্ঞাসা করো কে সৃষ্টি করেছে তাদেরকে, তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। অতএব তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? আর নবী প্রায়ই বলে থাকেন, হে প্রভু! নিশ্চয়ই এ জাতি ঈমান আনার পাত্র নয়। তাহলে তুমি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং বলো, তোমাদের অকল্যাণ থেকে নিরাপত্তা চাই। অতএব তারা অবশ্যই জানতে পারবে।'

শাহ আব্দুল কাদের সাহেবের অনুবাদঃ 'অতিশয় বরকত তাঁর, যার রাজত্ব বিরাজ করছে আকাশে, পৃথিবীতে এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর উপর। তাঁর কাছেই রয়েছে কেয়ামতের সংবাদ এবং তার কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। যাদেরকে তারা ডাকে, তারা এখতিয়ার রাখে না সুপারিশের। কেবল যে সত্য সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তার জানা ছিলো, তার কথা আলাদা। তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, তোমাদেরকে কে বানিয়েছে, তবে তারা বলবে, আল্লাহ বানিয়েছেন। তাহলে কোথা

থেকে তারা পাল্টে যাচ্ছে? রসূলের এই কথার শপথ যে, হে প্রভু! এরা ঈমান আনবে এমন জাতি নয়। অতএব তুমি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং বলো, সালাম। পরিশেষে তারা জানতে পারবে।'

মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের অনুবাদঃ 'সেই সত্তা অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন যার জন্য আকাশ, পৃথিবী এবং এদের মাঝখানে যে সৃষ্টি রয়েছে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। কেয়ামতের কথাও তাঁর জানা থাকে এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে। আর আল্লাহ ছাড়া যেসব মানুষদের উপাসনা তারা করে, তারা সুপারিশ (পর্যন্ত) করার ক্ষমতা রাখেনা। তবে যারা সত্য কথা (অর্থাৎ ঈমানের কলেমা) স্বীকার করেছে এবং তাকে সত্য বলেও মানতো, তাদের কথা আলাদা। আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে তারা একথাই বলবে যে, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তাহলে তারা কোন্ দিকে ফিরে যাচ্ছে? আর আল্লাহ রসূলের এই কথাও জানেন যে, হে প্রভু! এরা এমন লোক যারা ঈমান আনেনা। অতএব আপনি তাদের দিক থেকে বিমুখ থাকুন এবং বলুন যে, তোমাদেরকে সালাম করি। তারা অচিরেই জানতে পারবে।'

এই অনুবাদগুলোতে শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব এবং শাহ রফিউদ্দীন সাহেব এর নিকটতম বাক্যের সাথেই ধরে নিয়েছেন। এতে করে শাহ ওলিউল্লাহ সাহেবের অনুবাদে কথার বিন্যাস এরকম দাঁড়ায়, 'আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো.... অতএব তারা কোথা থেকে ঘুরে যায়? আর নবী এরূপ দোয়া বহুবার করে থাকেন।' আর শাহ রফিউদ্দীন সাহেবের অনুবাদে কথাগুলোর ধারাবিন্যাস এরকম দাঁড়ায়, 'আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো.... অতএব তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? আর নবী প্রায়ই বলে থাকেন...'। মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব- وَقِيْله কে عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَة এর উপর مَعْطُوْف বলে স্থির করেছেন এবং তার অনুবাদের বাক্যবিন্যাস এরকম দাঁড়ায়, 'তিনি কেয়ামতের খবরও জানেন, আর রসূলের এই কথাও জানেন যে, হে প্রভু....'। প্রশ্নকর্তার মতে وَقِيْله এর عطف হয়েছে شهد بالحق এর উপর। এর মতে قيله এর ضمير দ্বারা রসূলকে নয় বরং যে ব্যক্তি জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয়, তাকে বুঝানো হয়েছে। এ অনুবাদ অনুসারে বাক্য পরম্পরা এরকম দাঁড়ায়, 'তারা কোনো সুপারিশের ক্ষমতা রাখেনা, কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া যে জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয় এই বলে যে, হে প্রভু.... ।' শাহ আব্দুল কাদের সাহেব, শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব قيله এবং ضمير শাহ রফিউদ্দীন সাহেব এর দ্বারা রসূল সা. কে বুঝিয়েছেন। কিন্তু তারা সমগ্র আলোচনাকে ধারাবাহিক ধরে নিয়ে وقيله কে قسم বলে স্থির করেছেন। তাফহীমুল কুরআনেও এই পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। এতে করে ৮৬ ও ৮৭ নং আয়াতের সাথে মিলিত হয়ে ৮৮ নং আয়াতের বক্তব্যটা দাঁড়ায় এরকম, 'রসূলের এই কথার শপথ যে, হে প্রভু! এরা এমন লোক যারা ঈমান আনেনা। এদের আত্মপ্রবঞ্চনা কি বিস্ময়কর যে, তারা নিজেরাই স্বীকার করে যে, তাদের ও তাদের উপাস্যদের স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া কেউ নয়। তা সত্ত্বেও স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির পূজা করার জন্য জিদ ধরে চলেছে।'

প্রাচীন তাফসিরকারগণও এই মতভেদের উল্লেখ এভাবেই করেছেন।

ইবনে জারীরের মতে وقيله এর عنده علم الساعة এর উপর। তিনি ব্যাখ্যা করেন এভাবে যে, কেয়ামতের খবরও আল্লাহর কাছেই রয়েছে এবং রসূলের সেই উক্তিরও খবর তারই কাছে রয়েছে, যাতে তিনি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট স্বজাতির বেঈমানী ও ইসলাম বিরোধীতার অভিযোগ দায়ের করেন। ইবনে জারীর কাতাদার এই উক্তিও উদ্ধৃত করেন যে, قيله অর্থ তোমাদের নবীর উক্তি, যাতে তিনি স্বীয় মনিবের নিকট নালিশ করেন।

যামাখশারী বিভিন্ন মত উদ্ধৃত করার পর পূর্বাপর অবস্থায় বিবেচনা করে এটাই অধিকতর সঙ্গত মনে করেন যে, وقيله তে حرف قسم উহ্য রয়েছে এবং ان هؤلاء قوم لا يؤمنون কথাটা جواب قسم এর স্থলাভিষিক্ত। এতে বক্তব্যটা এরকম দাঁড়ায়, 'রসূলের এই উক্তির শপথ করছি যে, হে আমার প্রভু, এরা ঈমান আনার মতো জাতি নয়।' তারপর তিনি বলেন যে, قيله এর ضمير দ্বারা রসূল সা. কে বুঝানো হয়েছে এবং তার উক্তির শপথ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি এবং তাঁর দোয়া ও আকুতির প্রতি গুরুত্ব প্রদর্শনের শামিল।

সাস্‌সাস, ফাররা ও জুজাজের মত উদ্ধৃত করে ইমাম রাযী বলেন, وقيله এর عطف হয়েছে لساعة এর উপর। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে এবং রসূলের এই উক্তিরও জ্ঞান রয়েছে যে, হে প্রভু....।'

আল্লামা আলুসী ও ইমাম রাযীর মত সমর্থন করে বলেন, আল্লাহর এ কথা বলা যে, তিনি রসূলের ফরিয়াদের কথা জানেন, কাফেরদের বিরুদ্ধে হুমকিস্বরূপ। (অর্থাৎ বিশ্ব অধিপতি তার বিদ্রোহী বান্দাহদেরকে বলছেন, তোমাদের অপকীর্তি সম্পর্কে আমি বেশ অবগত আছি, যার জন্য আমার রসূল আমার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন।) তাঁর দ্বিতীয় মত যামাখশারীর মতের অনুরূপ। আর তৃতীয় মত হলো, وقيله তে واو শপথবোধ এবং جواب قسم উহ্য রয়েছে। সেটি এই যে, আমি আমার রসূলকে সাহায্য করবো অথবা কাফেরদের সাথে সমুচিত আচরণ করবো।

যাই হোক, প্রশ্নকর্তার এ ব্যাখ্যা যে وقيله এর হয়েছে شهد بالحق এর উপর, কোনো তাফসিরেই তা আমি দেখিনি। কুরআনের বুঝমান এমন কোনো মুফাসসির একথা বলতেও পারেনা। কেননা এতে এই উক্তি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে যে, 'তবে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, হে প্রভু, এরা ঈমান আনা লোক নয়।' কারণ ৮৬ নং আয়াতে বাতিল মাবুদের সুপারিশের ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ যে বলেছেন, 'কেবল যে ব্যক্তি জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয়' এটা কেয়ামতের দিনের সাথে সম্পৃক্ত। এর অর্থ দাঁড়ায়, এ ধরনের লোকেরা সেদিন সুপারিশ করতে পারবে। পক্ষান্তরে ৮৮ নং আয়াতের এ উক্তি যে, হে আমার প্রভু! এরা ঈমান আনা জাতি নয়' এই দুনিয়ার সাথেই সম্পর্কযুক্ত। এই দুটো উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? এর অর্থ কি এই যে, যে ব্যক্তি আখেরাতে জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্য সাক্ষ্য দেবে এবং দুনিয়াতে হে আমার প্রভু এরা ঈমান আনা জাতি নয়' বলে সাক্ষ্য দেবে, সে সুপারিশ করতে পারবে? - তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৭৬।

২৪. ক. অর্থনৈতিক কারণে গর্ভনিরোধ কি জায়েয?
খ. আদম আ.-এর দেহাকৃতি কি বর্তমান মানুষের মতো ছিলনা?

প্রশ্ন: আমি আমার এক বন্ধুর দুটো প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিনি। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে এব্যাপারে সহায়তা করবেন। প্রশ্নদুটো নিম্নরূপ-

ক. আপনি সূরা বনী ইসরাঈলের ৩১ নং আয়াতের তাফসিরে ন্যায়বিচার করেননি, বরং এ আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক মতলব সিদ্ধির অনুকূল মর্ম উদ্ধার করেছেন। কেননা আয়াতটিতে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর হত্যা তাকেই করা যায়, যার প্রাণ আছে। ভ্রূণে প্রাণ আসে তখনই, যখন মাতৃগর্ভে দুই বিপরীত ভ্রূণ মিলিত হয় এবং একটি সজীব বস্তুর জন্ম হয়। যেহেতু জন্মনিরোধের পদ্ধতিগুলো সাধারণত উল্লিখিত ভ্রূণ সম্মিলনের আগেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তাই যে জিনিসের অস্তিত্ব বা প্রাণ আদৌ নেই সে জিনিসের হত্যা কিভাবে সংঘটিত হয় আয়াতটি নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে-

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

অর্থ: 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে খাদ্যাভাবের ভয়ে হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও জীবিকা দিয়ে থাকি এবং তোমাদেরকেও। সন্তানদেরকে হত্যা করা একটা মস্তবড় গুনাহ।'

খ. ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরোধীরা এ মতবাদটির বিরোধিতা করেছে এ জন্য যে, তারা মানুষকে আদম আ. এর বংশধর বলে বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাস যদি সত্যও হয় তাহলেও প্রশ্ন ওঠে যে, আদম আ. এর শরীরের গঠন ও আকৃতি যে অবিকল বর্তমান মানুষের মতোই ছিলো, একথা জানার কোনো প্রামাণ্য সূত্র আপনার কাছে আছে কি? থাকলে সেটি কি? এমনও তো হতে পারে যে আদম আ.কে আল্লাহ যে আকৃতিতে তৈরি করেছিলেন, তা ডারউইনের বিবর্তনবাদের অনুরূপই ছিলো। অর্থাৎ তৎকালীন মানুষ UNI-CELLULAR অর্থাৎ এক কোষ সম্পন্ন থেকে থাকতে পারে। হয়তো শুধু এতোটুকু পার্থক্য ছিলো যে, তিনি আপনা থেকে নয় বরং আল্লাহর হুকুমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে করতে বর্তমান মানুষের আকৃতিতে উপনীত হয়েছিলেন।

জবাব: আপনি আপনার বন্ধুর যে প্রশ্ন দুটো পেশ করেছেন, তার জবাব নিম্নে দেয়া যাচ্ছে।

ক. আপনার বন্ধু সূরা বনী ইসরাঈলের ৩১ নং আয়াতটি মনোযোগ দিয়ে পড়েননি। বরং আগে থেকে তার মনে যে ধারণা বদ্ধমূল রয়েছে, তা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আয়াতে শুধু সন্তান হত্যা করতেই নিষেধ করা হয়েছে। অথচ এ আয়াতে সন্তান হত্যাকে মারাত্মক গুনাহ আখ্যায়িত করার সাথে সাথে তার কারণ অর্থাৎ খাদ্যাভাবের ভয়কেও ভ্রান্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে। সেই সাথে 'আমি তাদেরকেও খাদ্য দেবো এবং তোমাদেরকেও খাদ্য দেবো' এ কথা বলে এই মর্মে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, সন্তান হত্যার মূলে যে খাদ্যাভাবের ভীতি সক্রিয় থাকে, তা মূলত 'জীবিকাদাতা' হিসেবে আল্লাহর প্রতি আস্থাহীনতারই নামান্তর। জীবিকাদাতারূপে

আল্লাহর প্রতি আস্থা ও নির্ভরশীলতা থাকলে খাদ্যাভাবের ভীতিও তোমাদের থাকবেনা, তোমরা সন্তান হত্যাও করবেনা। আমি টীকাতে এ কথারই ব্যাখ্যা করেছি। অথচ আপনার বন্ধু সে দিকে লক্ষ্য করেননি। ঐ টীকাতে আমি গর্ভনিরোধকে সন্তান হত্যা বলিনি। আমি যা বলেছি তা হলো, যে দারিদ্রভীতি আগেও সন্তান হত্যা ও গর্ভপাতে প্ররোচিত করতো, সেটাই এখন জন্ম নিয়ন্ত্রণে প্ররোচিত করে চলেছে। এজন্য অর্থনৈতিক উপায় উপকরণের অভাব দেখা দেয়ার আশংকায় জন্মনিরোধও এ আয়াতের দৃষ্টিতে ভুল।

খ. আপনার বন্ধু যদি কিছু মনে না করেন তবে আমি বলবো, তিনি কুরআনের চেয়ে ডারউইনের প্রতি বেশি অনুরক্ত। তাইতো তিনি আদম সৃষ্টি সংক্রান্ত কুরআনের যাবতীয় বর্ণনা উপেক্ষা করে ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী আদমের এককোষ বিশিষ্ট অনু (UNI-CELLULAR MOLECULE) হওয়াকে 'সম্ভব' বলে অভিহিত করেছেন। (নেহাত দয়াপরবশ হয়ে ওঠাকে সঠিক ও বিশুদ্ধ বলা থেকে বিরত থেকেছেন)। অতঃপর তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন, কোনো প্রামাণ্য সূত্রবলে আমি জানতে পেরেছি যে, আদম আ. এর দেহাকৃতি বর্তমান মানুষের মতোই ছিলো? আমার উত্তর হলো ভদ্রমহোদয়ের মতে কুরআন যদি কোনো প্রামাণ্য সূত্র না হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর সাথে আলোচনা নিরর্থক। কেননা নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির আলোকে আদমের দেহাকৃতির বর্তমান মানুষের অনুরূপ হওয়া যেমন সম্ভব, এক কোষধারী অণু হওয়াও ঠিক তেমনি সম্ভব। সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে যখন দুটোই সমান এবং একটাকে আর একটার উপর অগ্রাধিকার দেয়ার স্বপক্ষে কোনো প্রামাণ্য সূত্রও নেই। তখন অনর্থক কথা বলে সময় নষ্ট করার কি দরকার? তবে তিনি যদি কুরআনকে নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল প্রমাণের উৎস হিসাবে স্বীকার করেন, তাহলে একটু কষ্ট করে সূরা বাকারা ৩০-৩৯ আয়াত, সূরা আরাফের ১১-২৫ আয়াত, সূরা হিজর ২৬-৪২ আয়াত, সূরা বনী ইসরাঈল ৬১-৬৫ আয়াত, সূরা তোয়াহা ১১৫-১২৩ আয়াত গভীর মনোনিবেশ সহকারে যেন পড়েন এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদকেও সেই সাথে নজরে রাখেন। কুরআনের এই আয়াতগুলোতে আদম আ. সম্পর্কে যেসব বিবরণ দেয়া হয়েছে, তা একটা এককোষ বিশিষ্ট অণুর সাথে লাগসই হতে পারে বলে কি তার বিবেক ভাবতে পারে?

এই সাথে আপনার বন্ধুকে আমি আরো একটা কথা বলা জরুরি মনে করি। তিনি যদি কুরআনকে জ্ঞানের প্রামাণ্য উৎস ও নির্ভুল মাধ্যম মনে না করেন, তাহলে তার পক্ষে নিজেকে জনগণের সামনে মুসলমান হিসেবে পেশ করা নিজের বিবেক, নৈতিকতা ও সমাজের প্রতি এক নজিরবিহীন অবিচার ছাড়া আর কিছু নয়। সাচ্চা দিলে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা সত্ত্বেও সে কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ ও স্বীকার না করে, নিজেকে মুসলমানদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে রেখে ক্রমাগত ধোঁকা দিকে থাকা আদৌ সততার পরিচায়ক নয়। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারিঃ ১৯৭৭)

২৫. শহীদদের বরযখী জীবন

প্রশ্ন. ক. তাফহীমুল কুরআন সূরা বাকারার ১৫৪ নং আয়াতে ১৫৫ নং টীকায় আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণকারীদেরকে মৃত না বলার কারণ বলা হয়েছে যে, এতে

করে জেহাদের প্রেরণা নির্জীব হয়ে যায়। একই টীকায় পরে একথাও বলা হয়েছে যে, তাদেরকে মৃত বলা বাস্তবেরও পরিপন্থী। কিন্তু পুরো টীকাটা পড়লে যে ধারণা জন্মে সেটা হলো, জেহাদের প্রেরণা যাতে থিতিয়ে না পড়ে, সে জন্যই তাদেরকে মৃত বলা থেকে বিরত থাকা উচিত।

খ. তাফহীমুল কুরআন সূরা মুমিনুনের ৫৭ থেকে ৬১ নং আয়াতের অনুবাদ করতে গিয়ে প্রথমেই ৬১ নং আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে, তারপর করা হয়েছে ৫৭ থেকে ৬০ নং আয়াতের অনুবাদ। এই আগপাছ করার কারণে প্রায়ই পাঠকরা ভেবে বসে যে, ৬১ নং আয়াতের অনুবাদ করা হয়নি। যেহেতু মূল আয়াত ও অনুবাদের ভেতরে কয়েক পৃষ্ঠার ব্যবধান রয়েছে, তাই পাঠকরা বিভ্রাটে পড়ে যায়।

গ. তাফহীমুল কুরআন সূরা ইয়াসীনের ২৬ নং আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ২৩ নং টীকায় ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তিটির সাক্ষ্যের পর তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে সব আয়াত থেকে বরযখের বর্ণনা (মৃত্যু ও কেয়ামতের মধ্যবর্তীকালের) জীবিতাবস্থা প্রমাণিত হয়, এ আয়াতটিও তার অন্যতম। আরো বলা হয়েছে বরযখে রূহ দেহ ছাড়াই বেঁচে থাকে, কথা বলে ও শোনে। আনন্দ ও বেদনা অনুভব করে এবং দুনিয়াবাসীর প্রতিও তার কৌতুহল ও আগ্রহ বহাল থাকে। এ ব্যাপারে অনেকে প্রশ্ন তোলে যে, এখানে তো একজন বিশিষ্ট শহীদের কথা আলোচিত হয়েছে। শহীদের মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কথা কুরআনে সূরা বাকারার ১৫৪ নং আয়াতে এবং অন্যান্য জায়গাতেও রয়েছে। কিন্তু তাফহীমের এই টীকায় একজন নির্দিষ্ট শহীদের অবস্থা সাধারণ মৃত লোকদের ব্যাপারেও প্রয়োগ করার কারণ কি?

জবাব: ক. সূরা বাকারার ১৫৪ নং আয়াতের যে টীকার দিকে আপনি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, তাতে 'আল্লাহর পথে নিহতদেরকে তোমরা মৃত বলো না' এ উক্তির যে ব্যাখ্যা আমি করেছি তার উদ্দেশ্যে হলো, শহীদদের মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের প্রচলিত ধারণা অপনোদন। তারা এই মর্মে তাদেরকে জীবিত মনে করে যে, তারা আমাদের দোয়া শুনতে পায়। অথচ আল্লাহ যে জন্য তাদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করেছেন এবং তাদেরকে জীবিত বলেছেন তা হলো, কাফের ও মোনাফেকরা لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا (ওরা আমাদের কথামত চললে নিহত হতোনা') এবং لَوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا (তারা যদি আমাদের কাছে থাকতো তাহলে মারা যেতনা এবং নিহত হতোনা)' এসব কথা বলে বলে মুসলমানদের মধ্যে কাপুরুষতা ও জেহাদবিমুখতা সৃষ্টির যে চেষ্টা চালাতো, তা খণ্ডন করা। নচেত শাহাদাত যে অবশ্যই শারীরিক মৃত্যু, সে কথা কুরআনেই সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। وَلَئِنْ مُتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللهِ تُحْشَرُوْنَ

অর্থ: 'যদি তোমরা মারা যাও কিংবা নিহত হও, তবে অবশ্যই আল্লাহর কাছে সমবেত হবে।' তবে সেই সাথে এ কথাও জানানো হয়েছে যে, এ মৃত্যু আসলে অনন্ত জীবন। بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ('বরঞ্চ তারা জীবন্ত অবস্থায় আল্লাহর কাছে থাকবে ও জীবনোপকরণ লাভ করবে।') এই অর্থেই আমিও তাদেরকে মৃত

বলাকে বাস্তবতার বিপরীত বলেছি। কেননা তারা যে বরযখে ও আখেরাতে জীবন্ত, সেটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

খ. সূরা মুমিনুনের ৫৭ থেকে ৬১ নং আয়াতের অনুবাদে যে আগপাছ করা হয়েছে বলে আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেটা ঠিক। এ সম্পর্কে পরবর্তী সংস্করণগুলোতে ৫০/ক নং টীকা লিখে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা নিরসন করে দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ভাষান্তরের সুবিধার্থে ৬১ নং আয়াতের অনুবাদ প্রথমে ও ৫৭ থেকে ৬০ নং আয়াতের অনুবাদ পরে করা হয়েছে।

গ. সূরা ইয়াসিনের ২৩ নং টীকাকে যদি আপনি সূরা বাকারার ১৫৫ নং টীকা ও সূরা আল ইমরানের ১৫৮ নং আয়াতের তরজমার পাশাপাশি পড়েন তাহলে আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন শহীদের যে জীবনের কথা বলা হয়েছে, তা আসলে মৃত্যু পরবর্তী জীবন ছাড়া আর কিছু নয়। অন্যথায় শরীর ও প্রাণের বিচ্ছেদের দিক দিয়ে দেখতে গেলে অন্যদের যেমন মৃত্যু ঘটে, শহীদদেরও তেমনি মৃত্যু ঘটে। সে জন্যই তাদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হয় এবং তাদের বিধবা স্ত্রীদের বিয়েও জায়েয। তথাপি তাদেরকে মৃত বলতে যে নিষেধ করা হয়েছে, তার কারণ উপরে উল্লেখ করেছি। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারিঃ ১৯৭৭)

২৬. ডুবে মরা ফেরাউনের লাশ।

প্রশ্নঃ সামান্য একটু সময় দেয়া যদি সম্ভব হয় তবে অনুগ্রহপূর্বক সূরা ইউনুসের ৯২ নং আয়াত فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ অর্থঃ আজ আমি তোমার লাশ সংরক্ষণ করবো। এ ব্যাপারে আমার দু-একটা খটকা দূর করে দিন। মিসরীয় আলেম আল্লামা জাওহারী তানতাবী এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন লোহিত সাগরে ডুবে মরা ফেরাউনের লাশ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে পাওয়া গিয়েছিলো এবং যে ব্যক্তি পেয়েছিলো সে একাধিক প্রামাণ্য নিদর্শনের ভিত্তিতে ঘোষণা করেছিলো যে, এটা সেই ফেরাউনেরই লাশ। তবে আল্লামা তানতাবী সেই নিদর্শনগুলোর উল্লেখ করেননি। আপনি শুধু একটা প্রামাণ্য নিদর্শনের উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে সামুদ্রিক লবণ, যা ফেরাউনের দেহে পাওয়া গিয়েছিলো।

আপনার যদি অন্যান্য নিদর্শনের কথা জানা থাকে অথবা এমন কোনো পুস্তকের সন্ধান দিতে পারেন, যাতে ঐসব নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে, তবে অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন।

আপনি ফেরাউনের শরীরের সামুদ্রিক লবণের উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন হলো, তার দেহ কি বিশেষ উপায়ে ও বিশেষ উপকরণ দ্বারা মমি করা ছিলনা? যদি থেকে থাকে তবে সামুদ্রিক লবণ কিভাবে থেকে গিয়েছিলো? এ লাশ কি কোনো পিরামিড থেকে পাওয়া গিয়েছিলো, না মামুলী কবর থেকে? লাশটি যে স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল তা কোথায় অবস্থিত? স্থানটি কায়রো থেকে কোন্ দিকে এবং কতো দূরে?

জবাবঃ ডুবে মরা ফেরাউন সম্পর্কে বেশির ভাগ তথ্য আমি লুইস গোল্ডিং (LOUIS GOLDING) এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত (IN THE STEPS OF MOSSES THE LAWGIVER) থেকে লাভ করেছি। এই তথ্যানুসন্ধানমূলক ভ্রমণ কাহিনীতে তিনি লিখেছেন যে, ফেরাউনের আমলে মুসা আ. জন্মগ্রহণ করেন এবং বনী ইসরাঈলের উপর যার

জুলুম নিপীড়নের কথা সুবিদিত ও সুপ্রসিদ্ধ, সে হচ্ছে আসলে ফেরাউন দ্বিতীয় রামেসীস। এ জন্যই সে (PHARAOH OF THE PERSECUTION) উৎপীড়ক ফেরাউন নামে খ্যাত। আর যে ফেরাউনের আমলে তিনি নবুয়ত লাভ করেন এবং যে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে মারা যায়, সে ছিলো রামশীসের ছেলে মানেপতাহ (MEONEPTAH) (এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকাতে তার নাম লেখা হয়েছে মারনেপতাহ (MERNEPTAH) গোল্ডিং এর পুস্তক এবং এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকার নিবন্ধ উভয়টিতে লিখিত হয়েছে, যে THEBES (থেব্‌স) নামক জায়গার MORTUARY TEMPLE (সমাধি মন্দির) এর একটি স্তম্ভ ফ্লিন্ডারস্‌ পেট্রিক FLINDERS PETRIC) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় ১৮৯৬ সালে।

এই স্তম্ভে মারনেপতাহ তার আমলের কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করেছিলো। এই স্তম্ভেই সর্বপ্রথম এই মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মিশরে বনী ইসরাইলের অস্তিত্ব ছিলো। বৃটানিকার নিবন্ধে বলা হয়েছে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ নৃতত্ত্ববীদ স্যার ক্রাঁফো ইলিয়ট স্মিথ (SIR CRAFTON ELLIOT SMITH) মমিগুলোকে খুলে খুলে মমিকরণের কলাকৌশল অনুসন্ধান করা শুরু করেন এবং ৪৪টি মমি পরীক্ষা করেন। গোল্ডিং লিখেছেন, ১৯০৭ সালে স্মিথ মানেপতাহ্‌র লাশ উদ্ধার করেন। অতঃপর যখন তার কফিন খোলা হলো, তখন সমবেত লোকজন দেখে বিস্মিত হলো যে, তার দেহের উপর লবণের একটি স্তর জমে রয়েছে, যা অন্য কোনো মমি দেহে পাওয়া যায়নি। গোল্ডিং এ কথাও বলেন যে, এই ফেরাউন লোহিত সাগর সংলগ্ন তিক্ত হ্রদে ডুবে মরেছিলো।

তিনি এ তথ্যও জানান যে, সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে একটা ছোট পাহাড় আছে। এটিকে স্থানীয় লোকেরা 'জাবালে ফেরাউন' (ফেরাউনের পাহাড়) নামে আখ্যায়িত করে। এই পাহাড়টির নীচে একটি গর্তে অত্যন্ত উষ্ণ পানির প্রস্রবণ আছে। লোকেরা এর নাম দিয়েছে 'হাম্মামে ফেরাউন' (ফেরাউনের গোসলখানা) জনশ্রুতি রয়েছে যে, এখানেই ফেরাউনের লাশ পাওয়া গিয়েছিলো।

আমি এসব তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তিক্ত হ্রদে নিমজ্জিত হওয়ার পর তার লাশ ফুলে সমুদ্রের পানিতে ভেসে হাম্মামে ফেরাউন পর্যন্ত পৌছতে বেশ সময় লেগেছিলো। এই সময়ে তার দেহের মাংসমজ্জায় সামুদ্রিক পানির লবণ ঢুকে মিশে গেছে। এই লবণ তার দেহের মমিকরণের সময় বের করা সম্ভব ছিলনা। তারপর তিন হাজার বছর ধরে এই লবণ ক্রমান্বয়ে তার দেহ থেকে বেরিয়ে একটি স্তরের মতো জমে গেছে। কফিন খোলার পর এই লবণ জমাট অবস্থায় পাওয়া গেছে। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারিঃ ১৯৭৭)

২৭. মিরাজের সময় রসূল সা.-কে কি কি শিক্ষা দেয়া হয়েছিল?

প্রশ্ন: ইসরা ও মিরাজের ঘটনা সম্পর্কে আপনার সাম্প্রতিক নিবন্ধ পড়ে মনে নিম্নলিখিত চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। আশা করি আপনি এ ব্যাপারে আমাকে যথোচিত সাহায্য করবেন।

আপনি এ ঘটনার দুটো উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। প্রথমত রসূল সা. কে সৃষ্টি জগতের অন্তর্নিহিত বিধি ব্যবস্থা উপলব্ধি করানোর লক্ষ্যে সেই সব নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করানো

অভিপ্রেত ছিলো, যাকে কুরআনে آيَاتِ الْكُبْرٰى 'প্রধান প্রধান নিদর্শনাবলী' বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তায়ালা রসূল সা. কে নিজের খাস দরবারে ডেকে নিয়ে ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার কতিপয় মূলনীতি দিতে চেয়েছিলেন।

নিঃসন্দেহে বলা যায় কুরআন থেকে মিরাজের উল্লিখিত দুটো উদ্দেশ্যই প্রমাণিত। কিন্তু এটাও ভেবে দেখার বিষয় যে, প্রথম লক্ষ্য যদি রসূল সা.কে বড় বড় নিদর্শনাবলী দেখানোই হয়ে থাকে, তাহলে এ লক্ষ্য তো সিদরাতুল মুনতাহায় উপনীত হওয়া পর্যন্ত অর্জিত হয়েই গিয়েছিলো। তিনি অন্যান্য ফেরেশতা ছাড়াও জিবরাইল আ.-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দুবার দেখে নিয়েছিলেন, নবীদের সাথে পরিচয় পর্যন্ত সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিলো, শাস্তি ও পুরস্কারের কয়েকটি নমুনাও দেখানো হয়ে গিয়েছিলো। বাইতুল মামুর, জান্নাতুল মাওয়া এবং দোযখের মতো স্থানগুলোর পরিদর্শনও সম্পন্ন হয়েছিল। সুতরাং এই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য দৃশ্যমান জগত (আলমে শাহাদাত) এর সীমা পেরিয়ে অদৃশ্য জগতের (আলমে গায়েব) দিকে অগ্রাভিযানের তেমন কোনো প্রয়োজন ছিলনা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটা সম্পর্কে বলা যায়, ওটা আল্লাহর খাস দরবারে উপস্থিত না হয়েও হাসিল হতে পারতো। সমগ্র কুরআন যখন আরবের মাটিতে নাযিল হতে পেরেছিলো, তখন এই মূলনীতিগুলো সেখানে নাযিল হওয়াতে অসুবিধা কি ছিলো?

আসলে এ দুটো উদ্দেশ্য ছাড়া মিরাজের তৃতীয় একটা উদ্দেশ্যও কুরআনে ও হাদিস থেকেই প্রমাণিত। সেটি আল্লাহ রসূল সা. কে নিজের ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে নিয়ে এমন কিছু বিশিষ্ট বস্তু, মনোবৃত্তি, সংকেত ও গোপন রহস্যের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব ছিলনা। فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِه مَا اَوْحٰى 'সে আল্লাহর বান্দাকে যে ওহি পৌঁছানোর মতো ছিলো তা পৌঁছালো।' এ আয়াতটির ভাষা এই উদ্দেশ্যটির দিকেই ইঙ্গিত দেয়। এখানে ভেবে দেখার ব্যাপার যে ওহি পৌঁছানোর মতো ছিলো, তাকে শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়নি কেন? এই বিশিষ্ট ওহীকে আমরা 'অনুচ্চারিত ওহী' وحی غیر متلوا বলে আখ্যায়িত করতে পারি। জিবরাইল আ. ও জানেননা এমন সব তত্ত্ব জ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই রহস্যময় শিক্ষার দিকে ইঙ্গিত করেই কোনো এক আধ্যাত্মিক কবি বলেছেন: (উর্দু) অর্থ: 'যে ওহি পৌঁছানোর ছিলো' কথাটার মধ্যে যে গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে, জিবরাইলের অন্তরে তার স্থান সংকুলান হয়না। কুরআনই বা কিভাবে উন্মোচন করবে দুর্জ্ঞেয় ঐশী রহস্য?

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, প্রকাশ্য ওহি এবং এই বিশিষ্ট ওহীর শিক্ষায় যেমন কোনো বিরোধ বৈপরিত্য থাকতে পারেনা, তেমনি প্রকাশ্য ওহীর উপর গোপন ওহীকে প্রাধান্য দেয়ারও প্রশ্ন ওঠেনা। এখানে এ প্রশ্নও ওঠে যে, আল্লাহ রসূল সা. কে এই বিশেষ রুচি ও মনোবৃত্তি এবং এই বিশেষ ভাবধারা ধারণ করার যে ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন তার খানিকটা যদি তাঁর উম্মতের কোনো কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে থাকেন, তাহলে তাতে আশ্চর্যের কি আছে? দানশীল যদি দান না করে তাহলে তাকে দানশীল বলা চলেনা। আবু বকর রা.-এর অন্তরে একটা ঐশী গুপ্ত রহস্য বদ্ধমূল হয়ে যাওয়া এবং তার ভিত্তিতেই তার অন্যান্য সাহাবির উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হাদিস থেকেই

প্রমাণিত। যে জিনিসকে আল্লাহর রসূল 'অজানা রহস্য' নামে অভিহিত করেছেন, সেটাকে অন্য কোনো জিনিস বলে অনুমান করা কোনো মুমিনের পক্ষে শোভা পায়না।

এখন মিরাজকালে আল্লাহর সাক্ষাত লাভের প্রসঙ্গে আসা যাক। আমি মনে করি, এ বিষয়ে মানুষ এক অর্থহীন বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আখেরাতে মুমিনরা আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করবে একথা যখন প্রমাণিত,তখন অদৃশ্য জগতে গিয়ে আল্লাহর সাক্ষাত লাভে বিস্ময়ের কি আছে? لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ 'আল্লাহকে চোখ দিয়ে দেখা যায়না' এ কথাটার ব্যাখ্যায় আয়েশা রা. বলেছেন যে, এর দ্বারা চর্মচক্ষু দিয়ে আল্লাহকে দেখা যায়না বুঝানো হয়েছে। আর এই চর্মচক্ষু দৃশ্যমান জগতেরই জিনিস, অদৃশ্য জগত বা পরকালীন জগতের না। আপনি নিজেও তাফহীমুল কুরআনে একথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আল্লাহকে কেবল চক্ষু নামক দর্শন যন্ত্রটি দিয়েই দেখা যায় এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন, অন্তর দ্বারা অথবা অন্তর ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম দ্বারা সাক্ষাত দানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম। তাই তো কবি বলেছেন:.......

অর্থ: 'আল্লাহর সাথে এই অধম মাটির কি সম্পর্ক থাকতে পারে? তবে তিনি যখন অনুগ্রহ করেন, তখন কারোর আপত্তি করার কিছু থাকেনা।'

জবাব: একথা আপনি ঠিকই বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা সিদরাতুল মুনতাহার ওপারে ডেকে নিয়ে রসূল সা. কে ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্য প্রদান করেছিলেন। তবে একথা ঠিক নয় যে, সেখানে রসূল সা. কে এমন সব গোপন রহস্য শিক্ষা দিয়েছিলেন যা উম্মাতকে জানানোর মতো নয়। সূরা তাকবীরে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ 'এবং তিনি (আমার রসূল) অদৃশ্য বিষয়ে কৃপণ নয়।' অর্থাৎ অদৃশ্য যেসব তত্ত্বজ্ঞান তাকে দেয়া হয়েছে, তা তিনি লুকিয়ে রাখার পাত্র নন এবং নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে কার্পণ্যকারী নন। সূরা জিনের শেষ দুটো আয়াতেও একথাই বলা হয়েছে। তার মর্ম হলো আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রসূলের কাছে যে গায়েবী তত্ত্বজ্ঞান ব্যক্ত করেন, তা রিসালাতের প্রচার ও প্রকাশের জন্যই করে থাকেন। সূরা মায়েদার ৬৭ নং আয়াতেও এ কথাই বলা হয়েছে যে: 'হে রসূল! তোমার কাছে যা নাযিল করা হয়েছে তা প্রচার করো।' সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে আলী রা. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে রসূল সা. কি আপনাকে গোপনীয়ভাবে কোনো বিশেষ শিক্ষা প্রদান করেছিলেন? তিনি মিম্বারে বসেই এটা অস্বীকার করেন এবং নিজের তলোয়ারের খাপের মধ্য থেকে শরিয়তের কয়েকটা বিধান বের করে তা জনগণকে জানিয়ে দেন, যা তিনি রসূল সা.-এর কাছ থেকে শুনে লিখে রেখেছিলেন।

প্রকাশ্য ওহি ছাড়া সেই সময়ে 'অনুচ্চারিত ওহীর' আকারে কোনো শিক্ষা যদি রসূল সা.কে দেয়া হয়ে থাকে, তবে সেটা অবশ্যই ইসলামি বিধানের বাস্তবায়ন এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কৌশল ও প্রজ্ঞাই হতে পারে। তবে সেটাতো তিনি অচিরেই হিজরতের পর প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছিলেন। সেই প্রজ্ঞা ও কৌশল রসূল সা.-এর মদিনার দশ বছরের কর্মময় জীবনেও প্রকাশিত হয়ে গেছে। যে সব আদেশ নিষেধ, উপদেশ এবং মৌখিক ও বাস্তব নির্দেশিকা দ্বারা তিনি সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র

গঠনের কাজ করেছেন, তার মধ্য দিয়েও তা প্রতিফলিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া এমন কোনো শিক্ষা, মনোবৃত্তি, রহস্য ও সংকেত ইত্যাদির সন্ধান সুন্নত থেকে পাওয়া যায়না, যা সাধারণ উম্মাতের অগোচরে রেখে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে শেখানো হয়েছে।

আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এ ব্যাপারে চর্মচক্ষু দিয়ে দেখার কথাই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং নির্ভরযোগ্য হাদিস থেকে জানা যায় রসূল সা. এ কথাই বলেছিলেন যে, তিনি চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখেননি। (তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল ১৯৭৭)

২৮. ক.'দীন ও শরিয়ত' এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন
খ. হজ্বের সময় পশু যবেহ্ করার বিধি

প্রশ্ন: ক. তাফহীমুল কুরআনে সূরা আশ শুরার ২০ নং টীকায় আপনি বলেছেন যে, অনেকে মনে করে নিয়েছেন এখানে 'দীন' শব্দটা দ্বারা শরিয়তের বিধিসমূহ বুঝায় না, বরং শুধু তাওহীদ আখেরাত, কুরআন ও নবুয়তকে মেনে নেয়া এবং আল্লাহর ইবাদত করার নামই 'দীন'। বড় জোর প্রধান প্রধান চারিত্রিক মূলনীতি এর অন্তর্ভুক্ত, যা সকল নবীর শরিয়তে বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু এটা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা, যা নিছক ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দীনের অভিন্নতা ও শরিয়তসমূহের বিভিন্নতা দেখে স্থির করা হয়েছে। এটা এমন বিপজ্জনক ধারণা যে, এটা শুধরে না দিলে পরে দীন ও শরিয়তের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পর্যায়ে উপনীত হতে পারে। এ ধরনের বিভেদে লিপ্ত হয়েই সেন্ট পল 'শরিয়তবিহীন দীন' এর তত্ত্ব পেশ করেছিলেন এবং ঈসার উম্মাতকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছিলেন।

এরপর কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের বরাত দিয়ে আপনি প্রমাণ করেছেন দীন বলতে শুধু আকিদা বিশ্বাসই বুঝায় না বরং শরিয়তের বিধিমালাও তার অন্তর্ভুক্ত। উম্মাতে মুহাম্মদীকে যে শরিয়ত দেয়া হয়েছে, সেটাই এ যুগের জন্য 'দীন' এবং 'দীন কায়েম করা' বলতে একে প্রতিষ্ঠিত করাই বুঝায়। এ প্রসঙ্গে আমার কথা হলো, 'রিসালায়ে দীনিয়াত' (ইসলাম পরিচিতি) এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে দীন ও শরিয়তের যে পার্থক্য আপনি বর্ণনা করেছেন, আমার নগণ্য মতে তা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন মনে হচ্ছে।

খ. জামায়াতের জনৈক রুকন (যিনি ইতিমধ্যে হজ্ব সমাপন করেছেন) এক সমাবেশে বলেছেন মুহতারাম মাওলানা মওদূদী তাফহীমুল কুরআনে উল্লেখ করেছেন, কেউ হজ্বের মওসুমে হজ্বের আগে ওমরা করলে তার কুরবানী করা উচিত। কিন্তু মক্কা শরীফে ওমরার পরে কোনো কুরবানী করা হয়না। এ বক্তব্য দিতে গিয়ে তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারার ১৯৬ নং আয়াতের অনুবাদের বরাত দিয়েছেন। সেই আয়াতটির অনুবাদ নিম্নে দেয়া হলো।

কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্বের সময় আসা পর্যন্ত ওমরার সুযোগ গ্রহণ করে, সে যেন সাধ্যমত কুরবানী করে।' আমি তাকে সাধ্যমত বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, এটা তো আয়াতের তরজমা, এর অর্থ এ নয় যে, ওমরা সম্পন্ন করার সাথে সাথেই কুরবানী দিতে হবে। বরং এর অর্থ হলো তামাত্তু (ওমরা ও হজ্বের মধ্যে

এহরাম খোলা) ও কেরানে (একই এহরামে হজ্ব ও ওমরা করা) কুরবানী ওয়াজেব। হজ্বের সময় ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত ওমরার সুযোগ গ্রহণ করার সম্পর্কে আপনি ২১৩ নং টীকার শেষাংশে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সে দিকেও তার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু তবুও তিনি বলেন যে, বক্তব্য স্পষ্ট নয়। এখন আপনি ভালো মনে করলে এ বিষয়টা সম্পর্কে আরো ব্যাখ্যা দেবেন, যাতে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ না থাকে।

জবাবঃ ক. সূরা শুরার ২০ নং টীকা যদি পুরোপুরি পড়া হয় তবে 'রিসালায়ে দীনিয়াতে' (ইসলাম পরিচিতি) দীন ও শরিয়ত সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে, তা পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন অনুভূত হয়না। বিশেষভাবে আপনি উক্ত ২০ নং টীকার এই বক্তব্যটুকু লক্ষ্য করুন, যে নবীর উম্মতকে আল্লাহ যে শরিয়তই দিয়ে থাকুন না কেন, সেটাই ছিলো এই উম্মতের জন্য দীন তথা ইসলাম। সেই নবীর নবুয়তের আমলে ওটাই কায়েম করা কর্তব্য ছিলো। এখন যেহেতু মুহাম্মদ সা.-এর নবুয়তের যুগ। তাই উম্মতে মুহাম্মদীকে যে শরিয়ত দেয়া হয়েছে, তাই এ যুগের জন্য দীন এবং এটাকে কায়েম করাই দীন কায়েম করা।' 'রিসালায়ে দীনিয়াতে' বলা হয়েছে দীন তথা ইসলামের আকিদা সংক্রান্ত অংশ সব সময় অভিন্ন ছিলো। তবে তার শরিয়ত (বিস্তারিত আইন বিধি) সংক্রান্ত অংশ বিভিন্ন নবীর আমলে পরিস্থিতি অনুসারে বিভিন্ন রকমের ছিলো। এই বইটা লেখা হয়েছিল ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য। তাই সূরা শুরার তাফসিরে যে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, তা এতে করা সম্ভব ছিলনা।

খ. সূরা বাকারার ১৯৬ নং আয়াতে তিনটে বিধি আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ১. যখন কেউ হজ্ব কিংবা ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধে এবং তারপরে কোনো বাধা আসার কারণে হারাম শরীফে উপস্থিত হতে অক্ষম হয়, তখন তার কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দেয়া উচিত এবং ঐ পশু কুরবানীর না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এহরাম খোলা উচিত নয়। ২. যদি কেউ রোগ ব্যাধির কারণে চুল নখ ইত্যাদি কাটাতে বাধ্য হয় তাহলে সে তা কাটিয়ে নিতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে তাকে ফিদিয়া দিতে হবে। ৩. কোনো বাধা যদি না আসে এবং হারাম শরীফে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়, তাহলে তামাত্তু কিংবা কিরান (একই সফরে হজ্ব ও ওমরা উভয়টি করা দুই এহরামে তামাত্তু, এক এহরামে কিরান।-অনুবাদক) করলে তাকে কুরবানী করতে হবে। তবে এফরাদ (শুধু হজ্ব) করলে কুরবানী ওয়াজেব হবেনা। (তরজমানুল কুরআন, এপ্রিলঃ ১৯৭৭)

২৯. মিরাজ রাত্রে হয়েছিল না দিনে?

প্রশ্নঃ কিছুদিন আগে আমাকে কারা ভোগ করতে হয়েছিল। সেখানে অনেক ভিন্ন ভিন্ন মতের লোকদের মধ্যেও লক্ষ্যের মিল ও নিষ্ঠা বিদ্যমান ছিলো। কুরআনের তাফসির হতো এবং জামায়াতে নামায পড়ার ব্যবস্থা ছিলো। তবে দুঃখের ব্যাপার হলো আলেমগণ সেখানেও খুঁটিনাটি ধর্মীয় মতভেদে লিপ্ত ছিলেন। আমরা যে ব্যারাকে ছিলাম সেখানে দেওবন্দী, বেরেলবী ও আহলে হাদিস গোষ্ঠীভুক্ত আলেমদের তিনটে পৃথক পৃথক জামায়াত হতো, আমি বন্ধু বান্ধবের সাথে পরামর্শ করলাম,

আলেমদেরকে এক জামায়াতে নামায পড়তে রাজী করানো হোক। সর্বপ্রথম জনৈক দেওবন্দী আলেমের কাছে গেলাম। তিনি জানতেন আমি জামায়াতে ইসলামির একজন রুকন। ভূমিকার পর্যায়ে কিছু কথাবার্তা বলতেই তিনি আপনার সম্বন্ধে নানা আপত্তি তুলতে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন, মাওলানা মওদূদী সাহেব নতুন নতুন কথা তোলেন। তরজমানুল কুরআনের এক সাম্প্রতিক সংখ্যায় লিখেছেন মিরাজের ঘটনা প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত হয়েছিল। অথচ কুরআনের বর্ণনা অনুসারে এ ঘটনা রাতের কোনো অংশে সংঘটিত হয়েছিল। হাদিস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মিরাজ এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে হয়েছিল। আমি এ ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। এক জামায়াতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যতো কথায় কথায় বানচালই হয়ে গেলো এবং আলোচনা আর সামনে এগুতে পারলোনা।

জেল থেকে ফিরে আসার পর তরজমানুল কুরআনের জানুয়ারি '৭৭ সংখ্যা খুলে দেখি ১০ম পৃষ্ঠায় আপনার এ কথাগুলো রয়েছে, '....রসূল সা. অন্ধকারে, ধ্যানরত অবস্থায়, স্বপ্নে কিংবা আধা জাগ্রত অবস্থায় এসব দৃশ্য দেখেননি। বরং তখন ভোর হয়ে গিয়েছিলো, তিনি পুরোপুরি জাগ্রত ছিলেন, খোলা আকাশের নীচে দিনের আলোতে স্বচক্ষে পৃথিবীর অন্যান্য দৃশ্য দেখার মতোই এ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলেন।'

বুঝতে পারলাম যে, মৌলবী সাহেব এই কথাগুলোর উপরেই আপত্তি তুলেছিলেন। ব্যাপারটা আপনি বুঝিয়ে দিলে ভালো হয়।

জবাব: মিরাজ সম্পর্কে একথা আমি কখনো বলিওনি, লিখিওনি এমনকি আমার মাথায় কখনো এমন কল্পনাও আসেনি যে, এ ঘটনা দিনের বেলায় সংঘটিত হয়েছে। তাফহীমুল কুরআন সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতের অনুবাদ ও সে সম্পর্কে আমার সুদীর্ঘ টীকা দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন আমার মতে মিরাজ দিনের না রাতের ঘটনা।

সূরা নাজ্‌মের ৪ থেকে ১২ নং আয়াত পর্যন্ত জিবরাইল আ. এর সাথে রসূল সা.-এর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এর সাথে মিরাজের কোনো সম্পর্কই নেই। সেই প্রথম সাক্ষাত সম্পর্কেই আমি বলেছি যে, ওটা দিনের বেলায় পুরো জাগ্রত অবস্থায় ঘটেছে। তাফহীমুল কুরআন (উর্দু) পঞ্চম খণ্ডের পৃ. ১৮৮ থেকে ১৮৯ এবং ১৯৩ থেকে ২০০ পর্যন্ত এর বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে।

তবে তরজমানুল কুরআনের জানুয়ারি '৭৭ সংখ্যায় ১০ম পৃষ্ঠায় যে আলোচনা করা হয়েছে তার শিরোনাম হলো 'জিবরাইলের সাথে রসূল সা.-এর প্রথম সাক্ষাত।' এ শিরোনাম থেকেই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, এটা আকাশের সাক্ষাতের বিবরণ নয়। এই পুরো আলোচনা পড়লে আপনি জানতে পারবেন মিরাজ প্রসঙ্গে এ আলোচনা শুধু এজন্যই করা হয়েছে যে, এমন অস্বাভাবিক দৃশ্যাবলী দেখেও রসূল সা. যে বিন্দুমাত্র সংশয়ে পড়েননি, তার কারণ কি? ১২ নং পৃষ্ঠায় সিদরাতুল মুনতাহাতে জিবরাইলের সাথে রসূল সা.-এর দ্বিতীয় সাক্ষাতের বিবরণ রয়েছে। সেটাও পড়ে দেখুন এই ধারাবাহিক আলোচনা থেকে কি বুঝা যায়।

আসলে এই ভদ্রলোকদের স্বভাব হলো, যে কোনো ব্যক্তির লেখা থেকে এক আধটা বাক্য নিয়ে তার ভিত্তিতে বিরাট আকারের একটা অভিযোগ তৈরি করে ফেলেন। এ কাজ

করতে গিয়ে তারা আদৌ এটা অনুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করেন না যে, ঐ ব্যক্তি এ বিষয়ে অন্যান্য নিবন্ধে কি লিখেছে। এ অনুসন্ধানের কাজটা করলে তারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে, তাদের অভিযোগ নিছক বানোয়াট ও মনগড়া অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। যদি ধরে নেই তাদের হাতে এতো তদন্ত তল্লাশী করার সময় নেই বলে তারা ওজর দেবেন, তাহলে তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করা ও তা রটিয়ে বেড়ানোর দায়িত্ব আপনাদের উপর কে চাপিয়ে দিয়েছে যে, সে কাজ আপনারা না করেই থাকতে পারেন না? (তরজমানুল কুরআন, জুলাইঃ ১৯৭৭)

৩০. মিসকিনকে খাবার দেয়ার তাৎপর্য।

প্রশ্নঃ সূরা আল হাক্কাহ এবং সূরা মাউনের আয়াত وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ এর অনুবাদ তাফহীমুল কুরআনে দুজায়গায় দুরকম। এক জায়গায় অনুবাদ করা হয়েছে, মিসকিনকে আহার করানো আর এক জায়গায় মিসকিনকে খাবার দেয়া। এই পার্থক্যের কারণ কি?

জবাবঃ طعام শব্দটা আরবিতে খাদ্য অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ যে জিনিস খাওয়া হয়। আবার এটা اطعام। 'খাওয়ানো' অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

প্রথমোক্ত অর্থের আলোকে طَعَامُ الْمِسْكِيْنِ অর্থ 'মিসকিনের খাদ্য' এ থেকে আপনা আপনি এ অর্থ বেরিয়ে আসে যে, মিসকিনকে যে খাদ্য দেয়া হয় সেটাই তার খাদ্য। সক্ষম লোকদের খাদ্যে তার খাদ্য প্রাপ্য রয়েছে এবং সে প্রাপ্য দেয়া উচিত। এ কথাটাই কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

'তাদের সম্পদে প্রাপ্য রয়েছে, যে চায় তার এবং যে বঞ্চিত তারও।'

দ্বিতীয় অর্থের আলোকে এর তাৎপর্য সুস্পষ্ট। আয়াতটার মর্ম হলো সে মিসকিনকে খাদ্য খাওয়াতে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করেনা।' (তরজমানুল কুরআন, জুলাইঃ ১৯৭৭)

৩১. কুরআন শরীফের সাহায্যে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের উন্নতি।

প্রশ্নঃ মুসলমান হিসাবে এটা আমার ঈমানের অন্তর্ভুক্ত যে, কুরআন আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের নির্দেশ দিয়ে থাকে। আর তা যখন দেয়, তখন বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের উন্নতি এবং নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক রহস্য উদঘাটনের জন্যও এতে অনেক আভাস পাওয়া যায়। সেই আভাস ইংগিতের সাহায্যে মুসলমানরা এ ক্ষেত্রে মানবিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধন এবং নিজেদের প্রতিরক্ষায়ও সাফল্য লাভ করতে পারে। অবসর সময়ে আমি কুরআন শরীফ থেকে এ ধরনের কয়েকটি রহস্য জানতে চেষ্টা করেছি। যেহেতু একজন নগণ্য আণবিক প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী হিসাবে আমি এ জিনিসগুলোর তাৎপর্য নিজেরই দৃষ্টিভঙ্গী এবং নিজেরই চিন্তাধারার সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করেছি, তাই এ জিনিসগুলো প্রকৃত মর্ম যাতে উপলব্ধি করতে পারি ও সুস্পষ্ট তাৎপর্য নির্ণয় করতে পারি, সেজন্য আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে এই

আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেবেন যেন আমি বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রটিতে আমার গবেষণা নির্ভুলভাবে চালিয়ে যেতে পারি এবং মুসলমানদের জন্য কোনো নতুন জিনিস আবিষ্কার করতে পারি।

আয়াতগুলো হলো, সূরা হুদের ৯৪ ও ৯৫, সূরা হিজরের ৮৩ ও ৮৪, সূরা মুমিনুনের ৪১, সূরা ইয়াসীনের ২৮ ও ২৯, সূরা সোয়াদের ১৪ ও ১৫, সূরা আল হাক্কাহর ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১৩, ১৪, ও ১৫ এবং সূরা আল কারিয়ার ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ নং আয়াতসমূহ। এ ছাড়াও আরো অনেকগুলো আয়াত রয়েছে যা আমি পরে জানাবো। উল্লিখিত আয়াতগুলোর সাহায্যে আমরা পারমাণবিক রশ্মি, পরমাণুর অবস্থান, পৃথিবীর আবর্তন এবং শব্দ ইত্যাদির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা চালাচ্ছি।

জবাবঃ আপনি নিজের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে আমার সাথে আলোচনা করতে এসেছিলেন। কিন্তু সেদিন আমি এতো অসুস্থ ছিলাম যে, আমি বাধ্য হয়ে বিস্তারিত আলোচনায় অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলাম। তারপর আপনি আমার অফিসে যে চিঠি রেখে গিয়েছিলেন, অসুস্থতার কারণে তাও আমি অনেকদিন পর্যন্ত দেখতে পারিনি। আজ আপনার উল্লিখিত আয়াতগুলো সম্পর্কে আপনার প্রশ্নের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি।

১. সূরা হুদের ৯৪ ও ৯৫ নং আয়াত দুটো শোয়াইব আ.-এর উম্মত সংক্রান্ত। শোয়াইবের উম্মতের উপর আযাব নাযিল হওয়ার প্রক্রিয়া এতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, একটা 'সায়হা' তাদের উপর আপতিত হলো এবং তাতেই তারা ধ্বংস হয়ে গেলো। 'সায়হা' আরবি ভাষায় বিকট শব্দ, চিৎকার অথবা গর্জন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমি শব্দটির অবস্থান বিবেচনা করে এর অনুবাদ করেছি 'একটা প্রচন্ড ধ্বনি' এ থেকে বুঝা যায় একটা অস্বাভাবিক ধরনের বিকট শব্দ যা মানুষ ও জনপদ ধ্বংস করতে সক্ষম। সুদীর্ঘ কাল ধরে পৃথিবীতে এর অভিজ্ঞতাও অর্জিত হয়ে আসছে। সূরা ইয়াসিনের ৪৯ নং আয়াতে কেয়ামতের বর্ণনা দিতে গিয়েও এই 'সায়হা' শব্দটাই ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে একে 'সুর' বা 'শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া' শব্দ দ্বারাও ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরা যুমারের ৬৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে,

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ

'আর সেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যারা রয়েছে তারা সকলে মরে পড়ে যাবে।' এই দুই রকমের ধ্বনিতে যে পার্থক্য কুরআনের বিভিন্ন জায়গার বর্ণনা থেকে ধরা পড়ে তাহলো একটা বিকট ধ্বনি এমন, যা একটা সীমিত এলাকায় উত্থিত হয় এবং কেবলমাত্র সেই এলাকার জনমানবকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আরেকটা বিকট ধ্বনি হলো এমন যে, তা শুধু সমগ্র পৃথিবী জুড়েই নয় বরং আকাশ পর্যন্ত জুড়ে ধ্বনিত হবে এবং সমগ্র সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেবে। এ থেকে শব্দের এরূপ শক্তি রয়েছে বলে অনুমিত হয় যে, তা শুধু কানই বিদীর্ণ করেনা বরং তা ধ্বংসও করে। কখনো তার প্রচন্ডতায় একটি জাতি ধ্বংস

হয়, আবার কখনো তার তীব্রতায় কেয়ামত সংঘটিত হয়। এর পার্থক্য নির্ভর করে (Intensity of Sound) শব্দের প্রচন্ডতার উপর। বাতাসের দ্বারা এ প্রচন্ডতার সৃষ্টি হয় এবং বস্তুনিচয়ের উপর প্রভাব ফেলে। হতে পারে যে, কেয়ামতের শিংগার আওয়াজ বাতাস ছাড়া অন্য কোনো উপাদানের মাধ্যমে ধ্বনিত হবে। কেননা সেটা পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ থাকবেনা, বরং পৃথিবীসহ আকাশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। অথচ বায়ুমণ্ডল তো কেবল পৃথিবীর আশপাশে একটা সীমিত গণ্ডিতে বিরাজমান, তার বাইরে মহাশূন্যে তার অস্তিত্ব নেই।

২. সূরা আল হিজরের ৮৩ ও ৮৪ নং আয়াত সামূদ জাতি সংক্রান্ত। এর আগে এই সূরায় ৭৩ নং আয়াতেও লুতে আ.-এর দেশবাসীর উপর যে আযাব এসেছিলো তাকে বুঝাতে 'সায়হা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা আমি ইতিপূর্বে করেছি। ৭৩ নং আয়াতে লুতের দেশবাসীর উপর সায়হার যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের জনপদকে ওলটপালট করে দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ তাদের ঘরবাড়ির ছাদ মাটিতে পতিত হয়েছিল। এ থেকে শব্দের এমন শক্তির প্রমাণ মেলে, যা শুধু মানুষকেই ধ্বংস করেনা, বরং শাস্তিপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলকেও তছনছ করে দেয়। ৮৩ ও ৮৪ আয়াতের বক্তব্য প্রসঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমি সামুদ জাতির এলাকা স্বচক্ষে পরিদর্শ করেছি। সেখানে সমগ্র এলাকার পাহাড় পর্বত নীচ থেকে চূড়া পর্যন্ত ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। এ থেকে বুঝা যায় শব্দের এমন শক্তি রয়েছে যে, তা পাহাড়কে পর্যন্ত নেড়েচেড়ে দেয় এবং তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

৩. সূরা মুমিনুনের ৪১ নং আয়াতও সামূদ সংক্রান্ত। এতে সায়হার ধ্বংসলীলার বিবরণ দেয়া হয়েছে এই বলে যে, 'আমি তাকে ভূসি বানিয়ে দিয়েছি।' এ থেকে শব্দের তীব্রতার যে চিত্র পাওয়া যায় তা হলো, তা মানুষকে শুধু হত্যাই করেনা বরং তার শরীরকে পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।

৪. সূরা ইয়াসিনের ২৮ ও ২৯ নং আয়াতে এমন একটি জাতির বিবরণ দেয়া হয়েছে যার নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। এ জাতিটিও সায়হা তথা বিকট ধ্বনিতে ধ্বংস হয়। এতে সায়হার ধ্বংসলীলার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এই বলে যে, فَاِذَا هُمْ خَامِدُوْنَ ('সহসা তারা নির্বাপিত হয়ে গেলো।') অন্য কথায় বলা যায় তাদের জীবন প্রদীপ নিভে গেলো। আবার এর তাৎপর্য এও হতে পারে যে, তাদের দেহের উত্তাপ বিলুপ্ত হওয়ায় তারা মারা গেলো।

৫. সূরা সোয়াদের ১৪ ও ১৫ নং আয়াতে মক্কাবাসীকে এই মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, যদি তারা ঈমান না আনে অথবা রসূলকে মিথ্যুক বলা অব্যাহত রাখে, তাহলে অন্যান্য জাতির মতো তাদের উপরও একটা বিকট ধ্বনি আসবে এবং তারপরে আর কোনো ধ্বনি উঠবেনা। অর্থাৎ একটামাত্র বিকট ধ্বনিই তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট হবে। ফলে পুনরায় বিকট ধ্বনি ধ্বনিত হওয়ার কোনো প্রয়োজনই থাকবেনা।

مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ এর আর একটা ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, সেই নিনাদ দ্বারা তাদের ধ্বংস হতে এতোটুকু সময়ও লাগবেনা, যা উষ্ট্রীর স্তন থেকে একবার দুধ দুইয়ে নিংড়ানো থেকে দ্বিতীয়বার দোয়ানো পর্যন্ত লাগে। প্রচন্ড নিনাদ তাদেরকে নিমেষের মধ্যেই ধ্বংস করে দেবে, একথা আরবদেরকে জানানোর জন্যই এরূপ উক্তি করা হয়েছে। তখন এমন অবকাশও থাকবে না যে, কেউ পড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ দাপাদাপি করবে।

৬. এবার সূরা আল হাক্কাহর ১ থেকে ৫ এবং ১৩ থেকে ১৫ নং আয়াতের প্রসঙ্গে আসছি। প্রথম তিন আয়াতে কেয়ামতকে বুঝাতে 'আল হাক্কাহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মর্ম এই যে, কেয়ামতের ঘটনা একেবারে অবধারিত সত্য এবং তা ঘটবেই। এ কথাটা আমি আমার অনুবাদে هونى شدنى ('অনিবার্য সংঘটিতব্য') শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছি। ৪নং আয়াতে এই কেয়ামত বুঝাতেই কারিয়া قارعة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবি ভাষায় قرع শব্দের অর্থ হচ্ছে আঘাত করা, চূর্ণ করা, নাড়া দেয়া ও গড়িয়ে দেয়া এবং একটা জিনিসের উপর আর একটা জিনিস দিয়ে আঘাত করা। এর বিস্তারিত বর্ণনা ১৩ ও ১৪ নং আয়াতে এভাবে দেয়া হয়েছে যে, 'যখন একবার মাত্র শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং পৃথিবী ও পাহাড়গুলোকে উঠিয়ে একই আঘাতে চুরমার করে দেয়া হবে।'

অতঃপর ১৬ নং আয়াতে এই প্রক্রিয়াকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'শিংগায় ফুঁক দেয়ার কারণে আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং তার বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে।' অন্য কথায়, গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ বলয় থেকে ছিটকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। এবং তাদের মাঝখানে যে মহাশূন্য রাখা হয়েছে, তা লন্ডভন্ড হয়ে যাবে। এটা আল কারিয়ারই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। কুরআনের জায়গায় জায়গায় এর আরো অনেক বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এসবই সংঘটিত হবে শিংগায় ফুঁকের কারণে।

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শিংগা থেকে শুধু একটা ধ্বনিই নিনাদিত হবেনা, বরং এমন একটা প্রচন্ড শক্তিশালী জিনিসও বেরুবে, যা পাহাড় পর্বত ও পৃথিবীকে টুকরো টুকরো ও চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে এবং সৌর জগতকে তোলপাড় ও লন্ডভন্ড করে দেবে। ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সামুদ জাতির ধ্বংসের কারণ ছিলো طاغية 'তাগিয়া' যা দ্বারা মারাত্মক দুর্ঘটনা বুঝায়। এই দুর্ঘটনাকে সূরা আরাফে 'রাজ্ফা' رَجْفَةٌ অর্থাৎ প্রচন্ড ভূমিকম্প বলে অভিহিত করা হয়েছে। সূরা হুদে এই জিনিসকেই সায়হা বলা হয়েছে এবং এর ব্যাখ্যা আমি ইতিপূর্বেই করেছি। আর সূরা হামিম সিজদায় একে বলা হয়েছে 'সায়েকাতুল আযাব' অর্থাৎ আযাবের নিনাদ বা গর্জন।

এ দ্বারা বুঝা যায় যে, সামুদ জাতির উপর শুধু প্রচন্ড আওয়াজের আযাবই নামেনি বরং সেই সাথে ভূমিকম্পও এসেছিলো। ৬ নং আয়াতে আদ জাতির ধ্বংসলীলার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এতে বাতাসের শক্তির বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, সমগ্র আদ

জাতিকে প্রবল বাতাস দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে এবং তারা কাটা খেজুর গাছের ন্যায় ধরাশায়ী হয়েছে।

৭. সূরা আল কারীয়ার ব্যাপারে 'কারীয়া' শব্দের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বেই করেছি। এখানে কিয়ামতকে বুঝানোর জন্যই 'আঘাতকারী' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই 'আঘাতকারী'র আঘাত এমন প্রবল ও প্রচন্ড হবে যে, মানুষ কীটপতঙ্গের মতো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে এবং পাহাড় হয়ে যাবে ধুনা তুলোর মতো। এতে আল্লাহর অসীম শক্তিমত্তার আরো কিছু নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে, যার কোনো সম্পর্ক শব্দ বা বাতাসের সাথে নেই। (তরজমানুল কুরআন, জুন: ১৯৭৮)

৩২. ফিলিস্তিন দখলের চেষ্টা থেকে বনী ইসরাইলের পিঠটান।

প্রশ্ন: সূরা বাকারার ২৪৩ নং আয়াত হলো:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ

অর্থ: 'তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজ নিজ বাড়িঘর ছেড়ে হাজারে হাজারে বেরিয়ে পড়েছিলো?' এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আপনি ২৬৬ নং টীকায় বলেছেন, স্বদেশ ত্যাগের পর বনী ইসরাঈল যে ফিলিস্তিনে জেহাদ করতে অস্বীকার করেছিলো, সেই ঘটনার প্রতি এ আয়াতে ইংগীত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সিনাই মরুভূমিতেই আটক করেন। তাদের মৃত্যুর পর তাদের নতুন প্রজন্ম যৌবনে উপনীত হলে তারা ইউশা আ. এর নেতৃত্বে ফিলিস্তিন জয় করে। এ ঘটনা সত্য বটে। তবে আলোচ্য আয়াতকে এ ঘটনার সাথে খাপ খাওয়ানো সম্ভব নয়। কেননা এ আয়াতে মৃত্যুভীতিকে দেশত্যাগের কারণরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ বনী ইসরাইলের মিসর ত্যাগের কারণ মৃত্যুর ভয় ছিলনা। বরং মূসা আ. কে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوْسَى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ 'আমার বান্দাদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়' দ্বিতীয়ত আলোচ্য আয়াতে দেশত্যাগকে নিন্দনীয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথচ মিশর ত্যাগ নিন্দনীয় ব্যাপার ছিলনা, বরং হিজরত ছিলো। তৃতীয়, فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ আল্লাহ তাদেরকে বললেন, তোমরা মরে যাও। তারপর তাদেরকে আবার জীবিত করলেন। এ কথাটার প্রকাশ্য মর্ম এটাই যে, যাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছিল, তাদেরকেই পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল। আমি বহু সংখ্যক তাফসির পড়ে দেখেছি। আপনি যে ব্যাখ্যা করেছেন, সে রকম আর কোথাও দেখিনি। তাফসিরকারগন বরং এ বক্তব্যকে বনী ইসরাইলের একটি দলের প্রতি ইংগীতবহ বলে এবং তারা প্লেগের মহামারীর ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলো বলে মন্তব্য করেন। পথিমধ্যে তাদেরকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করা হয় এবং পরে তাদেরকেই আবার জ্যান্ত করা হয়। অনুগ্রহপূর্বক এ জটিলতার নিরসন করবেন।

জবাব: সূরা বাকারার যে আয়াতটির ব্যাখ্যা নিয়ে আপনি আপত্তি তুলেছেন, স্বয়ং তার শাব্দিক বিন্যাস এ ব্যাখ্যারই দাবি জানায়। পরবর্তী বাক্য পরম্পরা থেকেও এ

ব্যাখ্যারই সমর্থন পাওয়া যায়। এবং حَذَرَ الْمَوْتِ এর মাঝখানে وهُمْ اُلُوْفٌ (হাজারে হাজারে) কথাটার দিকে লক্ষ্য করুন। প্লেগ বা অন্য কোনো মহামারি যদি দেশ ত্যাগের কারণ হতো তাহলে এখানে وهُمْ اُلُوْفٌ বলাটা নিরর্থক হতো। কেননা এ ধরনের মৃত্যুভীতির শিকার দশবিশ জনও হতে পারে, শত শত মানুষও হতে পারে। আর এটা এমন কোনো ব্যাপার নয় যে, এজন্য শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে মেরে ফেলার কথা উল্লেখ করার কোনো গুরুত্ব থাকতে পারে। وهُمْ اُلُوْفٌ কথাটা এ বাক্যে স্পষ্টতই একথা ব্যক্ত করে যে, তারা হাজার হাজার সংখ্যক লোক হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর ভয়ে দেশ থেকে পালিয়ে এসেছিলো। الوف শব্দটা দশ হাজারের অধিক সংখ্যক লোকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই বিপুল সংখ্যক লোক হওয়া সত্ত্বেও তাদের পালিয়ে আসা নিন্দনীয় হতে পারে কেবল তখনই, যদি তারা কেবল কাপুরুষতার দরুন পালিয়ে এসে থাকে এবং জীবনের প্রবল মায়ায় প্রলুব্ধ হওয়ার কারণে মৃত্যুর আশংকা তাদেরকে দেশছাড়া করে থাকে। এর পরে فَقَالَ لَهُمُ اللّٰــهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ এ উক্তিটির অর্থ কেবল এটাই হওয়া জরুরি নয় যে, যাদেরকে মৃত্যু কবলিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, তাদেরকেই আবার জ্যান্ত করা হয়েছে। একটি জাতি সম্পর্কে যখন একথা বলা হবে তখন তার মর্ম হবে, তাদের মধ্যে যারা মৃত্যুভীতির শিকার, তাদেরকে সেই ভয়াল মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করানো হোক। আর একই জাতির সেই সব লোককে নব জীবনের প্রেরণায় উজ্জীবিত করতে হবে, যারা মৃত্যুর ভয়কে উপেক্ষা করে শত্রুর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। পরবর্তী আয়াত وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ 'আল্লাহর পথে লড়াই কর' থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মুসলমানদেরকে এ ঘটনা শুনিয়ে আল্লাহর পথে লড়াই করার হিম্মত ও উদ্দীপনা সঞ্চার করার উদ্দেশ্যেই এ আলোচনার অবতারণা। আলোচনার এই ধারাবাহিকতায় প্লেগ অথবা কোনো মহামারিতে মৃত্যুর আশংকার কি সঙ্গতি থাকতে পারে?

সবশেষে মিশর থেকে বনী ইসরাইলের দেশান্তরী হওয়ার হেতু মৃত্যুভীতি না হিজরতের আদেশ, সে প্রসঙ্গে আসা যাক। এক্ষেত্রে ভেবে দেখার বিষয় হলো মিশরে তারা সংখ্যায় এতো অধিক হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে লড়াই করে জান ও মাল বাঁচানোর বদলে হিজরতের নির্দেশ দেয়ার কারণ কি? এর কারণ এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তারা ফেরাউন ও তার দলবলের ভয়ে এতো আতংকিত ছিলো যে, নিষ্ঠুরতম নির্যাতন ভোগ করেও তারা টু শব্দটি করতো না। বরং মূসার কাছে এই মর্মে পাল্টা অভিযোগ তুলতো যে, আপনার আগমনের কারণে তো আমরা আরো বিপদে পড়ে গেলাম। (তরজমানুল কুরআন, মে: ১৯৭৯)

৩৩. তাফহীমুল কুরআনে تَسْوِيْل শব্দের কয়েক রকম অনুবাদ প্রসঙ্গে

প্রশ্ন: তাফহীমুল কুরআনের দুটো জায়গা আমার বিবেচনাধীন রয়েছে।

১. সূরা ইউসূফের ১৮ ও ৮৩ নং আয়াতে এ বাক্যটি এসেছে।

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ

আপনি এক জায়গায় এর অনুবাদ করেছেন, 'এ কথা শুনে তাদের পিতা বললেন, বরঞ্চ তোমাদের কুপ্রবৃত্তি তোমাদের জন্য একটা গুরুতর কাজকে সহজ করে দিয়েছে। বেশ, আমি ধৈর্য ধারণ করবো এবং খুব ভালোভাবেই করবো।'

অপর জায়গায় অনুবাদ করেছেন, 'পিতা এই বৃত্তান্ত শুনে বললেন, আসলে তোমাদের কুপ্রবৃত্তি তোমাদের জন্য একটা গুরুতর কাজকে সহজ করে দিয়েছে। ঠিক আছে, আমি ধৈর্য ধারণ করবো এবং ভালোভাবেই করবো।'

২. সূরা তোয়াহার ৯৬ নং আয়াতের একটা বাক্য হলো, كَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ

আপনি এর অনুবাদ করেছেন, 'আমার প্রবৃত্তি আমাকে এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।' এখানেও একই سَوَّلَتْ শব্দ রয়েছে। কিন্তু অনুবাদ ভিন্নরকম। অথচ উভয় জায়গায় এই ক্রিয়াটির কর্তা হলো নফ্স তথা প্রবৃত্তি। سَوِيْلٌ তো تَسْهِيْلٌ (সহজ করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়না। এ ব্যাপারে আপনার সুস্পষ্ট বক্তব্য চাই।

জবাব: সূরা ইউসুফের ১৮ ও ৮৩ নং আয়াতে سَوَّلَتْ এর যে মর্ম আমি উল্লেখ করেছি, আল্লামা যামাখশারী স্বীয় তাফসির গ্রন্থ কাশাফে অবিকল সেই মর্মই বিবৃত করেছেন। তিনি বলেন,

سَوَّلَتْ (سَهَّلَتْ مِنَ السَّوَالِ وَهُوَ الْاِسْتِرْخَاءِ) لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا (عَظِيْمًا اِرْتَكَبْتُمُوْهُ مِنْ يُوْسُفَ وَ هُوْ فَتْحُ فِىْ اَعْيُنِكُمْ

سَوَّلَتْ অর্থ: সহজ করে দিয়েছে এর মূল ধাতু হচ্ছে سَوَلٌ এবং তার অর্থ হচ্ছে নরম, নমনীয় বা ঢিলা করে দেয়া। আয়াতের মর্ম হলো, তোমাদের প্রবৃত্তি 'তোমাদের জন্য একটা গুরুতর ব্যাপারকে, যা তোমরা ইউসুফের সাথে করেছ, সহজ করে দিয়েছে এবং তোমাদের চোখে ওটাকে একটা মামুলী কাজ বানিয়ে দেখিয়েছে।'

পক্ষান্তরে سَوَّلَتْ শব্দটাকে সূরা ইউসুফের অনুবাদে যে অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, সূরা তোয়াহার ৯৬ নং আয়াতে শব্দের পূর্বাপর অবস্থান বিবেচনা করে সেই অর্থে গ্রহণ করা মানানসই মনে হয়না। কেননা এখানে সামেরী আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজের সাফাই দিচ্ছে। এজন্য এখানে আমি تَسْوِيْلٌ কে تَحْسِيْنٌ অর্থে গ্রহণ করেছি। আরবি অভিধানে এ অর্থটা গ্রহণের অবকাশও রয়েছে।

السويل ، تَحْسِيْنُ الشَّيْئِ وتَزْيِيْنُه اِلَى الْاِنْسَان لِيَفْعَلَه او يَقُوْلَه

تَسْوِيْلٌ অর্থ হলো কোনো জিনিসকে মানুষের সামনে মনোরম ও সুসজ্জিত করে দেয়া, যাতে সে তা করতে বা বলতে উদ্বুদ্ধ হয়।

অর্থাৎ কিনা সামেরী বলছে যে, এ কাজটাকে আমার প্রবৃত্তি আমার সামনে একটা ভালো কাজ হিসেবে তুলে ধরেছে।'

এই ভাবটাই আমি আমার অনুবাদে سجهايا (উদ্বুদ্ধ করেছে) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছি। এ শব্দটা আরবি سَوِيْلٌ শব্দের প্রায় সমার্থক।শাহ্ আব্দুল কাদের সাহেব এর অনুবাদ করেছেন এভাবে,

'আমার মন এটাকেই সুবিধাজনক বলে আমার কাছে প্রতীয়মান করেছে।'

খ্যাতনামা অভিধান বিশারদ স্বীয় গ্রন্থ' 'মুফরাদাতুল কুরআন' (কুরআনের শব্দার্থ) এ تسويل অর্থ সুন্দর করা ও সজ্জিত করা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, تسويل অর্থ হলো, প্রবৃত্তি যে কাজে মানুষকে প্ররোচিত করে, সেটাকে তার আকর্ষণীয় করে সজ্জিত করা এবং অন্যায় ও কুৎসিত জিনিসকে তার সামনে সুন্দর ও মনোহর করে পেশ করা।

প্রখ্যাত আরবি অভিধান 'কামুস' এ বলা হয়েছে, تلهث

سولت له نفسه كذا: زينت والاسول من ف اسفله استرخاوا

-এ কথাটার অর্থ হলো, তার প্রবৃত্তি তার জন্য অমুক জিনিসটাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ كَذَا বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যে বশ্যতা ও আনুগত্যের দিক দিয়ে কারো অধীনস্থ থাকে।)

লেন (LANE) স্বীয় অভিধান مدا القاموس এ سَوَّلَ এর অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে (MADE IT APPEAR EASY TO HIM) (ব্যাপারকে তার কাছে সহজ বলে প্রতীয়মান করেছে।) (তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল: ১৯৭৯)

আকায়েদ প্রসঙ্গ

০১. আল্লাহর গুণাবলীতে বৈপরিত্য, না সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

প্রশ্নঃ আপনি তাফহীমাত প্রথম খণ্ডের (মওদূদী রচনাবলী) (দৃষ্টির সংকীর্ণতা) শীর্ষক নিবন্ধে জনৈক প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি ছিলো, 'আল্লাহ দয়া মহানুভবতা, করুণা ও স্নেহ মমতার উৎস হওয়া সত্ত্বেও নিষ্পাপ শিশুদের উপর দুঃখ, কষ্ট ও বিপদ আপদ নাযিল করেন কেন? এর জবাব দিতে গিয়ে আপনি আল্লাহর রাজ্যে ঘটমান 'অশুভ জিনিসসমূহের' যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নিম্নলিখিত অনুমানসিদ্ধ তত্ত্বসমূহের উপর নির্ভর করেছেন।

১. সমগ্র সৃষ্টিজগতের সার্বিক কল্যাণই আল্লাহর অভিপ্রেত। এ জিনিসটাকে এক কথায় আপনি 'সার্বিক কল্যাণ নামে অভিহিত করেছেন।

২. সার্বিক কল্যাণ একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব। যেহেতু আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সুনিপুণ বিজ্ঞানী, তাই তিনি এ লক্ষ্য অর্জনের খাতিরে অবশ্যই এমন কোনো পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করে থাকতে পারেন, যা সর্বাধিক কার্যকর এবং সর্বোত্তম ফলদায়ক।

৩. বর্তমান পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার চেয়ে উত্তম এমন কোনো পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া যদি থাকতো, যা অবলম্বন করলে এসব আপদ ও অনাচার সংঘটিত হওয়া ছাড়াই সার্বজনীন কল্যাণ করা সম্ভব হতো, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই সেই উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করতেন।

আপনি আল্লাহর গুণাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'আমাদের ইচ্ছা আকাঙ্খা জানা সত্ত্বেও তিনি যখন তা পূরণ করতে অস্বীকার করেছেন, তখন আমাদের বুঝতে হবে এরূপ করা নিশ্চয়ই অপরিহার্য ছিলো এবং সেই সর্বজ্ঞ সত্তার কাছে এর চেয়ে ভালো কোনো পন্থা জানা ছিলনা। তা যদি থাকতো, তাহলে তিনি সেই ভালো পন্থাটাই অবলম্বন করতেন। কেননা তিনি সুবিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ। এমন সুবিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ সত্তা সম্পর্কে এরূপ ধারণা করার অবকাশ নেই যে, উৎকৃষ্টতর পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হলে তা বাদ দিয়ে তিনি নিকৃষ্টতর পন্থা অবলম্বন করবেন।'

উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে 'সেই সর্বজ্ঞ সত্তার কাছে এর চেয়ে ভালো কোনো পন্থা জানা ছিলনা, তা যদি থাকতো তাহলে সেই ভালো পন্থাটাই অবলম্বন করতেন' এই কথাটা পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব সমাবেশের একটা সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তই শুধু পেশ করেনা, বরং আল্লাহর সর্বজ্ঞ হওয়া এবং তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সম্পর্কে পাঠকের মনে এক উদ্ভট চিত্রও তুলে ধরে। আল্লাহকে সর্বজ্ঞ মেনে নেয়ার পর তার জ্ঞানকে কোনো বিশেষ পন্থা বা পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া স্বয়ং তার সর্বজ্ঞ হওয়াকে অস্বীকার করারই শামিল। যদি প্রমাণিত হয় যে, ঐসব আপদ ও

অনাচার দেখা দেয়া ছাড়া সার্বিক কল্যাণ অর্জন করা যায় এমন কোনো পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া চালু করতে আল্লাহ বাস্তবিকই সমর্থ ছিলেন, তবে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া সম্ভব যে, আল্লাহ অন্ততপক্ষে বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ নন। কেননা এমন একটা পদ্ধতি চালু করতে সক্ষম হয়েও চালু না করা আপনার মতে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার অভাব নির্দেশ করে। আর যদি আল্লাহর সর্বজ্ঞতা, বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞায় কোনো রকমের সন্দেহ করা কুফরী পদবাচ্য হয় এবং এটাই বুঝে নিতে হয় যে, আল্লাহর বিজ্ঞানময়তা, বিচক্ষণতা ও সর্বজ্ঞতা সকল সন্দেহের উর্ধ্বে। তাহলে একমাত্র এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হবে যে, আল্লাহ এমন কোনো ব্যবস্থা (যাতে কোনো আপদ অনাচার ছাড়াই সার্বিক কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব) চালু করতে আগেও সক্ষম ছিলেননা, এখনও সক্ষম নন, কোনো দিন সক্ষম হবেনও না। আশা করি আপনি আমার এই খটকা দূর করতে চেষ্টা করবেন এবং এমন একটা সন্তোষজনক জবাব দেবেন, যা দ্বারা অন্তত আমার পক্ষে স্থির করা সহজ হয়ে যায় যে, আল্লাহ শুধু সর্বজ্ঞ ও বিচক্ষণ, না শুধু সর্বশক্তিমান, না এক সাথে সর্বজ্ঞ এবং বিচক্ষণও, আবার সর্বশক্তিমানও।

জবাব: আপনার চিঠিটা কয়েক মাস আগে জেলে থাকাকালে আমার হস্তগত হয়েছিল। কিন্তু সেখানে সেন্সরশিপের যে অযৌক্তিক ও বিদঘুটে কড়াকড়ি ছিলো, তার দরুন আমি চিঠি লেখালেখি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। এ জন্য অন্যান্য বহু চিঠির মতো আপনার চিঠির জবাব দেইনি। এখন সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি। আপনি যে খটকাটির উল্লেখ করেছেন তার আসল কারণ হলো, আপনি আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা, তার সর্বজ্ঞতা এবং তার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার মধ্যে সংগতি ও সামঞ্জস্য না খুঁজে বিরোধ ও বৈপরিত্য অনুসন্ধানের চিন্তায় মগ্ন হয়েছেন। এই চিন্তা ভাবনা আপনাকে এমন অবস্থানে এনে দাঁড় করিয়েছে, যেখানে এগুলোর কোনো একটাকে অস্বীকার না করে আপনার উপায় নেই। পৃথিবীতে যে নানা ধরনের আপদ ও অনাচার বিরাজমান, এই বাস্তব ব্যাপারটাতো আপনি অস্বীকার করতে পারেননা। এখানে শয়তান রয়েছে, কুফরী, শিরক, নাস্তিকতা এবং অন্যান্য আকিদাগত বিভ্রান্তি বিদ্যমান। হত্যা, রক্তপাত, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, সমকাম এবং এ ধরনের অসংখ্য নৈতিক অনাচার বিরাজমান। সদাচার ও ন্যায়ের বিপক্ষে অন্যায় ও অনাচার প্রয়াসী শক্তিগুলো চতুর্দিকে প্রকাশ্যে তৎপর রয়েছে এবং সে জন্য নানা ধরনের জুলুম নির্যাতন চলছে। প্রশ্ন হলো, এ সব অনাচার আদৌ বিরাজ করতো না এবং এগুলো ছাড়াই ন্যায় সত্য ও কল্যাণের বিকাশ ঘটতে পারতো, এমন জগত সৃষ্টিতে আল্লাহ সমর্থ ছিলেন কি ছিলেননা? যদি তিনি সমর্থ থেকে থাকেন, অথচ তা সত্ত্বেও তা করেননি, তাহলে খোদা না করুক, তাঁকে বিচক্ষণতা, ন্যায় পরায়ণতা ও কল্যাণকারিতার গুণাবলী থেকে বঞ্চিত সাব্যস্ত না করে আপনার উপায়ান্তর নেই। আর যদি তিনি করতে সক্ষম না থেকে থাকেন, তাহলে আপনার যুক্তি অনুসারে তিনি অনিবার্যভাবে অক্ষম বিবেচিত হন।

মানুষকে আল্লাহর গুণাবলীতে সংগতি ও সমন্বয়ের পরিবর্তে বৈপরিত্য অনুসন্ধানে প্ররোচিত করাই যেখানে যুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে যুক্তি প্রয়োগের এরূপ ফল দেখা দেয়াই অবশ্যম্ভাবী। আমি তা না করে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছি। আমি বুঝাতে চেয়েছি যে, আল্লাহর সৃষ্টি করা এই পৃথিবীতে অন্যান্য অনাচার দেখে ঘাবড়ানো উচিত নয়, বরং তাঁর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার উপর আস্থা রাখা চাই। তিনি যখন পৃথিবীর বিধিব্যবস্থা এভাবেই তৈরি করেছেন, তখন নিশ্চয়ই এ ধরনের বিধিব্যবস্থা সৃষ্টি করাই আল্লাহর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার দাবি ছিলো এবং এ ছাড়া অন্যায় অনাচার ও উপদ্রবহীন অন্য কোনো বিধি ব্যবস্থা তৈরি করা তাঁর বিবেচনা মতে প্রজ্ঞাসিদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত কাজ হতোনা। আমার এই বিশ্লেষণে আপনি যদি সন্তুষ্ট না হন, তা হলে দুটো পন্থার যে কোনো একটি অবলম্বন করুন। হয় সমন্বয়ের অন্য কোনো উৎকৃষ্টতর উপায় উদ্ভাবন করে আমাকে পথ প্রদর্শন করুন। নচেত আল্লাহ আপনার দৃষ্টিতে ক্ষমতাহীন না প্রজ্ঞাহীন, সে সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলুন। (তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারিঃ ১৯৬৫)

০২. আল্লাহর অস্তিত্ব প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন।

প্রশ্নঃ আমার এক বন্ধুর মনে বহুদিন যাবত নিম্নোক্ত প্রশ্নটি জট পাকিয়ে রেখেছে। আমি অনেক চেষ্টা করেও সঠিক জবাব দিতে পারিনি। আশা করি জবাব দিয়ে উপকৃত করবেন। প্রশ্নটা হলোঃ আল্লাহর অস্তিত্ব কিভাবে উদ্ভুত হলো? প্রত্যেক অস্তিত্ববান সত্তা বা বস্তুর একজন স্রষ্টা থাকা তো বুদ্ধির দাবি অনুসারে অপরিহার্য।

জবাবঃ কোনো সত্তা বা বস্তুর জন্য একজন স্রষ্টা থাকা যেমন বুদ্ধির দাবি তেমনি এটাও বুদ্ধির দাবি যে, সকল সৃষ্টজগতের স্রষ্টা এমন একজন হওয়া চাই, যিনি কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আপনা থেকেই বিরাজমান থাকবেন। তাহলে প্রত্যেক অস্তিত্বের জন্য একজন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন হবে এবং এই ধারাবাহিকতার কোনো শেষ থাকবেনা। খোদাতো তাকেই বলা হয়, যিনি সবকিছুর স্রষ্টা এবং যিনি স্বয়ং কারোর সৃষ্টি নন। তিনিও যদি কারোর সৃষ্টি হন, তাহলে তিনি খোদা হতে পারেননা। বরং যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই খোদা হবেন। (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বরঃ ১৯৬৫)

০৩. নবীদের নিষ্পাপত্ব।

প্রশ্নঃ আপনি তাফহীমাত দ্বিতীয় খন্ডে দাউদ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আলোচনা প্রসঙ্গে নবীদের নিষ্পাপত্ব সম্পর্কে যে কথা লিখেছেন, তার কারণে আলেমদের একটি গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন যে, আপনি নবীদেরকে নিষ্পাপ মনে করেননা। এখন মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব স্বীয় সাম্প্রতিক পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তাদের যাবতীয় আপত্তি খণ্ডন করে দিয়েছেন। কিন্তু এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর একটি ইসলামি মাদ্রাসার মুহাদ্দিস উক্ত পুস্তকের পর্যালোচনা করে পুনরায় আপনার প্রতি ঐ অভিযোগ আরোপের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মাওলানা মওদূদীর এইসব বক্তব্যে এমন তত্ত্ব ও ধারণা পাওয়া যায়, যার ভিত্তিতে একজন বিশুদ্ধ মুসলমান এবং খাঁটি

রসূল প্রেমিকের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদীকে বেয়াদবীর দোষে দোষী এবং ধর্মীয় বিধি-নিষেধের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী বলে মনে হবে।'

অতঃপর আবার বলেন: 'মাওলানা মওদূদীর এ বক্তব্যের এরূপ ব্যাখ্যা অপরিহার্য যে, নবীদের নিষ্পাপ হওয়া ও গুনাহ্ থেকে নিরাপদ হওয়ার অর্থ কুফরী, মিথ্যাচার যাবতীয় কবিরা গুনাহ ও নিকৃষ্ট ধরনের সগিরা গুনাহ্ থেকে নিরাপদ হওয়া। আর 'পদস্খলন' দ্বারা কুফরী, মিথ্যাচার এবং অন্য সকল কবিরা গুনাহ্ ও নিকৃষ্ট ধরনের সগিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া বুঝায়।'

এরপর এভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, 'নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে দেয়ার পর যে কাজ সংঘটিত হবে, সেটাতো সংরক্ষণ ব্যবস্থা বহাল থাকা অবস্থায় যা সংঘটিত হতে পারতোনা, তাই হবে। অতএব এ ব্যাখ্যা অনুসারে, এটাই স্বতসিদ্ধ প্রমাণিত হবে যে, মাওলানা মওদূদীর মতে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ যতো নবী এসেছেন, তাদের প্রত্যেক নবীর উপর থেকে কোনো না কোনো সময় আল্লাহ্ তায়ালা আপন সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে দু-একটা কবিরা গুনাহ্ সংঘটিত হতে দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি কোনো না কোনো সময়ে কোনো কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়, চাই তা একটা গুনাহ্, দুইটা গুনাহ্ বা দুশোটা গুনাহ্, তিনি আর যাই হোন নিষ্পাপ নন। আর গুনাহে লিপ্ত থাকাকালে তিনি নবী পদবাচ্যও হবেননা। কেননা নবুয়্যতের সাথে কবিরা গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকা অপরিহার্য।

এসব ব্যাখ্যা ও আন্দাজ অনুমানের জবাব যদি আপনি নিজেই দিয়ে দেন, তাহলে আশা করা যায়, আপত্তি উত্থাপনকারীদের যুক্তি খণ্ডিত হবে।

জবাব: এ সমস্যার ব্যাখ্যা হলো, আমার যে বক্তব্যের একটা অংশকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আপত্তিকারীগণ আমাকে নবীদের নিষ্পাপত্বের বিরোধী বলে আখ্যায়িত করে ফেলেছেন, সেটা নবীদের নিষ্পাপত্ব সংক্রান্ত কোনো সাধারণ তাত্ত্বিক আলোচনার অংশ ছিলনা। সেটা ছিলো দাউদ আ. সংক্রান্ত সূরা সোয়াদের কতিপয় আয়াত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখিত একটি প্রাসঙ্গিক কথা। আমি সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। ঐ প্রশ্নটার সূত্রপাত হয় এভাবে যে, কুরআনে একাধিক জায়গায় নবীদের দ্বারা সংঘটিত এমন কিছু কিছু কাজের উল্লেখ করা হয়েছে, যার জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে ভৎসনা করেছেন। যেমন আদম আ. সম্পর্কে বলা হয়েছে: وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى 'আদম তার প্রতিপালকের নাফরমানী করলো এবং বিপথগামী হলো।' নূহ আ. সম্পর্কে বলেছেন: اِنِّىْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ 'আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যেন মূর্খদের দলভুক্ত হইও না।' দাউদ আ. সম্পর্কে বলেছেন: وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ 'তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ করোনা। তাহলে প্রবৃত্তি তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে।' ইউনুস আ. সম্পর্কে বলেছেন: اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ 'স্মরণ করো, যখন সে একটি বোঝাই ভরা নৌকার দিকে পালিয়ে যেতে লাগলো। পরে লটারিতে শরীক হলো এবং তাতে ধরা পড়ে গেলো।' এবং وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ

اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ 'মাছওয়ালার মতো হইও না। স্মরণ করো, সে যখন ডাক দিয়েছিলো চিন্তায় দুঃখে ভারাক্রান্ত অবস্থায়।'

অনুরূপভাবে খোদ আমাদের নবী সা. সম্পর্কে বলেছেন:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَه اَسْرٰى 'নবীর হাতে বন্দী থাকা উচিত ছিলনা।' -সূরা আনফাল।

عَفَى اللهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ 'তাদেরকে তুমি যে ছুটি মঞ্জুর করেছিলে (যুদ্ধে না যাবার জন্য) সেটা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। -সূরা তওবা।

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ 'আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তুমি তা হারাম করো কেন?' এবং عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى 'তিনি (নবী সা.) মুখ ভার করলেন এবং অনাগ্রহ দেখালেন এ জন্য যে, তাঁর কাছে সেই অন্ধ লোকটি এসেছিলো।'

এই সব জায়গায় কুরআনের বর্ণনাভঙ্গী থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবীর দ্বারা আল্লাহর অপছন্দনীয় কোনো কাজ সংঘটিত হয়েছে। তাই আল্লাহ নিজের অসন্তোষ ব্যক্ত করে নবীকে সতর্ক করে তাকে শুধরানোর চেষ্টা করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, নবীদের নিষ্পাপত্বের সাথে এ জিনিসটা কিভাবে খাপ খায় আমরা কি এটা বুঝবো যে, নবী যে অমুক কাজ করবেন তা আল্লাহ জানতেন না, ফলে পরে সে কাজটা সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহ জানতে পারলেন এবং নবীকে হুঁশিয়ার করলেন? আল্লাহ মাফ করুন, এটা যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে আপত্তি শুধু নবুয়ত নিয়েই ওঠেনা, বরং আল্লাহর সর্বজ্ঞতার গুণ নিয়েও ওঠে। আর যদি বলা হয়, কাজটা সংঘটিত হওয়ার আগেই আল্লাহ জানতেন, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, আল্লাহ তাহলে আগে থেকেই তাকে ঠেকালেন না কেন। প্রথমে কাজটা তো হয়ে যেতে দেয়া হলো, তারপর তা ধরে দিয়ে শুধু যে শুধরানো হলো তা নয়, বরং যে কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিন ও কাফের পড়বে, সেই কিতাবেও তা উল্লেখ করা হলো। এর কি সার্থকতা ছিলো?

কুরআনের এই জায়গাগুলোতে স্বভাবতই এ প্রশ্ন ওঠে। আর তাই প্রশ্নটা আগাম ধরে নিয়ে আমি তার জবাব দিতে গিয়ে বলেছি, 'নিষ্পাপত্ব আসলে নবীদের সহজাত কোনো অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য নয়, বরং আল্লাহ তাদেরকে নবুয়তের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার সুবিধার্থে ভুলভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। নচেত যদি আল্লাহর সংরক্ষণ ব্যবস্থা ক্ষণিকের জন্যও তাদের উপর থেকে তুলে নেয়া হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের যেমন ভুলত্রুটি হয়ে থাকে, তেমনি নবীদেরও হতে পারে। আর এটা একটা মজার ব্যাপার যে, আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যেক নবীর উপর থেকে কোনো না কোনো সময় আপন সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে নিয়ে দু-একটা পদস্খলন ঘটতে দিয়েছেন, যাতে জনগণ নবীদেরকে খোদা মনে না করে বসে এবং নিশ্চিত হয় যে তারা মানুষ, খোদা নয়।

এখন লক্ষ্য করুন, গোটা আলোচনার পটভূমি বলছে যে, এখানে নবীদের নিষ্পাপত্ব সম্পর্কে এমন কোনো সাধারণ আলোচনা করা হচ্ছেনা, যাতে নবীদের দ্বারা কি ধরনের পদস্খলন ঘটা সম্ভব এবং কি ধরনের পদস্খলন ঘটা সম্ভব নয়, তা আলোচনার বিষয় হয়ে থাকে। এখানে শুধুমাত্র কুরআনে উল্লিখিত পদস্খলন গুলোই আলোচিত হয়েছে। আর এগুলো নিয়েও শুধুমাত্র এই দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে যে, নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও এসব পদস্খলন ঘটা কিভাবে সম্ভব হলো। এগুলো সংঘটিত হওয়ার আগেই তা রোধ করা হলো না কেন? আর সংঘটিত হওয়ার পর তাদেরকে চুপিচুপি সাবধান করা যথেষ্ট মনে করা হলো না কেন? ব্যাপারটা কুরআনে আলোচনা করা জরুরি মনে করা হলো কেন?

কিন্তু আপত্তিকারীরা পয়লা জুলুম তো এভাবে করলেন যে, এটাকে নবীদের নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে একটা সাধারণ আলোচনা ধরে নিলেন। অথচ আসলে তা ছিলো একটা বিশেষ আলোচনা এবং তা নিছক অন্য একটা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে এসে গিয়েছিলো। তারপর দ্বিতীয় অবিচার তারা এভাবে করলেন যে, পদস্খলনের সম্ভাবনাকে তারা সকল ধরনের গুনাহ, কবিরা গুনাহ, এমনকি কুফরী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে দিলেন। অথচ আমার বক্তব্যে শুধুমাত্র কুরআনে বর্ণিত পদস্খলনগুলোই আলোচিত হয়েছিল। এর চেয়েও বড় অবিচার তারা যেটা করলেন তাহলো, তারা পাপ থেকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রত্যাহারকে সামগ্রিক প্রত্যাহার মনে করে এরূপ সম্ভাবনা সৃষ্টি করে ফেললেন যে, নিষ্পাপত্ব যখন উঠেই গেলো, তখনতো কুফরী, মিথ্যাচার এবং যাবতীয় কবিরা ও সগিরা গুনাহ হতে পারতো। অথচ একজন মামুলী লেখাপড়া জানা লোকও বুঝতে পারে যে, আমার লেখায় শুধুমাত্র কোনো বিশেষ অবস্থায় কোনো বিশেষ পদস্খলনের পর্যায়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে নেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, পুরোপুরিভাবে নিষ্পাপত্ব তুলে নেয়ার কথা নয়। যে সকল ভদ্রমহোদয় মান্তেক (যুক্তিবিদ্যা) ও ফিলোসফি (দর্শনশাস্ত্র) পড়িয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন, তারা যে নিষ্পাপত্বের আংশিক প্রত্যাহার ও সামগ্রিক প্রত্যাহারের পার্থক্য বুঝতে পারবেন না এটা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং আমার এরূপ ধারণা করার অধিকার রয়েছে যে, এ কারসাজিটা বুঝেসুজেই করা হয়েছে, যাতে করে আমাকে কোনো না কোনা উপায়ে নবীদের নিষ্পাপত্ব অস্বীকারকারী বলে আখ্যায়িত করা সম্ভব হয়। আর এখন আমার এই ব্যাখ্যা দেয়ার পরও এটা বিচিত্র নয় যে, তাঁরা তাদের লেখায় ও ভাষণে এই অপবাদ আরোপ করা অব্যাহত রাখবেন, যেমন বহু বছর ধরে তারা করে এসেছেন। আসল ব্যাপার হলো, কোনো তাত্ত্বিক মতভেদ নয় বরং বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই এ অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। আর বিদ্বেষের সাথে খোদাভীতির সহাবস্থান খুবই বিরল। আমার এ অভিজ্ঞতা বহুবার হয়েছে যে, যেসব অভিযোগের বিস্তারিত জবাব দিয়ে আমি তাদের যুক্তি খণ্ডন করে দিয়েছি, তারা সেগুলোর পুনরাবৃত্তি এমনভাবে করে এসেছেন, যেন তার আদৌ কোনো জবাব দেয়া হয়নি।

আপনি ইচ্ছা করলে ঐ মুহাদ্দিস সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, কুরআনের যে আয়াতগুলো সম্পর্কে আমি এ কথাগুলো লিখেছি তা থেকে ঐ প্রশ্নগুলো জাগে কিনা, যার জবাব আমি ঐ কথাগুলোতে দিয়েছি। যদি জাগে তাহলে তারা নিজেরা সে সব প্রশ্নের কি জবাব দেবেন? আমার জবাব যদি কোনো বিজ্ঞ আলেমের কাছে ভুল মনে হয়, তবে তার মতে সঠিক জবাব কি, তা বলে দিলেই পারেন। (তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি: ১৯৬৮)

৪. সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সুন্নি মুসলমানদের আকিদা।

প্রশ্ন: আপনার পুস্তক 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' (খেলাফত ও রাজতন্ত্র) আমি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়ে দেখেছি। আপনার কয়েকটা কথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের (সুন্নি মুসলমানদের) সর্বসম্মত আকিদার সম্পূর্ণ বিপরীত বলে মনে হয়। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের নীতি হলো, সাহাবায়ে কেরামের কারোরই কোনো দোষত্রুটি বলা যাবেনা। যে বলবে, সে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের দল থেকে খারিজ হয়ে যাবে। আপনার যে কথাগুলো এই আকিদার পরিপন্থী, তা নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

১. 'জনৈক প্রবীণ সাহাবি আপন ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে অপর একজন প্রবীণ সাহাবির ব্যক্তিগত স্বার্থের দোহাই দিয়ে আবেদন জানিয়ে এই প্রস্তাবের উদ্ভব ঘটালেন।'-খেলাফত ও মুলুকিয়াত, পৃষ্ঠা- ১৫।

২. এসময় নবুয়তের আদর্শের ভিত্তিতে খেলাফত বহাল থাকার একটিমাত্র উপায় অবশিষ্ট ছিলো। সেটি হলো: মোয়াবিয়া রা. হয় খলিফার পদে কাকে নিযুক্ত করতে হবে সেটা মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শের উপর সমর্পণ করতেন, নচেত যদি বিপদের পথ রুদ্ধ করার জন্য নিজের জীবদ্দশাতেই কে স্থলাভিষিক্ত হবে সে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে যাওয়া জরুরি মনে করতেন, তবে বিজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে স্বাধীনভাবে ফায়সালা করার সুযোগ দিতেন যে, স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য উম্মাতের ভেতরে যোগ্যতম ব্যক্তি কে? কিন্তু নিজের ছেলে এজিদকে স্থলাভিষিক্ত করার জন্য ভীতি ও প্রলোভন দেখিয়ে সম্মতি আদায় করে তিনি সেই সম্ভাবনারও বিলুপ্তি ঘটালেন।' পৃষ্ঠা- ১৪৮।

অনুগ্রহপূর্বক আপনি বলুন, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত আকিদাকে আপনি সঠিক মনে করেন, না ভ্রান্ত মনে করেন।

জবাব: আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়ার আগে অনুগ্রহপূর্বক আমার নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর জবাব দিন।

১. আপনার আকিদা কি এই যে, কোনো সাহাবি ভুল করতে পারেননা?

২. আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, সাহাবি দ্বারা ভুল হওয়া সম্ভব হলেও কোনো সাহাবি কার্যত ভুল করেননি?

৩. আপনার অভিমত কি এই যে, সাহাবিদের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের ভুলত্রুটি হওয়া সম্ভবও ছিলো এবং হয়েছেও। তবে তা বলা জায়েয নয় এবং কোনো সাহাবির ভুলকে ভুল বলাও বৈধ নয়?

উল্লিখিত তিনটে মতের কোনটি আপনি পোষণ করেন তা খোলাখুলিভাবে জানান, যাতে আপনি নিজেই আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতভুক্ত কিনা, তা আমি নির্ণয় করতে পারি। আপনি যদি প্রথম মতটি পোষণ করেন, তাহলে ওটা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের কারোরই আকিদা নয়। আর যদি দ্বিতীয় মতের প্রবক্তা হয়ে থাকেন, তবে সেটা অকাট্য ঘটনাবলী দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণিত। স্বয়ং কুরআনে, বহুসংখ্যক সহিহ হাদিসে এবং আহলে সুন্নাতের নামকরা মনীষীদের বর্ণনায় এসব প্রামাণ্য ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। আর যদি তৃতীয় মতের সমর্থক হয়ে থাকেন, তবে সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা খোদ কুরআনে একাধিক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামের কিছু কিছু ভুলক্রটির উল্লেখ করেছেন, হাদিসবেত্তাগণ সে সম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, আর তাফসিরকারগণের মধ্যে সম্ভবত এমন একজনেরও নাম আপনি উল্লেখ করতে পারবেননা, যিনি এসব ঘটনা বর্ণনা করেননি। এবার আহলে সুন্নাতের যে আকিদার কথা আপনি বলেছেন, সে প্রসঙ্গে আসা যাক। এই আকিদা শুধু এতোটুকু যে, সাহাবাদের নিন্দা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা জায়েয নেই। আল্লাহর অনুগ্রহে এ কাজটা আমি কখনো আমার কোনো রচনায় করিনি। তবে কোনো তাত্ত্বিক আলোচনায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে বর্ণনা করা আহলে সুন্নাতের আলেমদের নিকট কখনো অবৈধ ছিলনা। সুন্নি আলেমগণ কখনো এ কাজ থেকে বিরতও থাকেননি। কোনো আলেম কখনো একথাও বলেননি যে, সাহাবাদের দ্বারা কোনো ভুল হয়ে থাকলে তাকে সঠিক বলতে হবে বা ভুল বলা যাবেনা। আপনি নিজেই লক্ষ্য করুন যে আমি যেসব ঘটনা বর্ণনা করেছি, তা আহলে সুন্নাতের প্রবীণ আলেমদের লেখা গ্রন্থাবলী থেকেই গৃহীত। তারা যে এসব ঘটনাকে তাদের গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত করেছেন, এটা যদি তারা সঠিক মনে করে থাকেন, তবে আপনার মতানুসারে তাদেরও আহলে সুন্নত থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার কথা। আর যদি ভুল ও সন্দেহজনক জেনেও তারা এসব ছড়িয়ে থাকেন এবং পরবর্তী বংশধরের গোচরে এনে থাকেন, তবে তো আপনার বলা উচিত তারা মিথ্যাচারী। কেননা হাদিসে আছেঃ

كَفٰى بِالْمَرْئِ كَذِبًا اَنْ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ 'যা কানে আসে তাই প্রচার করে বেড়ানো মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।' (তরজমানুল কুরআন, জুলাইঃ ১৯৬৮)

৫. রসূল সা.-এর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা।

প্রশ্নঃ ১. আপনার রচিত 'সুন্নাত কি আইনী হাইসিয়াত' (সুন্নাহর সাংবিধানিক মর্যাদা) গ্রন্থখানি আমি পড়েছি। এ গ্রন্থ পড়ে আমার প্রায় সকল সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয়েছে। মাত্র কয়েকটা সন্দেহ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। সেগুলো দূর করার উদ্দেশ্যে আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। আশা করি আপনি আমাকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেবেন। এ গ্রন্থে ৭৯ পৃষ্ঠায় আপনি লিখেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট ভাষায় রসূল সা.-কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহর আদেশ নিষেধ ও হালাল হারাম সংক্রান্ত নির্দেশাবলী শুধু কুরআনে বর্ণিত নির্দেশাবলীর মধ্যেই সীমিত নয়। বরং রসূল সা. যেসব জিনিসকে হালাল বা হারাম করেছেন এবং তিনি যে কাজের আদেশ

দিয়েছেন বা যা করতে নিষেধ করেছেন, তাও আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই করেছেন। তাই সেগুলিও আল্লাহর আইনেরই অংশ।' কিন্তু আপনি রসূল সা.-এর আইন প্রণয়নমূলক কাজের যে উদাহরণগুলো দিয়েছেন (৮৮ থেকে ৯০ পৃষ্ঠা) তা আসলে আইন প্রণয়নমূলক কাজ নয় বরং ব্যাখ্যামূলক কাজ। যে কয়টি উদাহরণ আমার কাছে আইন প্রণয়নমূলক কাজের বলে মনে হয়েছে, তা নীচে উল্লেখ করছি এবং সেগুলো সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যা চাইছি।

ক. ৮৯ পৃষ্ঠায় কতিপয় খাদ্যদ্রব্যের হারাম হওয়ার ব্যাপারে আপনি শুধু সূরা মায়েদারই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সূরা আনয়ামের ১৪৫ নং আয়াতের আলোকে শুধুমাত্র মৃত প্রাণী, প্রবহমান রক্ত, শূকরের গোশত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে জবাই করা জন্তু হারাম প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ বলেন: উল্লিখিত জিনিসগুলো ছাড়া আর কোনো খাবার জিনিস ওহীর মাধ্যমে হারাম করা হয়নি। তাহলে রসূল সা. অন্যান্য জিনিসকে হারাম করার নির্দেশ কিভাবে পেলেন?

খ. শরিয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে পাথর মেরে হত্যা করার বিধান দিয়েছে। কিন্তু কুরআনে এ অপরাধের জন্য এ শাস্তির উল্লেখ পাওয়া যায়না। তাহলে এ শাস্তির বিধান কিভাবে হলো?

উপরোক্ত দুটো উদাহরণে প্রচলিত শরিয়তের বিধান ও কুরআনের বিধানের মধ্যে দৃশ্যত কিছু বৈপরিত্য চোখে পড়ে। কিন্তু বাস্তবে তো তেমনটি হওয়ার কথা নয়। আশা করি আপনি আমাকে প্রকৃত সত্য বুঝিয়ে দিয়ে উপকৃত করবেন।

জবাবঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বলতে আমি একথা বুঝাইনি যে, আল্লাহ তায়ালা রসূল সা. কে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে নিজের ইচ্ছা মতো যে কোনো জিনিসকে হালাল এবং যে কোনো জিনিসকে হারাম ঘোষণা করার ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিলেন। আমি বরং এ কথাই বলতে চেয়েছি যে, প্রত্যেকটা নির্দেশ কুরআনের মাধ্যমেই আসতে হবে এটা জরুরি ছিলনা। রসূল সা.-এর মুখ দিয়ে যে নির্দেশ জারি হতো তাও আল্লাহর ইংগীতেই জারি হতো। এ জন্য রসূল সা.-এর কাছ থেকে মুসলমানরা যে নির্দেশ পাবে, তা মেনে চলা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিলো। তাঁর কাছ থেকে কোনো নির্দেশ পাওয়ার পর তাঁকে একথা জিজ্ঞেস করার অধিকার মুসলমানদের ছিলনা যে, আপনি কুরআনের কোন্ আয়াত থেকে এ নির্দেশ খুঁজে পেয়েছেন? তাদের এ কথাও বলার অধিকার ছিলনা যে, আপনি যে নির্দেশ দিচ্ছেন তা যেহেতু কুরআনে নাযিল হয়নি, তাই আমরা ওটা মানতে বাধ্য নই। প্রশ্ন হলো, রসূল সা. নামাযের যে নিয়মবিধি মুসলমানদেরকে নিজে নামায পড়ে ও পড়িয়ে হাতে-কলমে শিখিয়েছেন এবং এর যে খুঁটিনাটি বিধি মৌখিক নির্দেশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, তা কুরআনের কোথায় লেখা ছিলো? অথচ মুসলিম জনগণ তা মানতে বাধ্য ছিলো। কেননা তাদেরকে শুধু কুরআনের নয়, রসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করার নির্দেশও দেয়া হয়েছিল।

আইন প্রণয়নমূলক ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক কাজের যে পার্থক্য আপনি নির্দেশ করেছেন, তা নিয়ে আপনি নিজেই যদি চিন্তা ভাবনা করেন, তাহলে আপনি বুঝতে

পারবেন যে, আসলে এদুটো কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহর কোনো সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট নির্দেশের ব্যাখ্যা যখন রসূল সা. নিজের কাজ ও কথা দ্বারা করতেন, তখন সেটাও মূল নির্দেশের মতোই আইনগত মর্যাদার অধিকারী ছিলো। অথচ সেই ব্যাখ্যা কুরআনে বর্ণিত হয়নি।

সূরা আনয়ামের ১৪৫নং আয়াতের পূর্বাপর বক্তব্য যদি আপনি বিবেচনা করেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে তার তাৎপর্য হলো, জাহেলিয়াতের আমলে আরবরা যেসব জিনিসকে হারাম করে রেখেছিলো, তা আসলে হারাম বা নিষিদ্ধ নয়। বরং এ আয়াতে যেগুলোকে হারাম বলা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোই হারাম। তাই বলে এর অর্থ এটা নয় যে, এই চারটে জিনিস ছাড়া আর কোনো জিনিসই নিষিদ্ধ নয়। হিংস্র পশু ও শিকারি পাখিকে হারাম ঘোষণা করে রসূল সা. যে নির্দেশ জারি করেছেন, তা দ্বারা এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং রসূল সা. কুরআনে বর্ণিত হারাম জিনিসগুলো ছাড়া অন্য যেসব জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেছেন, সে নির্দেশ কুরআনের নির্দেশের অতিরিক্ত। এ নির্দেশ রসূল সা. গোপন ওহীর ভিত্তিতে দিয়েছেন।

ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি সূরা নূরের তাফসিরে। আপনি সেটা পড়ে দেখুন। সেখানে আমি স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, সূরা নূরে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর জন্য যে বেত্রদন্ডের বিধান দেয়া হয়েছে, তা মূলত অবিবাহিত অপরাধীর জন্য। এর প্রমাণ খোদ কুরআনের অন্যান্য স্থানে রয়েছে। সূরা নূরের তাফসিরে এবং সূরা নিসার ২৫ নং আয়াতের তাফসিরে আমি সে স্থানগুলোর বিবরণ দিয়েছি। এ ব্যাপারে আপনি তাফহীমুল কুরআন প্রথম খন্ডের উর্দু ৩৪২-৩৪৩ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করলেও বিষয়টা আপনার কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যাবে। এ সমস্ত আলোচনা নিবিষ্টভাবে পড়লে আপনি জানতে পারবেন যে, বিবাহিত লোকদেরকে ব্যভিচারের জন্য পাথর মেরে হত্যা করার দন্ড দেয়া কুরআনের কোনো নির্দেশের পরিপন্থী নয়, বরং এটা একটা বাড়তি নির্দেশ, যা রসূল সা. গোপন ওহীর মাধ্যমে পেয়েছিলেন। সে ওহি কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

প্রশ্ন: ২. আমার প্রথম চিঠির জবাবে আপনি বলেছেন, সূরা আনয়ামের আয়াতের তাৎপর্য হলো, জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা যেসব জিনিসকে হারাম বলে চিহ্নিত করে রেখেছিলো, 'সেগুলো হারাম নয়' বরং এই আয়াতে বর্ণিত জিনিসগুলোই হারাম। কিন্তু কুরআনে শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত থাকা হয়নি। বরং একথাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, রসূল সা.-এর কাছে নাযিলকৃত ওহীতে এই জিনিসগুলো ছাড়া আর কিছুই হারাম করা হয়নি। কুরআনের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট এবং তাতে কোনো গোঁজামিল নেই। তাহলে আপনি একথা কেন বলেন যে, এর অর্থ এটা নয় যে, এই চারটে জিনিস ছাড়া আর কোনো কিছুই হারাম নয়।' অনুগ্রহপূর্বক বিষয়টা বুঝিয়ে দেবেন।

তাফহীমুল কুরআন আগেও পড়েছি। এখন আপনার উপদেশক্রমে সূরা নিসা ও সূরা নূরে আপনার টীকাগুলো পুনরায় পড়লাম। তবে আপনি যদি বেয়াদবী মনে না করেন

তবে সবিনয়ে বলছি, আপনার যুক্তিগুলো সন্তোষজনক মনে হয়নি। দুটো জিনিসের মধ্যে তুলনা করতে হলে ঐ জিনিস দুটোর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়াই প্রচলিত রীতি। অর্থাৎ একজন বিবাহিতা দাসীকে যদি একজন অভিজাত মহিলার শাস্তির কোনো অংশ পেতে হয়, তবে ঐ অভিজাত মহিলারও বিবাহিতা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় কুরআনের একথা স্পষ্ট করে বলা উচিত ছিলো যে, এখানে বিবাহিতা দাসীকে বিবাহিতা অভিজাত মহিলার সাথে তুলনা করা হচ্ছে না, বরং অবিবাহিতা অভিজাত মহিলার সাথে তুলনা করা হচ্ছে। আপনি কি বলতে পারবেন যে, কুরআন কিংবা রসূল সা. -এ ব্যাপারে কোনো স্পষ্টোক্তি করেছেন? সূরা নূরে আপনার টীকায় ৩৩৯ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে যে, আলী রা. এক মহিলাকে বেত্রদন্ড দিলেন এবং শুক্রবারে তাকে পাথর মেরে হত্যা করালেন। পরে তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে বেত্রদন্ড দিয়েছি এবং রসূল সা.-এর সুন্নত অনুসারে পাথর মেরে হত্যা করাই। এর অর্থ হলো, আলীর মতে সূরা নূরে বর্ণিত দন্ড শুধুমাত্র অবিবাহিত স্বাধীন নর-নারীর জন্য নির্দিষ্ট নয়। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম আহমদ, দাউদ জাহেরী এবং ইসহাক বিন রাহওয়ায়ও প্রথমে একশো বেত্রাঘাত এবং তারপরে পাথর মেরে হত্যার দন্ড স্থির করেছেন। (৩৩৭ পৃ.) এই যুক্তি যদি সঠিক হয়, তাহলে একশো বেত্রাঘাতের দন্ড যে বিবাহিত স্বাধীন নর-নারীর বেলায়ও প্রযোজ্য, তার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে। তাহলে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যার দন্ড কেন দেয়া হয়?

জবাবঃ সূরা আনয়াম ছাড়া ঐ চারটে জিনিসের হারাম হওয়ার কথা সূরা মায়েদা, সূরা নাহল এবং সূরা বাকারাতেও বলা হয়েছে। কিন্তু ঐ তিন জায়গার কোথাও বলা হয়নি যে, এই চারটে জিনিস ছাড়া আর কোনো জিনিস হারাম নয়। শুধুমাত্র সূরা আনয়ামে বলা হয়েছে যে, ওহীর মাধ্যমে যেসব জিনিসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রসূল সা.-এর কাছে নির্দেশ এসেছে, তাতে এই চারটে জিনিস ছাড়া আর কোনো জিনিসের উল্লেখ নাই। এ জন্যই আমি বলেছিলাম যে, সূরা আনয়ামের এ আয়াতটিকে তার পূর্বাপর বক্তব্যের আলোকে বিবেচনা করুন। পূর্বাপর বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে, জাহেলিয়াত যুগে আরবরা যেসব জিনিসকে হারাম করে রেখেছিলো সেগুলো যে আসলে হারাম নয়, বরং হারাম এ চারটে জিনিস, একথা বলাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য।

সূরা নিসার যে আয়াতের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম তার ভাষার প্রতি আপনি পুনরায় লক্ষ্য করুন। তাতে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি মুমিন স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখেনা, সে যেন তোমাদের মুমিন দাসীদের মধ্য থেকে কাউকে বিয়ে করে।' অতঃপর এই আয়াতেই বলা হয়েছে, 'এই সব দাসী যখন তোমাদের কারোর স্ত্রী হয়ে সুরক্ষিত হয়ে যাবে এবং তারপর ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তখন তাদেরকে স্বাধীন নারীদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক দিতে হবে।' এ আয়াতে মুহ্সানাত' শব্দটা দুজায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। এটা যে উভয় জায়গায় একই অর্থে গৃহীত হতে পারে তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। আপনি কি মনে করেন যে, আয়াতের প্রথমাংশে 'মুহসানাত' অর্থ বিবাহিতা স্ত্রীলোক? অর্থাৎ এর অর্থ কি এই

যে, যে ব্যক্তি বিবাহিত মুমিন নারীদেরকে বিয়ে করতে সমর্থ নয়, সে মুমিন দাসীকে বিয়ে করুক? সে অর্থ যখন হতেই পারেনা তখন নির্দ্বিধায় বলা যায়, এ অংশে 'মুহসানাত' শব্দের অর্থ স্বাধীন পরিবারের অবিবাহিত নারীই হতে পারে। আর এধরনের স্ত্রীদের মোকাবেলায় মুমিন দাসীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তখন এর তাৎপর্য এটাই হতে পারে যে, যে অর্থে স্বাধীন পরিবারের অবিবাহিতা নারী 'মুহসানা' (সংরক্ষিত) হয়, সে অর্থে অবিবাহিত দাসী 'মুহসানা' হয়না। এরপর বলা হয়েছে যে, বিবাহিত হওয়ার পর যখন একজন পরাধীন রমনী 'মুহসানা' (সংরক্ষিত) হয়ে যায় এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তাকে 'মুহসানা' নারীদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির অর্ধেক দেয়া হবে। এই দ্বিতীয় অংশে 'মুহসানা' নারীর শাস্তি দ্বারা স্বাধীন পরিবারের অবিবাহিতা নারীর জন্য নির্ধারিত শাস্তিই বুঝানো হয়েছে। এখানে আপনি বিবাহিতা স্বাধীন নারী অর্থে নিতে পারেননা। কেননা একই আয়াতে একই শব্দকে দুই ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা কোনো মতেই শুদ্ধ হতে পারেনা। এরপর প্রশ্ন থেকে যায় আলী রা.-এর কথা ও কাজ দ্বারা আপনি যে যুক্তি প্রদর্শন করছেন সে সম্পর্কে। এব্যাপারে আপনার জ্ঞাতব্য হলো, এক্ষেত্রে আলী রা.-এর মত ছিলো সকল সাহাবি থেকে ভিন্ন। খোদ রসূল সা. কখনো বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করার আগে বেত্রদন্ড কার্যকর করেননি। অন্য তিন খলিফার আমলেও কখনো পাথর মেরে হত্যা করার আগে বেত্রদন্ড দেয়ার ঘটনা ঘটেনি। এ মতের সমর্থনে অন্য কোনো সাহাবির বক্তব্যও আমি পাইনি। ফেকাহবিদদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশও আলী রা.-এর এই ইজতিহাদী রায়কে মেনে নেননি। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি:১৯৭১)

০৬. গুনাহগার মুসলমান ও নেককার কাফেরের পার্থক্য।

প্রশ্ন: উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞানের) স্তরের জনৈকা খ্রিস্টান ছাত্রী ইদানিং আমার কাছে ইংরেজি পড়তে আসে। সে খুবই মেধাবী। সে প্রায় প্রতিদিনই আমার সাথে ধর্মীয় বিষয়ে মত বিনিময় করে। আমিও এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাকে ইসলামের বিধিমালার সাথে পরিচিত করে তোলার চেষ্টা চালাই। আল্লাহর শোকর যে, আমি ইসলাম সম্পর্কে তার অনেক ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করেছি।

কিন্তু একদিন সে আমার কাছে এমন একটা প্রশ্ন তুললো, যার জবাব আমার মাথায় আসেনি। পরে আমি আপনার বই পুস্তকও ঘাটাঘাটি করেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি তা থেকেও কোনো সন্তোষজনক জবাব খুঁজে পাইনি।

আমার খ্রিষ্টান ছাত্রীটি বললো, আমি মেট্রিকে ইসলামিয়াতের পাঠ্যপুস্তকে একটা হাদিস পড়েছিলাম। তাতে বলা হয়েছে, মুসলমান যতো বড় গুনাহগারই হোক, কিছুকাল দোযখে আপন গুনাহর শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে অবশ্যই বেহেস্তে যাবে। কিন্তু কাফের চিরদিনের জন্য দোযখে বাস করবে। তারপর সে বললো, আপনারা তো আমাদেরকেও কাফেরই মনে করেন। কোনো খৃষ্টান, তা সে যতো নেককারই হোক না কেন, মুসলমানদের আকিদা অনুসারে দোযখেই যাবে। এর কারণ কি?

জবাব: আপনি আপনার ছাত্রীকে প্রথমে বুঝান যে, গুনাহগার মুমিন ও নেককার কাফেরের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি কি? একজন মুমিন আল্লাহর আনুগত্যকে গ্রহণ করে

নিয়ে তার অনুগত বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তারপর নিজের চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে সে কোনো এক বা একাধিক পাপ কাজ করে বসে। পক্ষান্তরে একজন কাফের মূলত খোদাদ্রোহী হয়ে থাকে। আপনার কথা মোতাবেক সে যদি সৎ কর্মশীল হয়েও থাকে, তাহলে তার অর্থ শুধু এতোটুকু যে, সে খোদাদ্রোহিতার সাথে আর কোনো অপরাধযুক্ত করেনি। এখন একথা সহজেই বোধগম্য যে, যে ব্যক্তি বিদ্রোহী নয়, কেবল অপরাধী, তাকে শুধু অপরাধের শাস্তিই দেয়া হবে, বিদ্রোহের শাস্তি তাকে দেয়া চলেনা। কেননা অপরাধ করার কারণে কেউ অনুগত প্রজার দল থেকে বহিষ্কৃত হয়না।

কিন্তু বিদ্রোহ এমনিতেই জঘন্যতম অপরাধ। তার সাথে যদি কেউ অন্য কোনো অপরাধ যুক্ত নাও করে, তথাপি তাকে অনুগত প্রজার সমান মর্যাদা দেয়া হয় না। বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোনো অপরাধ না করলেও তাকে বিদ্রোহের সাজা পেতেই হবে। তবে সে যদি বিদ্রোহী হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য অপরাধও করে, তাহলে তাকে বিদ্রোহের শাস্তির পাশাপাশি অন্যান্য অপরাধের শাস্তিও দেয়া হবে।

এই মৌলিক তত্ত্বটা বুঝে নেয়ার পর তাকে বলুন, আল্লাহর অনুগত ও বিশ্বস্ত বান্দাহদের মধ্যে কেবল তারাই শামিল হয়, যারা আল্লাহর একত্ববাদকে কোনো ধরনের শেরকের মিশ্রণ ছাড়াই, আল্লাহর সকল নবীকে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই এবং আল্লাহর সকল কিতাবকে নির্বিবাদে মেনে নেয় আর আখেরাতের জবাবদিহির কথাও স্বীকার করে। এ কটি জিনিসের মধ্যে যে কোনো একটিকে যে অস্বীকার করবে সে বিদ্রোহী বলে বিবেচিত হবে এবং তাকে আল্লাহর বিশ্বস্ত বান্দাহ হিসেবে কখনো বিবেচনা করা হবেনা। এবার উদাহরণ স্বরূপ রসূল ও কিতাবের কথাই ধরুন।

ইহুদিরা যখন ঈসা আ. কে এবং ইঞ্জিলকে মানলোনা, তখন তারা সবাই খোদাদ্রোহীতে পরিণত হলো। যদিও ঈসা আ.-এর পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাদের আনীত কিতাবসমূহকে তারা মানতো। অনুরূপভাবে ঈসার অনুসারীরা মুহাম্মদ সা.-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর অনুগত বান্দাহ ছিলো। কিন্তু যখন তারা মুহাম্মদ সা.-কে ও কুরআনকে মানতে অস্বীকার করলো, তখন তারাও খোদাদ্রোহীতে পরিণত হলো। ঈসা আ.-কে, ইঞ্জিলকে, এবং পূর্বতন নবীগণ ও তাদের কিতাবসমূহকে মেনে নেয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহর অনুগত বান্দা রূপে গণ্য হতে পারেনা।

আপনার ছাত্রীটি যখন এ কথাও বুঝে নেবে তখন তাকে বলুন যে, আল্লাহ বিদ্রোহীদের জন্য বেহেশত তৈরি করেননি। বরং স্বীয় অনুগত ও বিশ্বস্ত বান্দাহদের জন্য তৈরি করেছেন। এই বিশ্বস্ত বান্দাহদের মধ্যে থেকে কেউ যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে, তাহলে তাকে তার অপরাধ অনুপাতে শাস্তি দেয়া হবে। শাস্তি ভোগ করা সমাপ্ত হলে তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি বিদ্রোহের দায়ে দোষী হবে, সে কোনোক্রমেই বেহেশতে যেতে পারবেনা। তার ঠিকানা অবশ্যই দোযখে। আর কোনো অপরাধ যদি সে নাও করে তবুও বিদ্রোহটাই এতো বড় অপরাধ যে, তার বিদ্যমানতায় আর কোনো নেক কাজই তাকে বেহেশতে পৌছাতে সক্ষম নয়। **(তরজমানুল কুরআন, আগষ্ট: ১৯৭৫)**

০৭. সত্য সন্ধানের সঠিক পন্থা

প্রশ্ন: কেউ যদি সত্য সন্ধান করতে থাকে এবং এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে, কিন্তু দীর্ঘ সময় চেষ্টা সাধনা করেও সত্যের সন্ধান না পায় তবে কি সে নিরাশ হয়ে যাবেনা? যেমন এক ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে চরম অন্ধকার পথে যাত্রা শুরু করেছে যে, কোথাও আলোর মশাল পেয়ে যাবে, কিন্তু দীর্ঘ পথ চলার পরেও যদি আলোর সন্ধান না পায় তবে তো বেচারা হতাশ হয়ে বসে পড়বে, এবং মনে করবে আলোর ধারণাই মিথ্যা। যদি কিছু থেকেই থাকে, তবে তা কেবল ঘনো অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা, আপনি কি মনে করছেন, আমি এ এক কাল্পনিক উদাহরণ পেশ করছি? কিন্তু ব্যাপার তা নয়, আমি মানব জীবনের বাস্তব উদাহরণ পেশ করছি। দুজন লোক আছে যারা বুঝে শুনে এবং প্রথাগতভাবে মুসলমান। প্রথম প্রথম তারা দুজন দুটি দুর্গে আবদ্ধ হয়, এর প্রতিটি দুর্গই মানব জীবনের জন্যে বিপদ মুসীবত, দুঃখ-কষ্ট এবং ব্যর্থতার দুর্গ। তাদের একজন প্রথম দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে এবং মনে করে এখন তার জন্যে একটি মাত্র দুর্গই অবশিষ্ট আছে যা থেকে বেরিয়ে এসে সে মুক্ত হয়ে যাবে। এভাবে তার সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি পায়।

অতঃপর যখন দ্বিতীয় দুর্গটি থেকেও বেরিয়ে আসে তখন সে মুক্ত হয়ে যায়। এ অভিজ্ঞতা তাকে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত করে দেয় এবং সে এমন এক সত্তাকে স্বীকার করে, যে বিপদগ্রস্তের ফরিয়াদ শুনে এবং সাহায্য করে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম দুর্গ থেকে বের হয়ে এলে দ্বিতীয় দুর্গ তার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় দুর্গ থেকে বের হয়ে এলে তৃতীয় দুর্গ তাকে পরিবেষ্টীত করে ফেলে।

এমনি করে একটির পর একটি দুর্গ তার সামনে বাধার লৌহ প্রাচীর সৃষ্টি করে। অনবরত এই বাধার চক্র তার মধ্যে নির্ঘাত নিরাশার সৃষ্টি করে দেয়। তখন সে এ ধরনের কোনো সত্তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়, যিনি বিপদ মুসীবতে সাহায্য করতে পারেন। কারণ বেচারা বার বার 'মাতা নাসরুল্লাহ' (কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে) বলে ফরিয়াদ করছে। অথচ একবারও তাকে 'আলা ইন্না নাসরাল্লাহি কারীব' '(হ্যাঁ আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী হয়েছে) এর আওয়াজ শুনানো হচ্ছেনা।

এজন্যে সে নিরাশ হয়ে গেছে। কারণ তার অসংখ্য বাসনার একটিও পুরণ হয়নি এবং অসংখ্য দুঃখ কষ্টের একটিও বিদূরিত হয়নি। অন্তত একটি বাসনাও যদি পূর্ণ হতো কিংবা একটি দুঃখও যদি দূর হতো, তবু দুয়া শ্রবণকারী এবং প্রয়োজন পূরণকারী কোনো উচ্চতর সত্তা যে আছেন, সে বিষয়ে সে পুরোপুরি নিরাশ হতোনা।

জবাব: আপনি আপনার প্রশ্নের শুরুতে যে কথাটি লিখেছেন তার জবাব হচ্ছে: সত্যের সন্ধ্যান করাটা এমন একটি মৌলিক সৌন্দর্যের কাজ যা সত্য লাভের জন্যে এক নম্বর শর্তের মর্যাদা রাখে। কিন্তু এর সাথে সাথে সত্য সন্ধানে নিষ্ঠাবান হওয়া, নিস্বার্থপর হওয়া এবং বুদ্ধিমত্তাও জরুরি। অর্থাৎ এই সত্য সন্ধানের কাজে ব্যক্তিকে অবশ্যি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে এবং যা কিছু বাতিল বলে সে

উপলব্ধি করবে, তা পরিত্যাগ করে কেবল সত্যকেই গ্রহণ করবে। এরূপ অবস্থায় ব্যক্তি ঘোর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখবেন না, এমনটি আশা করা যায়না।

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে আপনি যে উদাহরণ পেশ করেছেন তা থেকে বুঝা যায় যে, আপনি সত্য সন্ধান সত্য লাভের উদ্দেশ্যে করেননি বরঞ্চ বিপদ-মুসিবত দুঃখ-কষ্ট এবং ব্যর্থতার দুর্গ থেকে বের হয়ে আসার উদ্দেশ্যে তা করেছেন। এবং এ উদ্দেশ্যে করেছেন যেন আপনাকে 'মাতা নাসরুল্লাহর' জবাবে 'আলা ইন্না নাসরাল্লাহি কারীব' এর আওয়াজ শুনিয়ে দেয়া হয় এবং এই জবাব দানকারী সত্তা যেন আপনার বিপদ-মুসীবত, দুঃখ-কষ্ট এবং ব্যর্থতাসমূহ দূর করে দেয়।

আমার মতে সত্য সন্ধানের এই সূচনাবিন্দুই (Starting Point) সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত, যার ফলে আপনি হতাশায় ভুগছেন। সত্য সন্ধানের যে সঠিক পন্থা আপনাকে অবলম্বন করতে হবে তা হচ্ছে, সর্বপ্রথম অধ্যয়ন ও চিন্তা গবেষণা করে আপনাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে যেঃ ১. এই বিশ্বব্যবস্থা কি খোদাহীন? ২. নাকি অসংখ্য সার্বভৌম খোদা তা সৃষ্টি করেছেন এবং তারা সবাই মিলে এর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করছেন? ৩. নাকি এই বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, মালিক, সার্বভৌম কর্তা এবং পরিচালক মাত্র একজনই।

অতঃপর আপনি এই বিশ্ব জাহানকে বুঝার চেষ্টা করুন এবং এ কথাটি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখুন যে, ১. এই বিশ্বজাহান কি শাস্তির দুর্গ? ২. নাকি আরামের উদ্যান? ৩. কিংবা পরীক্ষাগার, যেখানে আরাম আয়েশ, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসীবত ব্যর্থতা ও সফলতা সবকিছুই পরীক্ষার উপকরণ?

অতঃপর আপনি এ পৃথিবীতে মানুষের সঠিক মর্যাদা অনুধাবন করার চেষ্টা করুন যে, ১. সে কি এখানে পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম এবং তার উপর উর্ধ্বতন কোনো শক্তির প্রভাব নেই এবং কোনো উর্ধ্বতন সত্তার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবেনা? ২. নাকি, আসমান জমিনের অসংখ্য খোদা তার ভাগ্যের মালিক? ৩. কিংবা, একজনই মাত্র খোদা তার এবং সমগ্র বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, হুকুমকর্তা এবং সার্বভৌম শক্তির অধিকারী? যিনি আমাদের আরোপিত কোনো প্রকার শর্তের অধীন নন, আমাদের সামনে তাকে জবাবদিহি করতে হবেনা। বরঞ্চ তার সামনেই আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে এবং তিনি এই পৃথিবীতে ভালমন্দ অবস্থা দিয়ে আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন যে, পরীক্ষার ফল এ পৃথিবীতে নয় বরঞ্চ আখিরাতে প্রকাশিত হবে?

এই তিনটি প্রশ্নের জবাব যদি আপনার বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রথম এবং দ্বিতীয় ধরনের হয়, তবে আপনাকে হতাশার ঘন অন্ধকার থেকে বের করে আশার আলো দেখানোর কোনো ব্যবস্থা আমার সাধ্যের বাইরে। অবশ্য আপনার বিশ্লেষণে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব যদি তৃতীয় ধরনের হয়, তবে এই জবাবটাই আপনার হৃদয়কে প্রশান্তির মঞ্জিলে পৌঁছে দিতে পারে। এজন্য শর্ত হচ্ছে, আপনাকে অবশ্যি ভালভাবে চিন্তা গবেষণা করে এর Logical Implications ভালভাবে বুঝে নিতে হবে।

যেহেতু এক লা শরীক আল্লাহই সমগ্র বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাপক ও পরিচালক তাই এর অসংখ্য অধিবাসীর কোনো একজনের পক্ষে এমনটি চাওয়া সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, খোদার সমগ্র খোদায়ী কেবল তাঁর কল্যাণে কাজ করবে।

আর যেহেতু এ পৃথিবী পরীক্ষাগার, তাই এখানে মানুষের জীবনে সংঘটিত সমস্ত আনন্দ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ এবং ব্যর্থতা সফলতা মূলত মানুষের জন্যে পরীক্ষার উপকরণ। যে ব্যক্তি এ কথাটুকু বুঝে নিতে পারেন তিনি কোনো ভাল অবস্থায় আনন্দে ফেটে পড়তে পারেননা, আবার কোনো দুরাবস্থায়, হতাশায় ভেংগে পড়তে পারেননা। বরঞ্চ প্রতিটি অবস্থায় তিনি আল্লাহর দেয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে চেষ্টা সাধনা করে যাবেন। জগতের ব্যবস্থাপনার এই মূলতত্ত্ব অবগত হবার পর মানুষ এ ধরনের ভ্রান্ত ইচ্ছা পোষণই করবে না যে, এই জীবনে সে অনাবিল সুখ, সীমাহীন আনন্দ, অফুরন্ত আরাম এবং স্থায়ী সাফল্য লাভ করবে আর বিপদ-মুসীবত, দুঃখ-কষ্ট এবং কোনো প্রকার ব্যর্থতা তাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করবেনা। কারণ এ দুনিয়া তো আরামের বেহেশতও নয় এবং আযাবের জাহান্নামও নয় যে, এখানে শুধুমাত্র আনন্দ, আরাম, সফলতা কিংবা শুধুমাত্র দুঃখ, কষ্ট ও ব্যর্থতা পাওয়া যেতে পারে।

এমনিভাবে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনি যখন তৃতীয় প্রশ্নের এই জবাব পাবেন যে, এক ও একক আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা ও সার্বভৌম কর্তা আর আমরা তাঁরই সৃষ্টি ও হুকুমের অধীন, তিনি নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী আর আমরা তাঁর দাস হয়ে তাঁকে আমাদের আরোপিত শর্তের অধীন করতে পারিনা। তিনি আমাদের সম্মুখে নয় বরং আমাদেরকেই তাঁর সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে, তখন আপনার মন কখনো তাঁর কাছ থেকে এরূপ ভ্রান্ত আশা পোষণ করবেনা যে, আমরা নিজেরা যে অবস্থায় থাকতে চাই তিনি আমাদেরকে সে অবস্থায়ই থাকতে দেবেন। আমরা তাঁর কাছে যা কিছুই চাইব তিনি অবশ্যি আমাদের সে দাবি পূরণ করে দেবেন এবং আমাদের উপর যখনই কোনো দুঃখ কষ্ট এবং বিপদ মুসীবত এসে যাবে তখন আমাদের দাবি অনুযায়ী সাথে সাথে তিনি তা দূর করে দেবেন।

মোটকথা, বিশুদ্ধ মারিফাতের সার কথা হচ্ছে, 'এতমীনান' (আশা, আশ্বস্তি, সান্ত্বনা ও প্রশান্তি), যা ভাল কিংবা মন্দ সর্বাবস্থায় একই অবস্থার উপর অটল অবিচল থাকে। পক্ষান্তরে মারিফাতবিহীন অবস্থার পরিণতি সর্বাবস্থায়ই অস্বস্তি, অশান্তি এবং নিরাশা হয়ে থাকে। সাময়িক সফলতার কারণে মানুষ ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত হয়ে যতোই আনন্দে আত্মহারা হোক না কেন তাতে কিছুই যায় আসেনা। আপনি যদি হতাশা ও নিরাশা থেকে মুক্ত হতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যি প্রকৃত সত্য লাভের জন্য চিন্তা ফিকির করতে হবে। অন্যায় কোনো কিছুই আপনাকে ঘনঘোর অন্ধকার থেকে বের করে আনতে পারবেনা। (তরজমানুল কুরআন, আগস্ট: ১৯৭৫)

০৮. সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি কিনা?

প্রশ্ন: আপনার তাত্ত্বিক রচনাসমূহ থেকে অন্য অনেক বিষয়ের মতো সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি কিনা, সে বিষয়েও একটা নতুন বিতর্কের সূত্রপাত

ঘটেছে। এই বিতর্কের নিগূঢ় রহস্য আমি কিছু বুঝে উঠতে পারিনা। এজন্য আমি ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে আছি। উভয় পক্ষের বইপুস্তক পড়ে যে তথ্য জানা যায়, তাতে মতভেদের কোনো বাস্তব ফল কোথাও দেখিনা। আপনিও সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহর অনুগৃহীত ও ক্ষমাপ্রাপ্ত মনে করেন, আবার অন্যেরাও তাঁদেরকে নিষ্পাপ মনে করেননা। সাহাবাদের সর্বসম্মত রায় এবং সামগ্রিক কর্মকাণ্ডকে আপনি যেমন অন্য সকলের মতোই আইনের উৎস ও দলিল বলে মনে করেন, তেমিন অন্যরাও আপনার মতো প্রত্যেক সাহাবির প্রতিটি কার্যকলাপকে শর্তহীনভাবে অনুসরণ যোগ্য ও সত্যের মাপকাঠি মনে করেননা। উভয়পক্ষ এ ব্যাপারেও একমত যে, প্রত্যেক সাহাবির সামগ্রিক জীবনে ভালোর দিকটাই প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। কেবল একটি বিষয়কে বিতর্কের ভিত্তিরূপে দাঁড় করানো হয়। সেটি হলো, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ঐতিহাসিক গবেষণা চালিয়ে আপনি যেসব ভুল বা নির্ভুল ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন, আমার নগণ্য মতে এই সব খুঁটিনাটি ঘটনাবলি সংঘটিত হয়ে থাকুক বা না হয়ে থাকুক, তাতে একটা বিশেষ পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরামের সত্যের মাপকাঠি হওয়া বা না হওয়ার উপর তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করেনা। এজন্য এই কণ্টকাকীর্ণ দীর্ঘ বিতর্ককে পাশ কাটিয়ে আমি শুধু এই আবেদন জানাতে চাই যে, আপনিও এই ঘটনাবলীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে নির্ভেজাল তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সম্পূর্ণ মুক্ত মনে ব্যাখ্যা করুন যে, সেই সত্যের মাপকাঠির তাৎপর্য কি, যা আপনি অস্বীকার করেন। আমি এ ব্যাপারে পড়াশুনা করে যা বুঝতে পেরেছি তা আপনার কাছে তুলে ধরছি। এর সাথে আপনি একমত হলে ভালো কথা, নচেত তাত্ত্বিকভাবে তার ভুল ধরিয়ে দিন।

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কুরআন ও সুন্নাহতে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তার জন্য তো বাড়তি কোনো মাপকাঠির দরকারই নেই, বরঞ্চ এগুলোই অন্যান্য জিনিসের শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয়ের জন্য মাপকাঠি। যেমন সাহাবায়ে কেরামের পদস্খলনের ঘটনাবলী, যার বিশদ বিবরণ দিয়ে লাভ নেই। তবে আগামীতে সংঘটিতব্য যেসব সমস্যার পক্ষে বা বিপক্ষে কুরআন ও হাদিসে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই, সেইসব খুঁটিনাটি ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কাজকে আইন রচনার ক্ষেত্রে উৎস ও দলিলরূপে গ্রহণ করা উচিত। কেননা স্বয়ং রসূল সা.-এর সাহচর্যের প্রভাবে তাদের মনমগজ আমাদের তুলনায় সত্যের অধিকতর কাছাকাছি। সাহাবায়ে কেরামের এক সাহচর্যের মর্যাদা ছাড়াও নবুয়তের সাথে অত্যন্ত শক্তিশালী ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকার কারণে ধর্মীয় ও বৈষয়িক সমস্যাবলীতে তাদের এক ধরনের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হওয়াকেই সত্যের মাপকাঠি হওয়া বলা হয়। যে ব্যক্তি সাহাবি নয়, তার জন্য স্বীয় কথা ও কাজের বিশুদ্ধতার পক্ষে কুরআন ও হাদিস থেকে প্রমাণ হাজির করা অথবা নিদেন পক্ষে কোনো সাহাবিকে নিজের সমর্থনে পেশ করা অপরিহার্য। কিন্তু কোনো সাহাবির কথা ও কাজের বিরুদ্ধে যতোক্ষণ কুরআন ও সুন্নাহর কোনো স্পষ্টোক্তির বরাতে শক্তিশালী প্রমাণ পেশ না করা যাবে, ততোক্ষণ সেটা যে একজন সাহাবির উক্তি বা কাজ বলে প্রমাণিত, এটাই তার বিশুদ্ধতার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। বাড়তি আর কোনো প্রমাণের

প্রয়োজন নেই। নবী সা.-এর ঘনিষ্ঠতম সাহচর্যের কারণে এতোখানি বিশ্বস্ততার মান তাদের রয়েছে। এক কথায় বলা যায়, রসূল সা.-এর নৈকট্যের কারণে তারা যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী, তার সুবাদে আমি মনে করি, তাদেরকে নিষ্পাপ মনে না করেও কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের মাথায় যে ব্যাখ্যাই আসে, তার শুদ্ধাশুদ্ধ নিরূপণের জন্য সাহাবায়ে কেরামের কাছে ধর্ণা দেয়া আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয় যতোদুর সম্ভব, ইসলামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তাদের দ্বিমত পোষণ করাও ঠিক নয়। আপনি যদি আপনার এ বক্তব্যে আর কিছু যোগ করতে চান তবে যুক্তিপ্রমাণ সহকারে লিখে দেবেন।

জবাবঃ আপনার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব হলো, আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ ছাড়া আর কিছুই সত্যের মাপকাঠি নয়। সাহাবাগণ সত্যের মাপকাঠি নন বরং সেই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ। এর উদাহরণ হলো, কষ্টিপাথর সোনা নয়, তবে সোনা সোনা কিনা তা কষ্টিপাথর যাচাই করেই বুঝা যায়।

আপনিও জানেন যে, সাহাবাদের সর্বসম্মত অভিমতকে আমি আইনের উৎস বলে মানি। শুধু তাই নয়, আমি তাঁদের সংখ্যাগুরুর মতকেও অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। অবশ্য সাহাবাদের ব্যক্তিগত অভিমতের দুটো অবস্থা হতে পারে। একটি হলো, তাদের অভিমত পরস্পর থেকে ভিন্ন হবে। এমতাবস্থায় সকলের অভিমতকে একই সময় গ্রহণ করা সম্ভব নয়। শরিয়তসম্মত যুক্তিপ্রমাণের ভিতরে কোনো একটি অভিমতকে অন্য কোনো অভিমতের উপর অগ্রাধিকার না দিয়ে গত্যন্তর থাকেনা। আবার সকলের অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করে কোনো নতুন মত অবলম্বন করাও চলেনা। দ্বিতীয় অবস্থা হলো, কোনো এক বা একাধিক সাহাবির পক্ষ থেকে একটিমাত্র অভিমতই পাওয়া যায় এবং তার বিপক্ষে কোনো অভিমতই পাওয়া যায়না। এমতাবস্থায় সঠিক পন্থা হলো, ঐ অভিমতকেই গ্রহণ করা উচিত এবং তা প্রত্যাখ্যান করে অন্য কোনো অভিমত মেনে নেয়া উচিত নয়। অবশ্য শীর্ষস্থানীয় তাবেঈন এবং সর্বজনমান্য মুজতাহিদ ইমামগণ যদি যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে তার বিরোধিতা করেন এবং সেসব যুক্তিপ্রমাণ সত্যের নিকটতম বলে মনে হয়, তবে ভিন্ন কথা। (তরজমানুল কুরআন, আগস্টঃ ১৯৭৬)

০৯. রসূল সা.-এর মানবসুলভ স্বভাব নিয়ে প্রশ্ন।

প্রশ্নঃ এপ্রিল মাসের তরজমানুল কুরআনে প্রকাশিত আপনার ইসলাম কোন্ আদর্শের পতাকাবাহী? শীর্ষক নিবন্ধের কিছু কিছু বক্তব্যের উপর নিম্নরূপ আপত্তি তোলা হয়।

১. 'নবী অতিমানব নন' একথা দ্বারা আপনি কি বুঝিয়েছেন? 'অতিমানব' অর্থ কি খোদাসুলভ ক্ষমতার অধিকারী সত্তা? না, শুধু মানবসুলভ স্বভাবের উর্ধ্বের সত্তা? আপত্তি উত্থাপনকারীরা এই তত্ত্ব বের করেছেন যে, 'অতিমানব' অর্থ অসাধারণ মানুষ। আর নবীরা অসাধারণ মানুষই হয়ে থাকেন।

২. আর একটি আপত্তি হলো, আপনি নিবন্ধে নবীকে মানবসুলভ দুর্বলতা থেকে মুক্ত বলে স্বীকার করেননি। অথচ নবী সর্বতোভাবে নিস্পাপ হয়ে থাকেন। মানবসুলভ দুর্বলতা বলতে আপনি কি মানবীয় বৈশিষ্ট্য বুঝিয়েছেন না অন্য কিছু?

৩. আপনি বলেছেন, 'কোনো কোনো নবীর আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেছে।' আপনার এই বাচনভঙ্গি নাকি নবীদের মর্যাদার পক্ষে অশোভন। আপত্তিকারীরা সর্বাত্মক জোর দিয়ে বলেন, নিয়ত ভালো হলেও বর্ণভঙ্গি বেআদবীপূর্ণ।

জবাব: এ আপত্তিগুলোর জবাব দেয়ার আগে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে, এই নিবন্ধটা মূলত অমুসলিমদের সামনে ইসলামকে পেশ করার জন্য লেখা হয়েছিল। এতে তাদের ভ্রান্ত ধ্যান ধারণার উল্লেখ না করেই তা খন্ডনের এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। সেটি হলো, ইসলামের সঠিক রূপরেখা তাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে যা দেখে তারা নিজেরাই বুঝতে পারে যে, তাদের ধর্মে কি কি ভুল তত্ত্ব ঢুকে গেছে। এখন এক এক করে আপত্তিগুলোর জবাব নিন।

১. 'নবী অতিমানব নন' এ উক্তির কোনো অর্থ গ্রহণের আগে আমি কি কি বক্তব্য পরম্পরায় একথা বলেছি, তা আপত্তিকারীদের লক্ষ্য করা উচিত। বক্তব্যের ধারাটা এভাবে চলে আসছে যে, 'রসূল একজন মানুষ এবং খোদাসুলভ ক্ষমতা ও গুণাবলীতে তার আদৌ কোনো অংশীদারিত্ব নেই।' এই বক্তব্যের অব্যবহিত পর 'তিনি অতিমানব নন' কথাটা বলার সুস্পষ্ট তাৎপর্য হলো, তিনি মানবত্বের উর্ধ্বের এবং খোদাসুলভ গুণাবলীর অধিকারী কোনো ব্যক্তি নন, যেমনটি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের ধর্মপ্রচারকদেরকে চিত্রিত করেছে।

২. একই ধারাবাহিক আলোচনায় উপরোক্ত কথার অব্যবহিত পর বলা হয়েছে, 'রসূল মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নন।' এখানে মানবীয় দুর্বলতা অর্থ ক্ষুধা, পিপাসা, ঘুম. রোগ-ব্যাধি, মানসিক উদ্বেগ ও বেদনা ইত্যাদি, যা মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। এ নিবন্ধে এ কথাটা বলার উদ্দেশ্য হলো, খ্রিষ্টানরা যে ব্যক্তিকে খোদা বা খোদার পুত্র বলে আখ্যায়িত করেছে, তিনিও এইসব মানবীয় দুর্বলতার শিকার হতেন। অথচ সেসব দেখেও তারা মানুষকে আল্লাহর অংশীদার বানিয়ে ফেলেছে। এ যুক্তিতর্ক অবিকল কুরআন থেকে গৃহীত।

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ •

'মরিয়মের পুত্র মসিহ রসূল ছাড়া আর কিছু নয়। তার আগেও বহু রসূল অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর মা ছিলো সত্যনিষ্ঠ। উভয়েই খাওয়া দাওয়া করতো।'

এ আয়াতে জনৈকা মায়ের পেট থেকে জন্ম গ্রহণ এবং মা ও ছেলে উভয়ের খাওয়া দাওয়া করাকে ঈসার মানবত্বের অকাট্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মসিহ মানুষ ছিলেন, মানুষের উর্ধ্বের কেউ নন এবং খোদার খোদায়ীতে তাঁর আদৌ কোনো অংশীদারী ছিলনা, যেমনটি খ্রিষ্টানরা মনে করে নিয়েছে।

৩. তৃতীয় আপত্তিটাও বক্তব্যের পটভূমি ও ধারাবাহিকতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কেবল একটা শব্দের ব্যবহারকে উপলক্ষ করে তোলা হয়েছে। প্রসঙ্গটা ছিলো, ঈমান আনয়নকারীদেরকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রশিক্ষণ দিয়ে একটা বিশুদ্ধ ইসলামি সমাজ ও সভ্যতার উপযোগী করে সক্রিয়ভাবে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে সংগঠিত করে আল্লাহর দীনকে কার্যত প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে আল্লাহর আদর্শকে বিজয়ী ও অন্য সকল আদর্শকে পরাজিত করাই নবীর কাজ। এরপর যে কথাটি লেখা হয়েছে তা হলো, 'প্রত্যেক নবী স্বীয় আন্দোলনকে সাফল্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারবেন এমন কোনো কথা নেই। এমন অনেক নবী ছিলেন, যারা নিজেদের কোনো ত্রুটির কারণে নয় বরং একগুঁয়ে লোকদের সক্রিয় বিরোধিতা এবং পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতিকুলতার কারণে ব্যর্থ হয়েছেন।

উপরোক্ত উক্তিকে 'ব্যর্থ' শব্দটা ব্যবহার করাকে বেয়াদবী বলা কোন্ ধরনের আদব, ও কোন্ প্রকারের ভক্তি, তা আমার বুঝে আসেনা। আদব ও ভক্তির এইসব বাড়াবাড়ি যদি এহেন দাপটের সাথে চলতে থাকে তাহলে বিচিত্র নয় যে, ভবিষ্যতে 'রসূল সা. ওহুদ যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন, 'কিংবা তিনি কোনো এক সময়ে রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন' এমন কথা কেউ বললেই তাকে বেয়াদব আখ্যায়িত করা হবে। একটা বাস্তব ঘটনাকে যদি বাস্তব বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে সর্বজনবিদিত ভাষায় তা ব্যক্ত করা হবে, এটাই স্বাভাবিক। এ কাজকে যারা বেয়াদবী মনে করেন, তারা অবাধে তা মনে করতে পারেন। কিন্তু অন্যদেরকেও অনুরূপ মত পোষণ করতে বাধ্য করবেন কোন্ কারণে? (তরজমানুল কুরআন, জুন: ১৯৭৬)

১০. নবীদের মানবীয় দুর্বলতা দ্বারা স্বভাবগত প্রয়োজন বুঝায়।

প্রশ্ন: লন্ডনের ইসলামি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে আপনি রসূল সা. সম্পর্কে বলেছিলেন: 'তিনি মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নন। জনৈক আলেম আপনার এই উক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই বলে যে, এর অর্থ খুঁত ও নৈতিক দোষত্রুটি। এ ব্যাখ্যার উপর তিনি জিদ ধরে বসেছেন। এ উক্তি দ্বারা আসলে আপনি নিজে কি বুঝিয়েছেন, দয়া করে বিশ্লেষণ করবেন কি?

জবাব: যদিও জুন মাসের তরজমানুল কুরআনে আমি এ কথা দ্বারা কি বুঝিয়েছি তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু তারপরও এই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। এর অর্থ দাঁড়ালো, বক্তা যখন তার বক্তব্যের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে দেবে, তখনও অভিযোগকারী বলতে থাকবে যে, তোমার বক্তব্যের আসল অর্থ তুমি যা বলছ তা নয় বরং আমরা যা বলছি তাই। এ একটা আশ্চর্য ধরনের মানসিকতা। পরহেজগার ও খোদাভীরু লোকেরা কখনো এ ধরনের মানসিকতার প্রশ্রয় দেননি।

প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমার পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা যদি নাও দেয়া হতো এবং ঐ ভাষণের সংশ্লিষ্ট উক্তিগুলোই শুধু যদি খোলা মন নিয়ে পড়া হতো, তাহলেও এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত হওয়ার অবকাশ থাকতোনা। ঐ ভাষণের বক্তব্যের ধারা বিন্যাসে যেখানে মানবীয় দুর্বলতা শব্দটা এসেছে, সেখানে তাকে খুঁত ও চারিত্রিক দোষত্রুটি অর্থে গ্রহণ করাতো কোনো মতেই সঙ্গত হতে পারেনা। সেখানে তো সমগ্র আলোচ্য

বিষয়টাই এই যে, অন্যান্য জাতি তাদের নবীদের ব্যাপারে যে বাড়াবাড়ি করেছে এবং তাদেরকে খোদা, খোদার সন্তান অথবা অবতার পর্যন্ত বানিয়ে ফেলেছে, কুরআন মুসলিম জাতিকে সেই সব বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করেছে এবং খোদায়ী ও রিসালাতের মধ্যে এমন একটা সুস্পষ্ট বিভেদ রেখা টেনে দিয়েছে, যা দ্বারা যে কোনো মানুষ রসূলের প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান কি এবং কি নয়, তা চিহ্নিত করতে সক্ষম। এরূপ আলোচনার মধ্যে রসূল খুঁত ও নৈতিক দোষক্রটির উর্ধ্বে নয়, একথা বলার সুযোগ কোথা থেকে আসে?

তাছাড়া অর্থ সম্পর্কে যার বুঝসুজ আছে, সে কখনো মানবিক দুর্বলতার অর্থ খুঁত ও নৈতিক দোষক্রটি বলতে পারেনা। মানুষের ক্ষেত্রে 'নৈতিক দোষ' কথাটা শুধু তখনই প্রযোজ্য হয়, যখন সে কটুভাষী, মিথ্যাবাদী, চোগলখোর, ধোঁকাবাজ, বিশ্বাসঘাতক ও দুষ্কর্মপ্রবণ ইত্যাদি হয়। আর খুঁত শব্দটা ব্যবহৃত হয় তখন, যখন সে হয় কোনো শারীরিক খুঁত, যথা কদাকৃতি কিংবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পঙ্গুত্বে আক্রান্ত হয় অথবা কোনো মানসিক বা চারিত্রিক দোষ, যথা বুদ্ধির স্থূলতা, মেধার পঙ্গুত্ব ও তোতলামি অথবা প্রবৃত্তির খায়েশের গোলামীতে আক্রান্ত হয়। পক্ষান্তরে মানবিক দুর্বলতা হলো মানুষের নৈতিক নিরাপত্তার জন্য পানি ও খাদ্যের প্রয়োজন, বিশ্রাম ও নিদ্রার প্রয়োজন, বিয়ে শাদির প্রয়োজন, অসুখ বিসুখে ওষুধের প্রয়োজন, রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ছায়ার প্রয়োজন এবং ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পেতে গরম পোশাকের প্রয়োজন। এসব প্রয়োজন ও চাহিদার কথা বুঝাবার জন্যই আল্লাহ বলেছেন: وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا 'মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।' (সূরা নিসা, আয়াত: ২৮)

১১. কোনো কাফের কি সৎ কর্মের পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য?

প্রশ্ন: আমার জনৈক অন্তরঙ্গ বন্ধু বেশ ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন। তাঁর বিশ্বাস, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তিই কোনো ভালো কাজ করবে, যেমন মযলুম ও গরীবের সাহায্য, পথিক ও রোগীর সেবা ইত্যাদি, সে আল্লাহর কাছে অবশ্যই পুরস্কার পাবে। আখেরাত মুসলমানদের একচেটিয়া নয়। আল্লাহ সারা জাহানের প্রভু, শুধু মুসলমানদের নন। তাঁর ধারণা, প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী যথা বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিষ্টান ইত্যাদি, যদি খালেস নিয়তে নেক কাজ করে, অর্থাৎ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নয়, তবে সে আখেরাতে তার প্রতিদান পাবে। আমি তার সাথে একমত নই। আমি তাকে কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত যথা সূরা নাহলের ৯৭, সূরা তোয়াহার ১১২ এবং সূরা আম্বিয়ার ১৪ আয়াতের বরাত দিয়ে বলেছি, নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য ঈমান আনা শর্ত। কিন্তু এতে তিনি সন্তুষ্ট হননি। আমি তাকে বলেছি, এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত। তিনি বলেন যে, আলেমরা সাধারণত চরমপন্থী। তারপর আপনার সম্পর্কে সে বললো, মাওলানা মওদূদী সাহেব ভারসাম্যপূর্ণ মনমস্তিষ্কের অধিকারী আলেম। তিনি চরমপন্থী চিন্তাধারার অনুসারী নন। আপনি এ সমস্যার সমাধান তাঁর কাছ থেকে জেনে দিন। এ জন্যই আপনাকে এই চিঠি লিখছি। বিষয়টা অধিকতর স্পষ্ট করার মানসে আরো একটা কথা বলার অনুমতি চাইছি। কথাটা হলো: একজন পাপিষ্ঠ মুসলমান নেক কাজ করলে তা কবুল হবে,

অথচ একজন অমুসলিম একই নেক কাজ বা আরো উৎকৃষ্টতর মহৎ কাজ করলে তা কবুল হবেনা, এমন পক্ষপাতদুষ্ট হওয়াটা তো আল্লাহর পক্ষে সম্ভব নয়। এটাতো তার বান্দাহ প্রতিপালনের নীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

জবাবঃ আপনার বন্ধু যদি এ প্রশ্নের জবাব কুরআন থেকে চান, তাহলে কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে, কাফেরের কাজ ভালোই হোক আর মন্দই হোক, শুধুমাত্র কুফরীর কারণে সে জাহান্নামের আযাবের উপযুক্ত। আপনি তাকে সূরা নাহল, সূরা তোয়াহা ও সূরা আম্বিয়ার যেসব আয়াত শুনিয়েছেন তাতেও যদি তিনি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে এগুলোর চেয়ে অকাট্য, স্পষ্ট ও বিশদভাষী আয়াতও কুরআনে বহু রয়েছে। সেসব আয়াত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে যে আল্লাহ, তার নবীগণ, তার আয়াতসমূহ এবং আখেরাতের উপর বা এসবের কোনো একটির উপরও যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করেনা সে কাফের এবং আখেরাতে তার জন্য দোযখের আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সূরা নিসার ১৫০-১৫১ আয়াত দেখুনঃ 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি কুফরি করে, আল্লাহ ও তার রসূলগণের মধ্যে ভেদাভেদ করতে চায় এবং বলে যে, আমরা কাউকে মানবো, কাউকে মানবো না, আর (কুফরি ও ঈমানের) মধ্যবর্তী একটাপথ উদ্ভাবনের ইচ্ছা পোষণ করে, তারা সবাই পুরোপুরি কাফের। কাফেরদের জন্য আমি অবমাননাকর শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছি।'

এ আয়াতের আলোকে আল্লাহ ও নবীদেরকে অবিশ্বাস ও অমান্য করা অথবা আল্লাহকে মান্য করা ও রসূলগণকে অমান্য করা অথবা রসূলদের মধ্যে কাউকে মানা এবং কাউকে না মানা, এর যেটাই করা হোক না কেন, তা অকাট্যভাবে কুফরির শামিল। আর কুফরির শাস্তি (তা কাজ যেমনই হোক) অপমানজনক আযাব।

এছাড়া সূরা আনয়ামের ১৩০ নং আয়াতও লক্ষ্য করুনঃ 'তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই স্বজাতিয় রসূলগণ এসে আমার আয়াতগুলো তোমাদেরকে শুনাতো না এবং আজকের এই দিনটির সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করতোনা? তখন তারা বলবে, আমরা আজ স্বয়ং আমাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষী। পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিলো। তারা শেষ পর্যন্ত স্বয়ং নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলো যেঃ 'আমরা অবিশ্বাসী ছিলাম।'

এখানে রসূলগণের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান, তাদের উপস্থাপিত কুরআনের আয়াতগুলো অস্বীকার এবং আখেরাতকে অবিশ্বাসকারী লোকদেরকে কাফের বলা হয়েছে। আর তাদেরকেই চিরস্থায়ী জাহান্নামের আযাবের যোগ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে, চাই তার আমল যে রকমই হোক।

সূরা যুমারের ৭১ ও ৭২ নং আয়াতেও এ কথাই বলা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, যখন কাফেরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তাদের জন্য জাহান্নামের দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং দোযখের কর্মচারী (ফেরেশতারা) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেনঃ 'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকেই রসূলগণ এসে তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পড়ে শোনাতোনা এবং আজকের এই দিনের মুখোমুখি হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করতো না? তারা বলবে, হ্যাঁ,

করতো। তবে আযাবের সিদ্ধান্ত কাফেরদের ব্যাপারে প্রযুক্ত হলো। তখন বলা হবে, জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে অনন্তকালের জন্য প্রবেশ করো।'

যারা দুনিয়াতে রসূলগণ, তাদের পেশ করা আয়াতসমূহ এবং আখেরাত সম্পর্কে ঈমান আনতে রাজি হয়নি, আলোচ্য আয়াতেও তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে। অনন্তকালব্যাপী জাহান্নামের আযাবের সিদ্ধান্ত তাদের জন্যই ঘোষণা করা হয়েছে। কুফরি ছাড়া তাদের আর কোনো গুণাহ্ ছিলো কি ছিলনা, যার দরুন তারা জাহান্নামের আযাবের যোগ্য হতো কি হতো না, সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এরপর সূরা মুলকের ৮ থেকে ১১ নং আয়াত দেখুন। এখানে শুধুমাত্র নবীদের ও তাদের উপর নাযিল হওয়া কিতাবসমূহকে অস্বীকার করাকে জাহান্নামের আযাবের কারণ বলে নির্ণয় করা হয়েছে।

'যখনই কোনো দলকে তাতে (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করা হবে, অমনি তার কর্মচারীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে, তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে, হ্যাঁ, সতর্ককারী এসেছিলো। কিন্তু আমরা তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতাম আর বলতাম, আল্লাহ্ কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা একটা মারাত্মক গুমরাহীতে লিপ্ত।'

এসব আয়াতকে দেখার পর কুরআনে বিশ্বাসী কেউ কি একথা অস্বীকার করতে পারে যে, কুফরি জিনিসটাই স্বয়ং মানুষের দোযখবাসী হওয়ার স্বতন্ত্র কারণ এবং কাফের অবস্থায় কৃত কোনো নেক আমল তাকে দোযখ থেকে রক্ষা করতে পারেনা। তবে পার্থক্য থাকলে শুধু ততোটুকুই থাকতে পারে যে, ঐ আযাবালয়ের অনেকগুলো দরজা রয়েছে। সৎ কর্মশীল কাফের ভিন্ন কোনো দরজা দিয়ে ঢুকবে আর দুষ্কর্মী কাফের তাদের দুষ্কর্ম অনুপাতে ভিন্ন দরজা দিয়ে ঢুকবে। অন্য কথায় বলা যায়, কোনো কাফেরের আযাব একটু হাল্কা হবে, কোনো কাফেরের আযাব কঠিন হবে, আবার কারোর আযাব হবে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। আমলের দৌলতে আযাব হাল্কা বা কঠিন হতে পারে। কিন্তু জাহান্নামে যাওয়া থেকে কোনো কাফের নিস্তার পেতে পারেনা। কেননা কুফরি হচ্ছে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বিদ্রোহীর জন্য আল্লাহ বেহেশত তৈরি করেননি।

এবার মুমিনের প্রসঙ্গে আসা যাক। মুমিন দুরকমের হতে পারে। এক. যারা ঈমানের সাথে মুটামুটি সৎকর্মশীলও। তাদের কিছু গুনাহ হয়ে থাকলেও তওবা দ্বারা তা মাফ হয়ে যেতে পারে। দুনিয়ার দুঃখ কষ্ট, বিপদাপদ, রোগ শোকেও তার কাফ্ফারা হয়ে যেতে পারে। তাদের পক্ষে শাফায়াতও উপকারি হতে পারে। আর আল্লাহ আপন দয়া ও করুণাবলেও তাদেরকে মাফ করে দিতে পারেন। দুই. যারা ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় গুনাহর কাজ করেছে। তারা বিদ্রোহী নয়, নিছক অপরাধী। তাদের ক্ষমার যদি কোনো ব্যবস্থাই না হয়, তবে তাদের বিদ্রোহের নয়, অপরাধের শাস্তি দেয়া হবে। দুনিয়ার প্রচলিত আইন কানুনও বিদ্রোহী ও অপরাধীকে এক পর্যায়ে রাখেনা। তাহলে সবচেয়ে ন্যায়বিচারক আল্লাহ্ সম্পর্কে আপনি কিভাবে ভাবতে পারেন যে, তিনি উভয়কে এক পর্যায়ে রাখবেন? (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি: ১৯৭৭)

ফেকাহ্ ও অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ

০১. সালাতুল খাওফ (সন্ত্রাসকালীন নামায)।

প্রশ্ন: পাকিস্তানের যে সব সেনাদল আপন পবিত্র জন্মভূমির প্রতিরক্ষার জন্য রণাঙ্গণে যুদ্ধে লিপ্ত, তাদের সম্পর্কে ফরয নামাযের বিধান কি? বর্তমান পরিস্থিতিতে ফরয নামায পড়ার নিয়ম কি?

জবাব: যদি কার্যত লড়াই চালু না থেকে থাকে বরং সেনাদল রণাঙ্গণের কোনো ঘাঁটিতে কেবল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছে, তাহলে এমতাবস্থায় সালাতুল খাওফ পড়া যাবে। এই নামায জামায়াতে পড়তে হবে এবং তার নিয়ম হলো, প্রথমে অর্ধেকসংখ্যক সৈন্যরা এক জায়গায় সমবেত হয়ে ফরয নামায কসর[১] পড়বে। অতঃপর অবশিষ্ট অর্ধেক সৈন্য একই নিয়মে নামায পড়বে। নামাযের সময় সৈনিকদের অস্ত্র সাথে রাখতে হবে।

যদি তাৎক্ষণিকভাবে শত্রুর আক্রমণের আশংকা থাকে এবং কোনো সৈনিকের নিজ অবস্থান থেকে সরা সম্ভব না হয়, তাহলে জামায়াতে নামায পড়া জরুরি নয়। যে সৈনিক যেখানে যে অবস্থায় আছে বসে হোক, শুয়ে হোক, দাঁড়িয়ে হোক, ইশারায় হোক, শুধু ফরয নামায কসরের সাথে পড়বে। এরূপ অবস্থায় কেবলামুখী হওয়াও জরুরি নয়। কেবলামুখী হয়ে নামায পড়া সম্ভব না হলে, কেবলামুখী হয়ে শুধু নিয়ত বেঁধে নিতে হবে। তারপর যুদ্ধের প্রয়োজনে যে দিকে মুখ করা দরকার হয়, সেদিকে মুখ করেই নামায পড়া চলবে। রুকু সিজদা করা সম্ভব না হলে ইশারায় নামায পড়ে নিতে হবে। নামায চলাকালে শত্রু আক্রমণ করলে সেই অবস্থায়ই গুলি করা যাবে। তবে জায়গা থেকে সরে দাঁড়ানো এবং সঙ্গীদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে নামায ভেঙ্গে দিতে হবে এবং সুযোগ মতো পরে কাযা করে নিতে হবে। সক্রিয় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে এবং নামায পড়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে গেলে নামায কাযা করা যাবে। এরূপ পরিস্থিতিতে যতো নামায কাযা হবে তা যুদ্ধের পর পড়ে নিতে হবে। (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর:১৯৬৫)

০২. খাবার জিনিসে হালাল হারাম।

প্রশ্ন: আমি বেশ কিছুকাল ধরে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছি। এখানে ইংরেজদের সাথে যখনই ধর্ম সম্পর্কে কথাবার্তা হয়, তারা শুকরের গোশত সম্পর্কে আলোচনা না করে ছাড়েনা। তারা জানতে চায় যে, শুকরের গোশত ইসলামে কোন্ কারণে হারাম করা হয়েছে? আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনা। আপনার কাছে অনুরোধ এ ব্যাপারে

---

১. কসর অর্থ হচ্ছে প্রবাসে থাকাকালে চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযের শুধু দুরাকাত পড়তে হবে। চার রাকায়াতের কম ফরয নামাযে কসর চলেনা। তিন রাকাতী নামাযেও কসর চলেনা। সুন্নতেও কসর নেই। তবে সফরকালে সুন্নত না পড়লেও দোষ নেই।

আমাকে সাহায্য করবেন এবং কুরআনের আলোকে কিসের কারণে এই গোশত হারাম করা হলো? এর বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি কি?

জবাব: শুকরের গোশত কুরআনে যেমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি বাইবেলের আদি পুস্তকেও তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইহুদিরা আজও এটা খায়না। নতুন পুস্তকেও ঈসা আ. কোথাও একথা বলেননি যে, বাইবেলের এ আইন রহিত হয়ে গেছে। একমাত্র সেন্টপলই খৃষ্টধর্মকে পাশ্চাত্য জগতে বিস্তৃত করার মানসে এসব বিধি নিষেধ বাতিল করেন এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করেন। আল্লাহর শরিয়তে শুকর চিরকালই হারাম।

যেসব জিনিসের অনিষ্টকারিতা মানুষ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে নিজেই জানতে পারে, সে সম্পর্কে আল্লাহর কিছু বলার দরকার হয়না। এসব জিনিস সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষের নিজস্ব তথ্য মাধ্যমই যথেষ্ট। এ জন্য আল্লাহর শরিয়তে বিষ হারাম করার কথা ঘোষণা করা হয়নি। তবে যেসব জিনিসের অনিষ্টকারীতা জানার উপায় উপকরণ মানুষের হাতে নেই, সেগুলো পরিত্যাগ করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে থাকেন। আমাদের পক্ষে আল্লাহর উপর নির্ভর করে ঐসব জিনিস বর্জন করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

বস্তুত খাদ্যের প্রভাব শুধু মানুষের শরীরের উপরই পড়েনা, তার চরিত্রের উপরও পড়ে। শরীরের উপর যে প্রভাব পড়ে তাতো আমরা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারাই জানতে পারি এবং অনেক কিছু জেনেও ফেলেছি। কিন্তু চরিত্রের উপর খাদ্যের যে প্রভাব পড়ে তার জ্ঞান আজও মানুষ আয়ত্ত করতে পারেনি। আল্লাহর শরিয়তে শুকর, মৃত জন্তু, রক্ত ও হিংস্র জন্তু এ জন্যই নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, মানব চরিত্রে এসব খাদ্যের অশুভ প্রভাব পড়ে।

০৩. বীমাকে হালাল করার উপায়।

প্রশ্ন: বীমা সম্পর্কে আপনার এ ধারণা সঠিক যে, এতে মৌলিক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। তবে আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, এ জন্য অত্যন্ত দীর্ঘ ও অবিশ্রান্ত চেষ্টা সাধনা আবশ্যক। আমার বীমা কোম্পানীতে আমি এ যাবত জীবন বীমা এড়িয়ে চলেছি। তবে ভেবেচিন্তে এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, জীবনবীমার দোষত্রুটিগুলো নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করে দূর করা সম্ভব।

১. জামানতের টাকা সরকারের কাছে জমা দেয়ার সময় এরূপ নির্দেশ দেয়া যেতে পারে যে, এই টাকাকে সুদভিত্তিক কারবারে না লাগিয়ে কোনো সরকারি বা বেসরকারি কারখানার শেয়ার ক্রয় করা হোক। চেষ্টা করা হলে আশা করা যায়, সরকার এ অনুরোধ মেনে নেবে। এভাবে সুদভিত্তিক কাজে শরীক হওয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব।

২. নিয়ম অনুযায়ী বীমা কোম্পানীর এখতিয়ার থাকে যে, ইচ্ছা করলে যে কোনো ব্যক্তির বীমা বাতিল করতে পারে কিংবা প্রথমেই অগ্রাহ্য করতে পারে। আমরা বিধিমালায় এরূপ ব্যবস্থা রাখতে পারি যে, যে কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা

করলে স্বীয় টাকা শরিয়ত মোতাবেক উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করার নির্দেশ দিতে পারে। এরূপ শর্ত আরোপ করেও ইসলামি বিধি কঠোরভাবে পালন করা যেতে পারে যে, যারা শরিয়তবিধি মোতাবেক বন্টনে সম্মত হবেনা তাদের পলিসি গ্রহণ করা হবেনা। এতে করে আমাদের কাংখিত শরিয়তবিধি মান্যকারীরাই শুধু আমাদের কাছে বীমা করাতে পারবে।

৩. জুয়ার সংমিশ্রণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বীমাকারীদেরকে এরূপ নির্দেশ দিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে, তাদের মৃত্যু ঘটলে শুধুমাত্র প্রিমিয়ামের মাধ্যমে যতো টাকা জমা দেয়া হয়েছে, ততো টাকাই উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হোক।

দৃশ্যত যদিও বর্তমান অবস্থায় এই কারবারে অন্যায়ের দিকটা খুবই প্রবল, তবে এটাকে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার অবকাশও রয়েছে।

কিছুদিন আগে একবার এ কারবারের কুৎসিত দিকগুলোর প্রচন্ডতা অনুভব করে আমি নিজের বীমা কোম্পানী বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরে ভাবলাম এমন একটা পন্থা উদ্ভাবন করা যাক, যাতে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে পারে এবং ইসলামি বিধির আওতায় ইন্সুরেন্সের কারবার চালানো যেতে পারে। একটু কষ্ট করে আমাকে পথ প্রদর্শন করুন।

জবাব: বীমা ব্যবসাকে বিশুদ্ধকরণের যে পন্থা আপনি লিখেছেন তা দ্বারা তার অবৈধতার কারণগুলো দূর হবে বলে আমি আশা করি। আমার মতে এটিকে বৈধতার গণ্ডিতে আনার জন্য কমপক্ষে যে কাজগুলো করা দরকার তা নিম্নরূপ:

১. সরকারকে এ ব্যাপারে সম্মত করাতে হবে যে, কোম্পানীর কাছে সঞ্চিত জামানতের টাকাকে সে কোনো সরকারি অথবা আধা সরকারি শিল্প কিংবা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে অংশীদারীর নীতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করবে এবং কোম্পানীকে নির্দিষ্ট হারে নয় বরং আনুপাতিক হারে তার লভ্যাংশ দেবে।

২. কোম্পানী তার অন্যান্য পুঁজিকেও এরূপ লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করবে, যা থেকে সে সুদের বদলে লভ্যাংশ পাবে। কোনো সুদভিত্তিক কারবারে তার পুঁজির কোনো অংশই বিনিয়োগ করবেনা।

৩. বীমাকারীর মৃত্যুর পর তার জমাকৃত সমস্ত টাকা উত্তরাধিকারীদেরকে দেয়া হবে এবং শরিয়তের বিধি অনুযায়ী ঐ টাকা সকল উত্তরাধিকারীর মধ্যে বন্টন করা হবে, এই দুটো কথা যারা মেনে নেবে, কেবল তাদেরই জীবন বীমা গ্রহণ করা হবে।

৪. বীমাকারীদের মধ্যে যারা স্বীয় টাকার বাবদে লাভ চাইবে, তাদের টাকা তাদের অনুমতিক্রমে উপরের ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বাণিজ্যিক কাজে অংশীদারীর নীতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে হবে।

এই চারটে সংস্কার কার্যক্রম যদি আপনি বাস্তবায়িত করতে পারেন, তাহলে আপনার কোম্পানীর কারবার তো পবিত্র হবেই। সেই সাথে দেশে যারা বীমা ব্যবসায়ের সংশোধন কামনা করেন, তারাও অত্যন্ত সার্থক পথনির্দেশ লাভ করবেন। (তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি: ১৯৬৬)

০৪. মুসাফাহা ও মুয়ানাকা।

প্রশ্ন: অনেকে ঈদের নামায শেষে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে হয় মুসাফাহা (হাতে হাত মিলানো) অথবা মুয়ানাকা (কোলাকুলি) করে থাকে। আমি যা জানতে চাই সেটা হলো, ঈদের দিন কোলাকুলি করা কি বৈধ? হাদিসে কিংবা কোনো সাহাবির কার্যকলাপ থেকে কি এর বৈধতা প্রমাণিত হয়।

জবাব: মুসাফাহা সম্পর্কে যতোদূর জানা যায় তাতে ওটা শুধু উৎসবাদিতে কেন, সকল সময় প্রত্যেক সাক্ষাৎকালে শুধু জায়েযই নয় বরং মুস্তাহাব এবং সুন্নত। আবু দাউদে বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সা. বলেছেন, 'যখন দুজন মুসলমান পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে হাতে হাত মিলায় এবং আল্লাহর প্রশংসা করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দেন।' তিরমিযিতে হাদিসটির ভাষা এরূপ, 'যখন দুজন মুসলমান পরস্পরে মিলিত হয়ে হাত মিলায়, আল্লাহ তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই গুনাহ মাফ করে দেন।' অর্থাৎ তাদের পরস্পরের হাত মেলানো দ্বারা এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় বিধায় তা তাদের গুনাহ মাফের কারণ হয়ে থাকে। আবু দাউদে আছে, আবু যরকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, রসূল সা. কি সাক্ষাতের সময় আপনাদের সাথে মুসাফাহা করতেন? তিনি জবাব দিলেন যে, এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি যে, আমি রসূল সা.-এর সাথে দেখা করেছি আর তিনি আমার সাথে মুসাফাহা করেননি। এ জন্য মুসাফাহা সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।

তবে মুয়ানাকা অর্থাৎ কোলাকুলি সম্পর্কে ফকীহদের মতভেদ আছে। কোনো কোনো ফেকাহবিদ (ইমাম আবু ইউসুফ সহ) মনে করেন এটা সম্পূর্ণ জায়েয, এমনকি মাকরূহ নয়। অন্যারা শুধু প্রবাস থেকে ফেরার পর অথবা এ ধরনের কোনো অন্যান্য সাধারণ ক্ষেত্রে জায়েয এবং সাধারণ অবস্থায় মাহরূহ মনে করেন। ইমাম আবু হানিফার মতে এটা সর্বাবস্থায় মাকরূহ ও পরিত্যাজ্য। এই মতভেদের কারণ হলো: মুয়ানাকা সম্পর্কে যে সব হাদিস রয়েছে তার বক্তব্যে পার্থক্য রয়েছে। তিরমিযিতে বর্ণিত আনাস রা.-এর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি রসূল সা.-কে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রসূলুল্লাহ, আমাদের কেউ যদি তার কোনো ভাই এর সাথে সাক্ষাত করে তবে সে কি তার সামনে মাথা নোয়াতে পারবে? তিনি বললেন, না।

সে জিজ্ঞাসা করলো, তার হাত ধরে মুসাফাহা করতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। একই তিরমিযিতে আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা রা. বলেন, যায়েদ বিন খালেদ বিন হারেসা যখন মদিনায় এলো, তখন সে এসে আমাদের ঘরের দরজার কড়া নাড়লো। রসূল সা. দ্রুত উঠে বাইরে গেলেন এবং তাকে গলায় জড়িয়ে ধরে তার মুখে চুমু খেলেন। আবু দাউদে আবু যরের বর্ণনা হলো, 'একবার রসূল সা. আমাকে ডাকলেন। তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না। পরে যখন জানতে পারলাম যে তিনি আমাকে ডেকেছেন, তখন আমি তাঁর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি আমাকে গলায় মেলালেন।

এসব রেওয়ায়েত একত্র করলে বুঝা যায়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সচরাচর শুধু হাত মিলিয়েই ক্ষান্ত থাকতেন, সব সময় কোলাকুলি করতেননা। তবে কখনো কখনো কোনো বিশেষ অবস্থায় তিনি কোলাকুলিও করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, এ কাজটা একেবারে নাজায়েজ নয়। (তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি: ১৯৬৬)

০৫. সুদমুক্ত অর্থনীতিতে সরকারের ঋণ পাওয়ার সমস্যা।

প্রশ্ন: আমি ইদানিং সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা বিষয়ে একখানা বই লিখছি। এ প্রসঙ্গে একটি অধ্যায়ে আমাকে সরকারের ঋণপ্রাপ্তির সমস্যা নিয়ে লিখতে হবে। আজকাল বিভিন্ন কারণে সরকারের যেরূপ ব্যাপকভাবে ঋণলাভের প্রয়োজন হয়, তাতে কেবল নৈতিক আবেদনের উপর নির্ভর করলে চলেনা। বিত্তশালী ঋণ দেয়ার প্রেরণা লাভ করে এমন কিছু সুবিধা দেয়াও আবশ্যক বলে মনে হয়।

আমার মতে সুদমুক্ত অর্থ ব্যবস্থায় যারা সরকারকে ঋণের আকারে পুঁজি সরবরাহ করবে তাদের ঋণ দেয়া পুঁজিকে কোনো কোনো করের রেয়াত দেয়া কিংবা কোনো কোনো কর থেকে অব্যাহতি দেয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ আয়ের যে অংশ সরকারকে ঋণ হিসেবে দেয়া হবে, তাতে আয়করের হার সুবিধাজনকভাবে কমিয়ে দেয়া উচিত। এই সুবিধা সরকারের ঋণলাভে সহায়ক হবে।

ইসলামি রাষ্ট্র বাধ্যতামূলকভাবে আদায়যোগ্য যাকাত ও উসূর প্রভৃতির অতিরিক্ত যে সব কর আরোপ করে থাকে, আমার প্রস্তাবটি সেই কর সংক্রান্ত। এবার সম্পূর্ণ পৃথকভাবে এটাও জানতে চাই যে, আমার উপরোক্ত অভিমতকে আপনি যদি গ্রহণযোগ্য মনে করেন, তাহলে যে পুঁজি যতো দিনের জন্য সরকারকে ঋণ দেয়া হয়েছে, তার উপর ততোদিন পর্যন্ত যাকাত মওকুফ করা সম্ভব কি?

উল্লিখিত উভয় প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে যে যুক্তিপ্রমাণ আমার জানা আছে, আপনার কাছে তার পুনরাবৃত্তি করে আপনার মুল্যবান সময় নষ্ট করতে চাইনা। তার পরিবর্তে শুধু এতোটুকু যথেষ্ট মনে করি যে, প্রথম প্রস্তাবের ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে, এতে (কর রেয়াত বা কর মওকুফে) শরিয়তের কোনো বিধি লংঘিত হয়না। সমস্যাটার শুধু বাস্তব সুবিধা ও স্বার্থের আলোকে নিষ্পত্তি কাম্য। তবে দ্বিতীয় প্রস্তাবের (যাকাত উসূর মওকুফ করা) ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। উভয় মতের ব্যাপারে আপনার পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা পথনির্দেশ প্রত্যাশা করছি।

জবাব: সরকারকে যারা সুদমুক্ত ঋণ দেবে, তাদেরকে কর সুবিধা দেয়াতো আমার মতে জায়েয। তবে শর্ত হলো এই সুবিধা এমনভাবে দেয়া চাই যাতে ঋণের পরিমাণ অনুপাতে তা বেড়ে না যায়। কেননা তাতে সুবিধাটা সুদের সমতুল্য হয়ে যাবে। তবে যাকাত মওকুফ করার বৈধতার কোনো প্রমাণ আমি পাই না। স্বেচ্ছাসেবক হয়ে সামরিক বা বেসামরিক কাজ করে দেয়ার বিনিময়ে যদি নামায মাফ হতে পারে, তাহলে সুদমুক্ত ঋণ দেয়ার বিনিময়ে যাকাতও মাফ হতে পারবে বৈকি। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে উভয় ফরয কাজের বেলাতেই তা হওয়া অসম্ভব। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় বহুবার সামরিক ও অন্যান্য প্রয়োজনে জনগণের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয়েছে। কিন্তু

কখনো কোনো সাহায্যের বিনিময়ে কোনো ফরয কাজ রহিত করা হয়নি, এমনকি তাতে কোনো রেয়াতও দেয়া হয়নি। তাছাড়া লাভজনক (Productive) উদ্দেশ্যে যে ঋণ সরকার গ্রহণ করবে তাতে অর্জিত মুনাফাকে সরকার একটা আনুপাতিক হারে ঋণদাতাদের মধ্যে বন্টন করতে পারে। এ ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক ঋণের চেয়েও লাভজনক হবে। যদি কোনো বিশেষ প্রকল্পের জন্য সরকার জনগণের কাছ থেকে কোনো আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে, তাহলে যতোদিন এই অর্থ ঐ প্রকল্পে নিয়োজিত থাকবে ততোদিন পর্যন্ত ঐ প্রকল্পের আয়ের একটা অংশ অর্থদাতাদেরকে দেয়া যেতে পারে। আর যদি তা যে কোনো প্রকল্পে ব্যবহারযোগ্য সাধারণ ঋণ হয়, তাহলে তাও ঋণের বদলে 'মুদারাবা'র (লাভ লোকসান বন্টন ভিত্তিক অর্থ বিনিয়োগ) নীতি অনুসারে নেয়া উচিত এবং যে সব প্রকল্পে ঐ টাকা খাটানো হবে, সেগুলোর সামগ্রিক আয় থেকে একটা আনুপাতিক অংশ পুঁজি সরবরাহকারীদের মধ্যে বন্টন করা উচিত। (তরজমানুল কুরআন, জুলাইঃ ১৯৬৭)

০৬. নামাযের দরূদ।

প্রশ্নঃ আপনি 'খুতুবাত' (নামাযের হাকিকত) পুস্তকে নামাযের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যে দরূদ উল্লেখ করেছেন, তাতে سيدنا ومولانا শব্দ দুটো প্রচলিত দরূদের শব্দগুলোর অতিরিক্ত। হাদিসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে যে দরূদ উদ্ধৃত হয়েছে তাতে এ শব্দ দুটো পাওয়া যায়না। জনৈক আলেম বলেছেন, প্রচলিত দরূদ থেকে বাড়তি এ শব্দগুলো নামাযে পড়া মাকরূহ। আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি কি?

জবাবঃ এই বাড়তি শব্দ দুটোকে যিনি মাকরূহ বলেন, তিনি এই মাসয়ালাটার প্রকৃত তত্ত্ব জানেননা। এটা বুঝতে হলে তাশাহুদের পুরো মাসয়ালাটার তত্ত্বানুসন্ধান করা প্রয়োজন।

তাশাহুদ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হাদিসটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ। হাদিস সংগ্রাহকগণ ২০টির চেয়েও বেশি সনদে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এই সকল বর্ণনাকারী 'আত্তাহিয়াতু' থেকে শুরু করে 'আবদুহু ওয়া রসূলুহু' পর্যন্ত পুরো দোয়াটা একই আকারে বর্ণনা করেছেন। কোনো রেওয়ায়েতের শব্দ অন্য রেওয়ায়েতের শব্দ থেকে পৃথক নয়। এতদসত্ত্বেও এমন কথা কেউ বলেনি যে, নামাযে শুধু এই তাশাহুদই পড়তে হবে। ইমাম শাফেয়ী ইবনে আব্বাস রা.-এর তাশাহুদ এবং ইমাম মালের ওমর রা.-এর তাশাহুদকে উত্তম মনে করেন। অথচ ঐ দুটো তাশাহুদের ভাষা পরস্পর থেকেও বিভিন্ন। আবার ইবনে মাসউদ রা. বর্ণিত তাশাহুদ থেকেও পৃথক। এ ছাড়া জাবের বিন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আলী, আবু মুসা আশয়ারী, আয়েশা, সামুরা ইবনে জুনদুব, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আবু হুমাইদ, আবু বকর, হোসাইন বিন আলী, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, আনাস বিন মালেক, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরী (রাজিয়াল্লাহু আনহুম) ও অন্যান্য সাহাবির বর্ণিত হাদিসে বহু রকমারি ভাষার তাশাহুদ উদ্ধৃত হয়েছে। এ সবের মধ্য থেকে যে তাশাহুদই পড়া হবে, নামায শুদ্ধ হবে। ইবনে আবদুল বার এবং ইবনে তাইমিয়া বলেন, এ হচ্ছে মোবাহ জিনিসের ব্যাপারে মতভেদ। অর্থাৎ এর কোনোটাই অমুবাহ

বা নাজায়েজ নয়। ইবনে হাযারের বক্তব্য হলো, বিপুলসংখ্যক আলেমের মতে হাদিস থেকে প্রমাণিত যে কোনো তাশাহুদ পড়া জায়েয।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই থেমে থাকেনি যে, হাদিস থেকে প্রমাণিত যে কোনো তাশাহুদ পড়া জায়েয। বরং জনৈক শীর্ষস্থানীয় সাহাবা আরো খানিকটা অগ্রসর হয়ে রসূল সা. থেকে তাশাহুদের একটি ভাষ্য নিজেই উদ্ধৃত করেন, অতঃপর নিজেই আবার বলেন, আমি এই তাশাহুদে দুজায়গায় অতিরিক্ত শব্দ সংযোজন করেছি। ইনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর। আবু দাউদ এবং দারকুতনীতে তাঁর এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ الله, এরপরে আমি وَبَرَكَاتُه শব্দটা বাড়িয়েছি এবং اَشْهَدُ اَنْ لَّا اله الَّا الله এরপর আমি وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَه কথাটা সংযুক্ত করেছি। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের এ সংযোজনকে কেউ আপত্তিকর বলেছে এমন কথা আমার জানা নেই।

এবার তাশাহুদের পরবর্তী দোয়া দরূদের প্রসঙ্গে আসা যাক। এ সম্পর্কে সর্বপ্রথম জানা দরকার যে, এগুলো পড়া আদৌ বাধ্যতামূলক নয়। আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযি ও দারকুতনীতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল সা. عَبْدُه وَرَسُوْلُه তাশাহুদ শিক্ষা দেয়ার পর বলেছেন: 'যখন তুমি এ পর্যন্ত পড়ে ফেলবে (অথবা পড়া শেষ করবে) তখন তোমার নামায সমাপ্ত হয়ে যাবে। এরপর উটে যেতে চাইলে যাও, আর বসে থাকতে চাইলে বসে থাকবে।' এ উক্তি থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হলো যে, عَبْدُه وَرَسُوْلُه পর্যন্ত নামায পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর যদি কিছুই না পড়া হয় তাহলেও নামাযে কোনো অসম্পূর্ণতা থাকেনা, আর দোয়া দরূদ তাশাহুদের অংশ নয় বরং তার অতিরিক্ত।

এই অতিরিক্ত জিনিস পড়া নিঃসন্দেহে মুস্তাহাব। তবে এ জন্য রসূল সা. এমন কোনো ভাষা নির্দিষ্ট করে দেননি যে, এর মধ্যে কোনো কমবেশি করা জায়েয হবে না। বুখারি, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের যে রেওয়ায়েতের উদ্ধৃত রয়েছে, তাতে তাশাহুদের ভাষা উল্লেখ করার পর তিনি রসূল সা.-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করেন যে, 'অতঃপর যেমন ইচ্ছা দোয়া করা যায়।' মুসনাদে আহমাদ ও নাসায়ীর একটি রেওয়ায়েতে রসূল সা.-এর উক্তি এরূপ, 'অতঃপর তোমাদের কোনো ব্যক্তি তার যে দোয়া সবচেয়ে পছন্দনীয় তা নির্বাচন করতে পারে এবং সেটাই স্বীয় মহান প্রতিপালকের নিকট চাইতে পারে।' বুখারি ও আবু দাউদেও প্রায় এ ধরনের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। এসব উক্তি থেকে স্পষ্টতই জানা যাচ্ছে যে, নামাযী তাশাহুদের পরে আল্লাহর কাছে দোয়া করুক (দরূদ ও তার অন্তর্ভুক্ত, কেননা তাও দোয়া বিশেষ) এটা রসূল সা. ভালো মনে করেছেন। কিন্তু তার ভাষা নামাযীর ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করেছেন।

এবার দরূদ শরীফের মাসয়ালা প্রসঙ্গে আসা যাক। আপত্তিকারীর বক্তব্য হলো: রসূল সা. থেকে যে ভাষা বর্ণিত হয়েছে, তাতে কমবেশী করা মাকরূহ। কিন্তু এটা কি ফকীহদের মধ্যে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত?

ইমাম আবু বকর বিন মাসউদ কালানীর গ্রন্থ 'বাদায়েউস সানায়ে' হানাফী ফেকাহর একটি অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ বিবেচিত হয়ে থাকে। এতে তিনি দরূদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: 'দরূদে মুহাম্মদ সা.-এর উপর করুণা বর্ষণ করো কথাটা বলা অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় আলেমের মতে মাকরূহ নয়। কেউ কেউ এটাকে মাকরূহ বলেন। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, এটা মাকরূহ নয়।'

দরূদে 'সাইয়েদেনা' শব্দ সংযোজনের ব্যাপারে খ্যাতানামা শাফেয়ী ফেকাহবিদ শামসুদ্দীন রামালী, যাকে ছোট শাফেয়ী বলা হয়, স্বীয় গ্রন্থ 'নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ' এ লিখেছেন: 'দরূদে রসূল সা.-কে 'সাইয়েদ' শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা উত্তম। কেননা এতে আমরা যে কাজে আদিষ্ট, সে কাজটাই করা হয়। তাছাড়া যে বাস্তব ব্যাপারটা আদব নামে অভিহিত এতে তারও বাড়তি উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এটা বাদ দেয়ার চাইতে পড়াই উত্তম।'

শুধু দরূদ কেন, তাশাহুদেও পর্যন্ত শাফেয়ীরা 'সাইয়িদিনা' শব্দ যোগ করাকে শুধু জায়েযই বলেননি বরং সেটাই তাদের রীতি হয়ে গেছে। 'আলফিক্হু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া' (চার মাযহাবের ফেকাহ) গ্রন্থে শাফেয়ী মাযহাবের যে দরূদ বর্ণনা করা হয়েছে, তার সমাপ্তি ঘটেছে এভাবে, وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله অথচ ইবনে আব্বাসের যে তাশাহুদকে ইমাম শাফেয়ী গ্রহণ করেছেন, তাতে سَيِّدَنَا শব্দটা নেই।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামীর در المختار হানাফী মাযহাবের বিশ্বস্ততম গ্রন্থাবলীর অন্যতম। এতে তিনি রসূল সা.-এর উপর রহমত নাযিল করার দোয়া প্রসঙ্গে লিখেছেন, কোনো কোনো আলেমের মতে اللهم ارحم محمد (হে আল্লাহ, মুহাম্মদের উপর রহমত করো) এ দোয়া করা নাজায়েয, আবার কারো কারো মতে জায়েয। ইমাম সারাখসী জায়েয হওয়াকেই অগ্রগণ্য বলে রায় দিয়েছেন।

অতঃপর দরূদে 'সাইয়িদিনা' শব্দটা ব্যবহার করা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়ে থাকে যে, এটা আমাদের (অর্থাৎ হানাফী) নীতির বিপরীত। এর প্রমাণ হিসেবে বলা হয় যে, ইমাম আবু হানিফা তাশাহুদে কমবেশি করাকে মাকরূহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এ মন্তব্য দুর্বল। কেননা দরূদ হচ্ছে তাশাহুদের অতিরিক্ত একটা জিনিস, তার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি কেউ তাশাহুদে 'আশাহাদু আন্না সাইয়িদিনা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু' বলে তবে, সেটা নির্ঘাত মাকরূহ। কিন্তু তাশাহুদের পরে যে দুরুদ পড়া হয়, তাতে এটা বাড়ানোতে কোনো আপত্তি নেই।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, নামাযে যে দরূদ পড়া হয়, তা প্রচলিত দরূদের ভাষায়ই পড়তে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। প্রচলিত দরূদের ভাষায় কমানো বাড়ানো যাবে। এখন দরূদে اللهم ارحم محمد এবং اللهم صلى على سيدنا محمد বলা যখন মাকরুহ নয়, তখন 'সাইয়িদিনা' শব্দের সাথে 'মাওলানা' কথাটাও বলা কোনো যুক্তিতে মাকরূহ হবে? (তরজমানুল কুরআন, মার্চ: ১৯৭৫)

০৭. দরূদে 'সাইয়িদুনা' ও 'মাওলানা' শব্দ যোগ সংক্রান্ত আলোচনা-১

প্রশ্ন: আপনি মার্চের তরজমানুল কুরআনে জনৈক প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে নামাযে দরূদ পড়া নিয়ে যা লিখেছেন, তার উপর নিম্নলিখিত আপত্তিগুলো ওঠে।

১. আপনি আবু দাউদ ও দারকুতনীর বরাত দিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি রসূল সা.-এর শেখানো তাশাহুদে 'রহমাতুল্লাহি'র পরে 'ওয়া বারাকাতুহু' শব্দটা এবং 'আশহাদুয়াল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর উপর 'ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু' কথাটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এর উপর ভিত্তি করে আপনি রসূল সা. থেকে উদ্ধৃত ভাষ্যের উপর নতুন শব্দ যোগ করা বৈধ বলে প্রমাণ করেন। কিন্তু এতে আপনার যুক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হয়না। কেননা সরাসরিভাবে উদ্ধৃত হাদিসের এসব শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

২. তাশাহুদ সম্পর্কে আপনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর এ হাদিস উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূল সা. তাকে 'আব্দুহু ওয়া রসূলুহু' পর্যন্ত তাশাহুদ শেখানোর পর বলেছেন, 'তুমি যখন এতোটুকু পড়ে ফেলবে (বা পড়ে শেষ করবে) তখন তোমার নামায শেষ হয়ে যাবে। এরপর উঠে যেতে চাইলে উঠে যাও, আর বসে থাকতে চাইলে বসে থাক।' এর উপর ভিত্তি করে আপনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, 'আবদুহু ওয়া রসূলুহু' পর্যন্ত নামায পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর নামাযী আর কিছু না পড়লেও তার নামাযে কোনো খুঁত থাকেনা এবং দরূদ ও দোয়া তাশাহুদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তার অতিরিক্ত জিনিস। কিন্তু আপনার এ যুক্তি সঠিক নয়। কেননা হাদিসের হাফেজগণ এ ব্যাপারে একমত যে, 'আবদুহু ওয়া রসূলুহু' এর পরের কথাটা (অর্থাৎ তুমি যখন এটুকু পড়ে ফেলবে---) আসলে রসূলুল্লাহর নয় বরং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের উক্তি। জনৈক বর্ণনাকারী অসাবধানতাবশত এটা এমনভাবে হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, যে তা রসূল সা.-এর উক্তি বলে মনে হয়।

৩. যদি ধরেও নেই যে আপনি যে রেওয়ায়েত থেকে যুক্তি প্রদর্শন করছেন তা সঠিক, তথাপি এটা বাস্তব সত্য যে, রসূল সা. নামায ফরয হওয়ার পর প্রাথমিক যুগেই তাশাহুদ শিখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কুরআনে রসূল সা.-এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠানোর নির্দেশ নাযিল হয়েছিল খন্দক ও বনু কুরায়যার যুদ্ধের সময় ৫ম হিজরিতে। কেননা ওটা সূরা আহযাবে উদ্ধৃত হয়েছে এবং এ সূরা ঐ যুদ্ধের সময়েই নাযিল হয়। সুতরাং পরবর্তী নির্দেশ পূর্ববর্তী বিধি ব্যবস্থাকে বাতিল করেছে। (অর্থাৎ দরূদ বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে।) -অনুবাদক

৪. নামায নিরেট আনুষ্ঠানিক ইবাদত সংক্রান্ত কাজ। এসব কাজের ক্ষেত্রে সর্বস্বীকৃত মূলনীতি হলো, শরিয়ত প্রণেতা (আল্লাহ বা রসূল) তা যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, অবিকল সেভাবেই তা তামিল করতে হবে। তাতে নিজের পক্ষ থেকে কোনো হস্তক্ষেপ করা চলেনা। ফেকাহ শাস্ত্রের মৌলতত্ত্ব (উসূলে ফেকাহ) সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত মত হলো, ইবাদাতের ক্ষেত্রে নির্দেশের হুবহু অনুসরণ এবং শরিয়ত প্রণেতার বাতলানো পন্থা ও পদ্ধতির অনুকরণই আসল কাজ। এর বাইরে কিছু করা বিদয়াত। কিন্তু আপনি

রসূল সা.-এর সময় থেকে চলে আসা দরূদের ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার পক্ষপাতী নন। বরং তাতে বাড়তি কিছু যোগ করা এবং এমনকি রদবদল[২] ও কমবেশি পর্যন্ত করা যায় বলে মনে করেন। অথচ নামাযের সকল দোয়া কালাম সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এতে কোনো কিছু কমানো বাড়ানো জায়েয নেই।

৫. দরূদে 'সাইয়্যিদুনা ও মাওলানা' যোগ করা একাধিক কারণে নাজায়েয। প্রথমত হাদিসে যতো দরূদ বর্ণিত হয়েছে, তার কোথাও এ শব্দ দুটো ব্যবহৃত হয়নি। এমনকি হাফেজ ইবনে হাজারের মতে কোনো সাহাবি ও তাবেয়ী পর্যন্ত দরূদে এসব শব্দ ব্যবহার করেননি। দ্বিতীয়ত 'সাইয়েদ' শব্দটা দুনিয়ার জীবনে রসূল সা.-এর ব্যক্তিত্বের উপর প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ শরিয়তবিরোধী। রসূল সা. নিজের জন্য এ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَم (আমি আদম বংশধরের নেতা) রসূল সা.-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করে আপনি যা বলতে চান, সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো: এ উক্তিটা দুনিয়ার নয় বরং কিয়ামতের অবস্থার বর্ণনা। পৃথিবীতে আল্লাহর সবিনয় গোলামী অবলম্বন করার প্রতিদানে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে কিয়ামতের দিন এই অসাধারণ সম্মানে ভূষিত করা হবে। কাযী ইয়ায স্বীয় গ্রন্থ 'সিফা'তে এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, ইস্রাফিল আ. রসূল সা. কে বললেন, 'আপনি আল্লাহর সামনে যে বিনয়াবনত জীবন যাপন করেছেন আল্লাহ তার প্রতিদানে আপনাকে এরূপ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন যে, আপনি কেয়ামতের দিন সমগ্র আদম সন্তানদের নেতা হবেন।' হাদিসে এ কথাও বলা হয়েছে, জিবরিল আ.-এর উপস্থিতিতে এক ফেরেশতা এসে রসূল সা.-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে রাজা রসূল বানাবো, না বান্দাহ রসূল বানাবো? জিবরিল রসূল সা. কে ইংগিত দিলেন, 'আপনি স্বীয় প্রভুর সামনে বিনয়াবনত ভঙ্গিতে উপস্থিত হোন।' তখন তিনি ঐ ফেরেশতাকে জবাব দিলেন, 'বরং বান্দাহ রসূল।' এ জন্যই রসূল সা. নিজের জন্য 'সাইয়েদ' (সরদার বা নেতা) শব্দ প্রয়োগ পছন্দ করেননি এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে দোয়া করতেন।

তৃতীয়ত, বনু কুরায়যা অভিযানকালে যখন উপস্থিত জনগণকে লক্ষ্য করে রসূল সা. সাদ বিন মায়াযকে দেখিয়ে বললেন, قوموا الى سيدكم (তোমাদের সরদারকে অভ্যর্থনা জানাতে উঠে দাঁড়াও) তখন ওমরের মুখ দিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে গেলো, السيد هو الله (সরদারতো একমাত্র আল্লাহ) এই সাথে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, সাদ বিন মায়াযের ঘটনা পঞ্চম হিজরির ব্যাপার। আর রসূল সা. নিজের জন্য 'সাইয়িদ' শব্দ ব্যবহারে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন এবং السيد الله (আল্লাহই সরদার) বলেছিলেন ৯ম হিজরিতে, যখন বনু আমেরের প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে এসেছিলো।

---

২. আমি 'রদবদল' শব্দটা কোথাও ব্যবহার করিনি। কেবল কমানো বাড়ানোর কথাই বলেছি। তথাপি যদি আপত্তিকারীরা জিদ ধরেন যে, আমি রদবদলও জায়েয মনে করি, তবে আমি জবাবে রদবদলেরও নজীর পেশ করবো। আবুল আ'লা।

চতুর্থত, দরূদ মূলত একটি দোয়া। যার জন্য দোয়া করা হচ্ছে, তাকে সাইয়্যিদ উপাধিতে ভূষিত করে দোয়া করায় দোয়ার ভাবগম্ভীর্য ক্ষুন্ন হয়। দোয়া ও আবেদনে বরঞ্চ চরম বিনয় ও দাসত্বের ভাব ফুটে ওঠা দরকার। যার জন্য দোয়া করা হয়, তার জন্য এভাবেই কথা বলা সঙ্গত যে, 'একজন নগণ্য দীনহীন দাস দরবারে হাজির হয়েছে'। এভাবে নয় যে, 'আমাদের নেতা ও সরদার হাজির হয়েছে।'

জবাবঃ আপনার আপত্তিগুলো নি:সন্দেহে বিবেচনার যোগ্য। আমি এ ধরনের আলোচনায় আনন্দ বোধ করে থাকি। নিম্নে এগুলোর ধারাবাহিক জবাব দিচ্ছি।

১. তাশাহুদে ইবনে ওমর রা.-এর সংযোজনঃ আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর বর্ণিত হাদিস থেকে যে যুক্তি দিয়েছি, তার উপর আপত্তি তোলার আগে আপনি যদি দুমিনিটও চিন্তা করতেন তাহলে একথা বলতেন না যে; 'এ হাদিস আপনার যুক্তির যথার্থতা প্রমাণ করেনা। কেননা এ ভাষ্য রসূল সা. থেকে সরাসরি উদ্ধৃত হাদিসেও বর্ণিত হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনি আর একবার আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা-এর হাদিসটি পড়ে দেখুন তিনি বলেছেন যে, السلام عليك ايها النبى ورحمة الله এরপর وبركاته শব্দটা এবং اشهد ان لا اله الا الله এরপর কথাটা আমি নিজে যোগ করেছি। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, যে সময় তিনি এই কথাগুলো যোগ করেন, সে সময় সেই মারফু (সরাসরি রসূলের বক্তব্য সম্বলিত) হাদিসটি তাঁর জানা ছিলনা, যাতে এই শব্দগুলো আছে বলে আপনি বলছেন। হতে পারে যে, ঐ হাদিস তিনি আর কখনো জানতে পারেননি, আবার এমনও হতে পারে যে, তিনি নিজ থেকে শব্দগুলো সংযোজন করার পর তা বলেছেন। আপনি এ ব্যাপারেও নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, এ হাদিসটি বিশুদ্ধ। দারকুতনী হাদিসটি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন যে, هذا اسناد صحيح (এ হাদিসের সনদ নির্ভুল) হাফেজ ইবনে হাজারের মতে আবু দাউদের বর্ণনা শুদ্ধ। এ থেকে বুঝা যায় আপনার অভিমত ঠিক নয়। কেননা এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, একজন মর্যাদাবান সাহাবি নামাযের প্রচলিত দোয়া দরূদে নিজ থেকে কিছু শব্দ যোগ করেছেন এবং সে কথা নির্দ্বিধায় মানুষের সামনে প্রকাশও করেছেন। অথচ সাহাবা ও তাবেঈনদের আমলেও তার কোনো প্রতিবাদ করা হয়নি, পরবর্তী কোনো যুগেও (অন্তত আমার জানামতে) কোনো ফকীহ বা মুহাদ্দিস এ কাজটিকে রসূলের একজন সাহাবি কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভ্রান্তিকর বিদয়াত রূপে আখ্যায়িত করেননি।

২. তাশাহুদ সম্পর্কে ইবনে মাসউদ রা. বর্ণিত হাদিসসমূহঃ

আমি তাশাহুদ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর যে হাদিস উদ্ধৃত করেছি সে সম্পর্কে আপনি বলেছেন যে, এর পরবর্তী কথাগুলোকে হাদিসের হাফেজগণ সর্বসম্মতভাবে ইবনে মাসউদের নিজস্ব বক্তব্য বলে রায় দিয়েছেন এবং আপনার মতে তা বর্ণনাকারীর ভুলের দরূণ রসূল সা.-এর বক্তব্য হিসেবে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে, হাদিসের কোন্ কোন্ হাফেজ এ অভিমত দিয়েছেন তা আমি জানি। কিন্তু তাদেরকে অত্যন্ত বিজ্ঞ ও দক্ষ হাদিস বিশারদরূপে স্বীকার করা সত্ত্বেও আমি তাদের অন্ধ অনুসারী নই যে, তারা এ শব্দগুলো সাহাবি কর্তৃক সংযোজিত হওয়ার ব্যাপারে একমত, এ কথা শোনা মাত্রই নিজেও তাকে সংযোজন বলে মেনে নেবো। যে

কারণে তারা এ রায় দিয়েছেন তা যুক্তিসঙ্গত কিনা তা বিচার বিবেচনা না করেই আমি এ রায় মেনে নিতে প্রস্তুত নই। প্রকৃত ব্যাপার হলো, এ হাদিসটি চারটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

একটি সূত্রের বর্ণনায় عبده ورسوله এরপরে اذا علت هذا কথাটা একেবারে লাগোয়াভাবে যুক্ত। এখানে এমন কোনো চিহ্নমাত্রও নেই যা দ্বারা ধারণা হতে পারে যে, এ কথা কয়টি রসূল সা.-এর নয় বরং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিজস্ব। এখানে এরূপ দাবি করার কোনো অবকাশ নেই যে, অমুক জায়গায় এসে রসূল সা.-এর বক্তব্য শেষ হয়ে গেছে এবং অমুক জায়গা থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বক্তব্য শুরু হয়েছে।

দ্বিতীয় সূত্রের বর্ণনায় হাদিসটি عبده ورسوله পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তী কথাগুলোর তাতে উল্লেখই হয়নি। কিন্তু এই উল্লেখ না হওয়া দ্বারা কোনো ভাবেই প্রমাণিত হয় না যে, প্রথমোক্ত বর্ণনায় যে বাড়তি কথাগুলো রয়েছে, তা সাহাবির নিজের পক্ষ থেকে জুড়ে দেয়া কথা।

তৃতীয় সূত্রের বর্ণনায় عبده ورسوله পরে قال অথবা ثُمَّ قَالَ (বললেন বা পুনরায় বললেন) কথাটা রয়েছে। এ قال বা ثم قال দ্বারা কোনোক্রমেই বুঝা যায় না যে, বক্তা কে। এর অর্থ রসূল সা. বললেন অথবা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন দুটোই হতে পারে। সম্ভাব্য এই দুটো অর্থের একটিকে অগ্রগণ্য মনে করার কোনো অবকাশ এই হাদিসে নেই।

চতুর্থ সূত্রের বর্ণনায় عبده ورسوله এরপর قال عبد الله বা قال ابن مسعود উল্লিখিত হয়েছে। তারপর فاذا فعلت কথাটা শেষ অবধি উদ্ধৃত হয়েছে। হাদিসের হাফেজদের যে দলটি এই শেষোক্ত ধরনের বর্ণনাকে সম্বল করে পূর্বোক্ত বর্ণনাগুলোকে রসূল সা.-এর উক্তির লাগোয়া কথাগুলোকে সাহাবির পক্ষ থেকে জুড়ে দেয়া কথা বলে সাব্যস্ত করেন, তাদের সুমহান মর্যাদার প্রতি পুরোপুরি স্বীকৃতি দিয়েও বলতে চাই যে, হাদিসের বর্ণনায় এ ধরনের রায় দেয়া হাদিস শাস্ত্রের মর্যাদাকে নিদারুণভাবে ক্ষুন্ন করে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. রসূল সা.-এর কাছ থেকে শুনে নিজেও এরূপ ফতোয়া দিতেন, এরূপ মত অবলম্বনে অসুবিধা কি ছিলো? প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতগুলোতে তিনি রসূল সা.-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এবং শেষোক্ত রেওয়ায়েতে তিনি রসূলের উক্তির অনুসরণে নিজস্ব ফতোয়া ব্যক্ত করেছেন। তার ফতোয়া যদি তাঁর বর্ণিত হাদিসের বিরুদ্ধে যেত, তাহলে অবশ্যই হাদিসটা সন্দেহজনক হয়ে পড়তো। কিন্তু তিনিতো অবিকল হাদিস মোতাবেকই ফতোয়া দিচ্ছেন।

৩. ইবনে মাসউদ রা. কি সূরা আহযাব সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন?

তৃতীয় প্রশ্নে আপনি যে আপত্তি ব্যক্ত করেছেন, তার সাথে আপনি এ কথাটাও একটু স্পষ্ট করে বলে দিন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. যে সময় কুফাতে আলকামা ও অন্যান্য শিষ্যকে তাশাহুদ সম্বলিত এ হাদিস শুনাচ্ছিলেন, তার আগেই সূরা আহযাব নাযিল হয়েছিল কিনা? যদি নাযিল হয়ে থাকে (সম্ভবত আপনিও অস্বীকার করতে পারবেন না যে হয়েছিল) তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ঐ সূরাটি সম্পর্কে

ওয়াকিফহাল ছিলেন কিনা? একথাটা আপনি স্পষ্ট করে বলে দিলেই আপনার আপত্তি আপনা থেকেই নিরসন হয়ে যাবে।

৪. দরূদ ও দোয়ার প্রচলিত শব্দের বাধ্যবাধকতা মানা কেন জরুরি নয়?

ইবাদাত সম্পর্কীয় কর্মকান্ডে (অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত কর্মকাণ্ড) সম্পর্কে যে সর্ববাদী সম্মত মূলনীতির কথা আপনি বলেছেন, আমিও তার জোরদার প্রবক্তা এবং বিশ বছর আগে নিজেই এ মূলনীতি বর্ণনা করেছি।[৩] তবে আপনার একথা সঠিক নয় যে, তাশাহুদের পরে যে সব দোয়া-দরূদ পড়ার রীতি চলে আসছে, তাও ঐ ধরনের জিনিস এবং তার অবিকল ঐ রকমই পড়া জরুরি। কেননা বুখারি, মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদে উদ্ধৃত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাশাহুদ পড়ার পর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য যে কোনো দোয়া নির্বাচনের অবাধ স্বাধীনতা নামাযীর রয়েছে।

৫. ইবাদাত পর্যায়ের কর্মকান্ডে রদবদল ঘটানো ও কমানো বাড়ানোর অবকাশ: এ ছাড়া হাদিসে একাধিক দৃষ্টান্ত এমন রয়েছে যা দ্বারা জানা যায় যে, এই মূলনীতির ব্যতিক্রমের অবকাশ আছে। শুধু যে বাড়ানোর দৃষ্টান্ত আছে তা নয় বরং পরিবর্তন করা ও কমানোর দৃষ্টান্তও বর্তমান। ঐ দৃষ্টান্তগুলো আমি সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

রদবদলের একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ: রদবদলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো আবু বকর রা.-এর আমলে। বিক্ষিপ্তভাবে বিরাজমান কুরআনকে গ্রন্থের আকারে বিন্যস্ত ও সংকলিতকরণে। বিশুদ্ধ হাদিস থেকে জানা যায় যে, রসূল সা. স্বীয় জীবদ্দশায় কুরআনকে লিপিবদ্ধ করিয়ে ছিলেন ঠিকই, তবে তা বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন টুকরো কাগজে, কাঠের ফলকে, খেজুরের ছালে, হাড্ডিতে এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিসে লেখা হয়েছিল এবং তা একটি থলিতে রক্ষিত ছিলো। রসূল সা. সূরা সমূহকে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করে কোথাও একত্রে সংকলিত করেননি। পরে আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর খেলাফতকালে যখন ইসলাম ত্যাগের হিড়িক পড়লো, তখন ইসলাম ত্যাগীদের সাথে লড়াইতে বিশেষত ইয়ামামার যুদ্ধে বহুসংখ্যক হাফেজ শহীদ হলেন। বুখারি, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালেসী এবং অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এ পরিস্থিতিতে ওমর রা. এই ভেবে শংকিত হয়ে পড়লেন যে, হাফেজরা যদি এভাবে শহীদ হতে থাকে, তাহলে কুরআনের বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে যাবে। আবু বকর রা.-এর কাছে তিনি এ আশংকার কথা ব্যক্ত করে মত দিলেন যে, আপনি কুরআনকে একত্রিত করার নির্দেশ দিন। আবু বকর রা. জবাব দিলেন: যে কাজ রসূল সা. করেননি তা আমি কিভাবে করতে পারি? ওমর রা. বললেন, هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ আল্লাহর কসম, এটা ভালো কাজ।' কথাটা তিনি বারবার বলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা আবু বকরের মন থেকে এ বিষয়ে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে দিলেন এবং তিনি ওমর রা.-এর মতের সাথে একমত হয়ে গেলেন। এরপর ওমর রা.-এর উপস্থিতিতে আবু বকর রা. যায়েদ বিন

৩. দেখুন: তাফহীমাত, তৃতীয় খন্ড: প্রবন্ধ 'আইন প্রণয়ন, শুরা ও ইজমা, প্রকাশকাল: মে-১৯৫৫।

সাবেত রা.-কে ডেকে কুরআন সংকলিত করার নির্দেশ দিলেন। যায়েদ রা. ও প্রথমে আবু বকর রা.-এর মতো প্রশ্ন তুললেন। তিনি বললেন, রসূল সা. যে কাজ করেননি, তা আপনারা কিভাবে করতে চাইছেন। উভয়ে তাকে জবাব দিলেন যে, هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ উভয়ে পিড়াপিড়ি করতে করতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ যায়েদ রা.-এরও বোধোদয় এবং তাঁর দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটালেন। এভাবে বহুসংখ্যক সাহাবির সহযোগিতায় কুরআন সংকলনের বিরাট ও মহান কাজের সূচনা হলো। ক্রমান্বয়ে সকল সাহাবাই জেনে ফেললেন যে, বর্তমান খলিফার তত্ত্বাবধানেই এ কাজ করা হচ্ছে। এখন লক্ষ্য করুন এ কাজটা যে কোনো দুনিয়াবি কাজ ছিলনা বরং ইবাদাতের পর্যায়ের কাজ ছিলো, তা সর্বজন বিদিত। সে জন্যই আবু বকর রা. ও যায়েদ বিন সাবেত রা. ওমর রা.-এর প্রস্তাব শুনা মাত্রই জবাবে বলেছিলেন যে, যে কাজ রসূল সা. করেননি, তা কিভাবে করা যায়? কিন্তু যে যুক্তিতে ওমর রা. এ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন এবং যে যুক্তির ভিত্তিতে আবু বকর রা. এবং যায়েদ রা. একাজকে শুধু বৈধই নয় বরং অপরিহার্য কর্তব্য বলে নিসংশয় হলেন, তা هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ 'আল্লাহর কসম, এটা ভালো' ছাড়া আর কিছু ছিলনা। এরপর যে কাজ সমাধা করা হলো তা স্পষ্টতই রদবদল ধরনের কাজ। কেননা এর মাধ্যমে কুরআনকে রসূল সা.-এর আমলের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থার অবসান ঘটিয়ে একত্রিত ও সংকলিত অবস্থায় রূপান্তরিত করা হলো। কিন্তু সে আমলেও কেউ এ কাজকে বিদআত বা ইসলামের নতুন জিনিসের প্রবেশ নামে আখ্যায়িত করেনি আর তারপর থেকে এ যাবতও একাজটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দীনি খিদমত হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

কমানোর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত: এবার কমানোরও একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন। বুখারি, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযি, আবু দাউদ প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থে প্রামাণ্যতম সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় নাযিল হয়েছে। শীর্ষস্থানীয় মনীষীগণ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, কুরআন শরীফ প্রথমে তো শুধু কুরাইশের ভাষায় নাযিল হয়। কিন্তু পরে যখন আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার ঘটতে লাগলো, তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবেদনক্রমে আরবের ৬টি বিশুদ্ধতম আঞ্চলিক ভাষায়ও তা পড়ার অনুমতি দেয়া হয়। এ সব আঞ্চলিক ভাষায় পড়াতে উচ্চারণ, ব্যাকরণ ও বাগধারার দিক দিয়ে এতো সামান্য পার্থক্য হয়, যা দ্বারা অর্থের তেমন কোনো ব্যবধান ঘটেনা। কিন্তু তাই এ অনুমতিটা এমন পাইকারী ছাড়পত্র ছিলনা যে, বিভিন্ন এলাকার লোকেরা নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষা অনুসারে কুরআনকে নিজেরাই বদলে ফেলতে পারবে। বরঞ্চ জিবরিল আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল সা.-কে বলে দিতেন কোন্ শব্দটাকে কুরাইশ ভাষা ছাড়া আরবের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষায় কিভাবে পড়তে হবে। সেই অনুসারে রসূল সা. মানুষকে কুরআন পড়া শিখাতেন। এ দিক দিয়ে সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় কুরআনের যে সাতটি কিরাত বা পঠনরীতি চালু হয়, তার সবই আল্লাহ প্রদত্ত এবং আল্লাহর তরফ থেকে নাযিলকৃত ছিলো। বুখারিতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

'জিবরিল প্রথমে আমাকে একটি মাত্র আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পড়িয়েছিলেন। এরপর আমি তার মাধ্যমে আরো বেশি সংখ্যক আঞ্চলিক ভাষায় পড়ার অনুমতি চাইতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় পড়ার অনুমতি দেয়া হলো।' মুসলিমের বর্ণনায় ইমাম যুহরীর বরাত দিয়ে এর উপর এতোটুকু সংযোজন করা হয়েছে যে, এই অনুমতি শুধু এমন আয়াত ও শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো, যা দ্বারা হালাল ও হারামের পার্থক্য হতোনা। মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযি ও তাবারী উবাই বিন কাবের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন এই মর্মে যে, এই নমনীয়তা প্রদর্শন করা হয়েছে হিজরতের পরে। এই রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, মদিনার 'আদাতি বনি গিফার নামক স্থানে জিবরিল আ. রসূল সা.-এর নিকট এলেন এবং বললেন যে, আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আপনি স্বীয় উম্মতকে একই আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পড়ান।

রসূল সা. বললেন, আমি এই নির্দেশে নমনীয়তার আবেদন জানাচ্ছি। কেননা এটা আমার উম্মাতের সাধ্যের বাইরে। (অর্থাৎ যারা আরবি ভাষার একটা বিশেষ উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় অভ্যস্ত, তাদের শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলের পক্ষে অন্য কোনো উপভাষায় কুরআন পড়া দুরূহ ব্যাপার।) এরপর 'জিবরিল দুটো এবং তার পরে তিনটে উপভাষায় অনুমতি নিয়ে এলেন। রসূল সা. আরো অধিক উপভাষার অনুমতি চাইতে থাকলেন।

অবশেষে জিবরিল এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে সাতটা আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে থেকে যে আঞ্চলিক ভাষাতেই লোকে কুরআন পড়বে, তা শুদ্ধ হবে।

মুসলিম, নাসায়ী এবং তাবারীতে উবাই বিন কাব-এর আরো একটা বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে তিনি জানান যে, একবার তাঁর উপস্থিতিতে পরপর দুজন মানুষ মসজিদে নববীতে এলো এবং রসূল সা. যে নিয়মে উবাই বিন কাব রা. কে কুরআন পড়া শিখিয়েছিলেন তারা উভয়ে তার বিপরীত নিয়মে কুরআন পড়লো। এমনকি তাদের দুজনের পড়া পরস্পরের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছিলো। উবাই রা. উভয়কে সাথে নিয়ে রসূল সা.-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাদের কুরআন পাঠের এই পার্থক্যের কথা জানালেন।

রসূল সা. উভয়ের কুরআন পাঠ শুনলেন এবং উভয়ের পড়াকে শুদ্ধ বলে রায় দিলেন। উবাই রা. বলেন, একথা শোনার পর আমার মনে এমন এক প্রত্যাখ্যান প্রবণতার উদ্ভব হলো, যা জাহেলিয়াত যুগেও আমার মধ্যে ছিলনা।' তাবারীর বর্ণনা অনুসারে তিনি বলেন, 'আমি নিজের ভেতরে এমন একটা শয়তানী প্ররোচনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে বলে টের পেলাম, যার দরুন আমার মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেলো।' এ অবস্থা দেখে রসূল সা. আমার বুকে একটা থাপ্পড় মারলেন। সেই থাপ্পড়ের চোটে আমি ঘেমে উঠলাম। তারপর তিনি বললেন, কুরআন সাতটি উপভাষায় নাযিল হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটাই সঠিক ও যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে আরো

একটা হাদিস বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি ও নাসায়ীতে ওমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন, আমি একদিন হিশাম বিন হাকিম বিন হিযাম[৪] কে সূরা ফুরকান পড়তে শুনলাম। আমি দেখলাম, রসূল সা. আমাকে যেভাবে কুরআন পড়া শিখিয়েছেন, হিশামের পড়া তা থেকে ভিন্ন রকমের। অপর এক বর্ণনা অনুসারে ওমর রা. বলেনঃ আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এভাবে কুরআন পড়া তোমাকে কে শিখিয়েছে? তিনি বললেন, রসূল সা. শিখিয়েছেন। আরেক বর্ণনা মতে, ওমর রা. বলেনঃ আমি তার হাত ধরে রসূল সা.-এর কাছে নিয়ে গেলাম। আর একটা বর্ণনা অনুসারে ওমর রা. বলেনঃ আমার মনে হচ্ছিলো এক্ষুণি লোকটাকে পাকড়াও করি। কিন্তু তার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করলাম। তারপর তাকে রসূল সা.-এর কাছে ধরে নিয়ে গেলাম। এক বর্ণনায় এ কথাও আছে যে, আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু তার সালাম ফেরানো পর্যন্ত আত্মসংবরণ করে রইলাম। তারপর তাকে রসূল সা.-এর কাছে ধরে নিয়ে গেলাম। পরবর্তী ঘটনার বিবরণ সব রেওয়ায়েতে একই রকম। রসূল সা. প্রথমে হিশামের পড়া শুনলেন এবং বললেন, ঠিক আছে। সূরাটা এভাবেই নাযিল হয়েছে। তারপর তিনি ওমর রা-এর পড়া শুনলেন এবং বললেন, ঠিক আছে, এটা এভাবেই নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে, কুরআন সাতটা আঞ্চলিক ভাষাতেই নাযিল হয়েছে। কাজেই যেভাবে সহজ মনে করো, সেভাবেই পড়ো।

এইসব রেওয়ায়েত থেকে দুটো কথা প্রমাণিত হয়। প্রথমত সাত উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাতে কুরআন পড়া আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত ছিলো। এর প্রত্যেকটাতেই কুরআন নাযিল হয়েছিল। লোকেরা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো নিজ নিজ উপভাষায় কুরআনকে রূপান্তরিত করে নিতো না। বরং রসূল সা. স্বয়ং প্রত্যেক উপভাষায় কুরআন পড়া জনগণকে শিখিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত কুরআন পড়ার এই বিভিন্নতায় স্বয়ং রসূল সা.-এর সামনেই ঝগড়া শুরু হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তিনি এই বিভিন্ন রকমের তেলাওয়াতকে সমর্থন করেন ও বহাল রাখেন। ঝগড়া বিবাদের কারণে শুধু কুরাইশদের উপভাষা বহাল রেখে বাদবাকী সকল উপভাষায় পড়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি।

এবার ওসমান রা.-এর আমলের ব্যাপারটা একটু বিবেচনা করুন। তিনি যে কুরআন সংকলন করেছিলেন, সে সম্পর্কে ইবরাহীম বিন সাদ, যুহরী ও আনাস বিন মালেক রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য হাদিস। এতে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান আরমেনিয়া ও আযারবাইযান অভিযান থেকে ফিরে এসে আমীরুল মুমিনীনের কাছে উপস্থিত হলেন। কুরআনের রকমারী তেলাওয়াত দেখে তিনি খুবই মর্মাহত ছিলেন। এসেই তিনি বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন আল্লাহর কিতাব নিয়ে ইহুদি ও নাসারাদের মতো মতভেদে লিপ্ত হওয়ার

---

৪. এই ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। কাজেই ওমর রা.-এর বর্ণিত এ ঘটনা বিজয়োত্তর কোনো সময়কার ঘটনা হবে।

আগে মুসলমানদেরকে আপনি সামাল দিন।' এ কথা শুনার পর ওসমান রা. উম্মুল মুনিনীন হাফসার কাছে বার্তা পাঠালেন যে, আপনার কাছে কুরআনের যে পুস্তিকাসমূহ রয়েছে, তা আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি ওগুলো সংকলিত করার পর আপনাকে ফেরত দেবো।[৫] হাফসা রা. পাঠিয়ে দিলেন। তারপর উসমান রা. ঐ পুস্তিকাগুলোকে একত্রে সংকলিত করার জন্য যায়েদ বিন সাবেত রা., আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা., সাইদ বিন আস রা. এবং আব্দুর রহমান বিন হারেস বিন হিশাম রা. কে নির্দেশ দিলেন। তিনি বলে দিলেন, যেখানে যায়েদ বিন সাবেতের সাথে উক্ত তিন কুরাইশী সাহাবির মতবিরোধ হবে, সেখানে কুরাইশ উপভাষাতেই সংকলন করতে হবে। কেননা কুরআন মূলত কুরাইশী ভাষাতেই নাযিল হয়েছিল। অতঃপর এই সংকলিত পুস্তকের এক একটি কপি বিভিন্ন অঞ্চলের কেন্দ্রীয় স্থানে পাঠানো হয় এবং আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, কুরআনের যে কপি এই প্রামান্য কপির বিরোধী হবে, তা যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়।[৬]

এ ক্ষেত্রে আপনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে, কুরাইশদের ভাষা ছাড়া অন্য ছয়টি আঞ্চলিক ভাষার কিরাত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও নাযিলকৃত এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিখানো কিরাত হওয়া সত্ত্বেও উম্মতকে কুরআনের শব্দ ও ভাষার পার্থক্য জনিত বিভ্রাটের আশংকা থেকে মুক্ত করার স্বার্থে সেগুলোকে বাতিল করা হয়। ওসমান রা.-এর এ কাজটির প্রতি সমগ্র মুসলিম জগত ঐক্যমত্য পোষণ করেছে এবং এটিকে তাঁর অন্যতম মহৎকীর্তি বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু এ দ্বারা এ কথাতো অকাট্যভাবেই প্রমাণিত হয় যে, ইবাদত সংক্রান্ত ব্যাপারে শুধু বাড়ানো নয় বরং কমানোরও দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং তাকে কোনো শরিয়তাভিজ্ঞ লোক বিদয়াত মনে করেননি। হাফেজ ইবনে হাজার ইবনে আবু দাউদের বরাত দিয়ে সুয়াইদ বিন গাফলার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, ওসমান রা. এ কাজ সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেই করেছিলেন। কিন্তু এতে ব্যাপারটা আরো মজবুত হয় বৈকি। কেননা সাহাবায়ে কেরামের শরিয়তের বিরুদ্ধে পরামর্শ দেয়ার কোনো অধিকারই ছিলনা। কাজেই তাঁরা যখন সাতটা নির্ধারিত কিরাতের ছয়টিকে বিলুপ্ত করার এবং একটিকে বহাল রাখার পক্ষে মত দিলেন, যদিও আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ তার পক্ষে ছিলনা, তখন এর অর্থ দাঁড়ালো, ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণার্থে এরূপ করা তাদের মতে শরিয়তের দৃষ্টিতে শুধু বৈধই

---

৫. আবু বকর রা. যে কুরআন লিপিবদ্ধ করান, তা হাফসার কাছে সংরক্ষিত ছিলো। এই রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তা ছোট ছোট পুস্তিকার আকারে ছিলো। কিন্তু অন্য রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, ওটা একখানা পুস্তকই ছিলো। জ্ঞানীজনদের কাছে এটাই অধিক প্রসিদ্ধ যে, আবু বকর রা. কুরআনকে একখানা পুস্তকের আকারে গ্রোথিত করেছিলো। ইমাম বদরুদ্দীন যারাকশী আল বুরহান গ্রন্থে এবং ইমাম সুয়ুতী আল ইতকানে এটাই সঠিক বলেছেন।

৬. মোট কয়টি পুস্তক তৈরি করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে এটাই প্রসিদ্ধ যে, পাঁচটি কপি করা হয়েছিল। একটি মদিনায় রাখা হয়। বাকীগুলো অন্যান্য কেন্দ্রীয় স্থানে প্রেরণ করা হয়। তবে আবু হাতেম সাজিস্তানীর বর্ণনা হলো, সাতটি কপি তৈরি করা হয়েছিল। তম্মধ্যে একটি মদিনায় রেখে বাকীগুলো মক্কায়, সিরিয়ায়, ইয়েমেনে, বাহরাইনে, বসরায় ও কুফায় পাঠানো হয়। এই শেষোক্ত মতটিই সঠিক বলে মনে হয়।

ছিলনা বরঞ্চ ইসলামে বিভ্রান্তি ও ফেৎনার সম্ভাবনা রোধ করার জন্য তা ওয়াজিবও ছিলো। যদিও আপাতদৃষ্টিতে কাজটা ইসলামের অভ্যন্তরে একটা অভিনব ব্যাপার উদ্ভাবনেরই নামান্তর ছিলো। (তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বরঃ ১৯৭৫)

০৮. দরূদে 'সাইয়িদুনা' ও 'মাওলানা' শব্দ যোগ সংক্রান্ত আলোচনা-২

সংযোজনের দৃষ্টান্তসমূহ: এবার ইবাদত সংক্রান্ত ও আল্লাহর নির্ধারিত কর্মকাণ্ডে বাড়তি জিনিস যোগ করা এবং নামাযের প্রচলিত ও নির্ধারিত দোয়া কালামে নতুন শব্দ সংযোজনের যে সব দৃষ্টান্ত হাদিসে পাওয়া যায়, সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

নির্দেশ আসার আগে মদিনায় জুময়ার নামায প্রতিষ্ঠা: আবদ বিন হামিদ, ইবনুল মুনযির এবং আব্দুর রাজ্জাক ইবনে সিরীয় থেকে যে সব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, রসূল সা. মদিনায় পৌছার আগে এমনকি জুময়া ফরয হওয়ারও আগে মদিনায় আনসারগণ পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্থির করেন যে, ইহুদি ও খৃষ্টানরা যেমন সপ্তাহে একদিন সামষ্টিক ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছে, তেমনি আমরাও একদিন এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেই। অতঃপর তারা এজন্য জুময়ার দিন নির্ধারণ করলো এবং এর প্রাচীন নাম 'ইয়াওমুল আরাবা' বাদ দিয়ে নতুন নাম রাখলেন 'জুময়া'। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথম জুময়ার নামায পড়ান আসয়াদ বিন যুরারাহ। কাব ইবনে মালিক থেকে তাঁর পুত্র আব্দুর রহমানের যে রেওয়ায়েত আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, হাসেম, বায়হাকী ও দারকুতনী বর্ণনা করেছেন তা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এতে তিনি বলেন, আসয়াদ বিন যুরারাহ সর্বপ্রথম জুময়া চালু করেন এবং তাতে ৪০জন লোক যোগ দিয়েছিলো। দারকুতনীতে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা হলো, জুময়ার নির্দেশ হিজরতের আগেই মক্কায় নাযিল হয়। সে সময় মক্কায় জুময়া চালু করা সম্ভব ছিলনা। এ জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসয়াব বিন উমায়েরকে চিঠি লিখে নির্দেশ দেন, তোমরা মদিনায় জুময়া চালু করে দাও। তাবরানীতে আবু মাসউদ আনসারী রা.-এর রেওয়ায়েত এই যে, এই নির্দেশ মোতাবেক মুসয়াব সর্বপ্রথম যে জুময়ার নামায পড়ান, তাতে ১২ জন অংশগ্রহণ করে।[৭]

এখানে লক্ষ্য করুন, সাহাবাদের একটি দল পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্ব উদ্যোগে একটা নতুন নামাযের সংযোজন ঘটালো। রসূল সা.-এর জীবদ্দশায় এ ঘটনা ঘটে। অথচ এতে তিনি কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। বরঞ্চ আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই নামাযকেই ফরয করার আদেশ নাযিল হয়। ফলে যে নামায আদেশ আসার আগেই চালু করা হয়েছে, তাকে আদেশ অনুসারে স্থায়ীভাবে চালু করা হয়।

রসূল সা.-এর উপস্থিতিতে নির্ধারিত দোয়ায় নতুন শব্দ সংযোজন বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী, তাবরানীতে রিফায়া বিন রাফের বর্ণনা এই মর্মে

---

৭. প্রশ্ন হতে পারে যে, নির্দেশ আসার আগে আনসারগণ নিজস্ব উদ্যোগে যে জুময়ার আয়োজন করেন, তাতে প্রথম দিন চল্লিশজন যোগ দিলো। আর নির্দেশ আসার পর যে জুমায়ার আয়োজন করা হলো তাতে মাত্র ১২ জন শরিক হলো। এর কারণ কি হতে পারে? এর জবাব হলো, নির্দেশটা মক্কা থেকে মদিনায় পাটানো হয়েছিল। এমনও হতে পারে যে, দূত জুময়ার দিনেই সেখানে পৌছেছে এবং সময়মত তা জনগণের সামনে ঘোষণা করা সম্ভব হয়নি।

উদ্ধৃত হয়েছে যে, একদিন আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়ছিলাম। রুকু থেকে মাথা তুলে যখন রসূল সা. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললেন, তখন পেছন থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলো: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ নামায শেষে রসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, এইমাত্র এ কথাটা কে বললো? ঐ ব্যক্তি বললো ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি বলেছি। রসূল সা. বললেন, 'আমি দেখতে পেলাম, ত্রিশ জনেরও বেশি ফেরেশতা এই দোয়া লেখার জন্য পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।' এ ক্ষেত্রেও আপনি দেখুন যে, ঐ সাহাবি রসূল সা.-এর শেখানো দোয়াতে কয়েকটি শব্দ নিজে নিজেই বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই বাড়তি শব্দগুলো রসূল সা. শেখাননি। নির্ধারিত শব্দের উপর এই অতিরিক্ত শব্দগুলো তিনি রসূল সা.-এর উপস্থিতিতে তাঁর পেছনে নামায পড়ার সময় যোগ করেছিলেন। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে তো রসূল সা.-এর প্রবল অসন্তোষ প্রকাশ করার কথা ছিলো এবং তাকে ধমকানোর কথা ছিলো যে, তুমি প্রচলিত নির্ধারিত শব্দের উপর নিজের পক্ষ থেকে কয়েকটা শব্দ যোগ করে শরিয়ত বিরোধী কাজ করেছো, তুমি আমার সামনে ইসলামের ভেতরে একটা নতুন নিয়ম উদ্ভাবনের ধৃষ্টতা দেখিয়েছো। তোমার যোগ করা শব্দগুলো যদি আমার অভিপ্রেত হতো তাহলে আমি তা শেখাতাম। তুমি নামাযের দোয়ার মধ্যে এগুলো ঢুকানোর অধিকার কোথা থেকে পেলে? কিন্তু তার কিছুই না বলে রসূল সা. তাকে সমগ্র জামায়াতের সামনে এই বলে অভিনন্দিত করলেন যে, তোমার শব্দগুলো এতো মূল্যবান ছিলো যে, ফেরেশতারা তা লেখার জন্য ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছেন এবং ঐ শব্দগুলো লেখার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য প্রত্যেকেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

তাশাহুদের প্রচলিত ভাষ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের সংযোজিত শব্দাবলীর কথা আমি আগেই আলোচনা করেছি। সেই সাথে আমি একথাও বলেছি যে, এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আপনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা একেবারেই নিরর্থক।

একটা নতুন আযান প্রবর্তন: মুসনাদে আহমাদ ও নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে যে, জুময়ার দিন যখন রসূল সা. মিম্বরে আরোহণ করতেন, তখন বিলাল আযান দিতেন এবং রসূল সা. মিম্বার থেকে নামলে তিনি ইকামাতের তাকবীর বলতেন। (এ দুটোকেই আযান বলা যেতে পারে এবং রসূল সা.-এর আমলেই তা প্রবর্তিত হয়।) বুখারি, নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে মাজায় সায়েব বিন এজিদের রেওয়ায়েত এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল সা. এবং আবু বকর রা. ও ওমর রা.-এর আমলে ইমাম মিম্বারে এসে বসলে জুময়ার প্রথম আযান দেয়া হতো। এরপর ওসমান রা.-এর আমলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তিনি তৃতীয় আযানের (অর্থাৎ যে আযান ইমামের মিম্বারে আরোহণের আগে দেয়া হয়।) নির্দেশ দিলেন। এই আযান দেওয়া হতো যারা নামক স্থানে।[৮]

---

৮. এটি ছিলো মদিনার বাজারে অবস্থিত একটি উচ্চ ঘর। এর ছাদের উপর দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিন আযান দিতো, যাতে অনেক দূর পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছে যায়।

বুখারির আরেকটি রেওয়ায়েতের ভাষা এরূপ: তৃতীয় আযান প্রবর্তনকারী ছিলেন ওসমান রা.। সে সময় মদিনার লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিলো। তাবরানীর বর্ণনা হলো, যাওরা নামক স্থানে প্রথম আযান দেয়ার জন্য ওসমান রা. নির্দেশ দেন। তারপর তিনি যখন মিম্বারে বসতেন তখন তাঁর মুয়াজ্জিন আযান দিতো। আর মিম্বার থেকে নামলে মুয়াজ্জিন ইকামাতের তাকবীর বলতো। এ কাজটা ইবাদাত সম্বন্ধীয় কর্মকান্ডের গন্ডীতে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে প্রচলিত রীতিতে একটা সুস্পষ্ট সংযোজন। একজন হকপন্থী খলিফা এমন এক সময় এই সংযোজনের কাজটি করেছিলেন যখন মুসলিম জগত সাহাবা ও তাবেঈন পরিপূর্ণ ছিলো। অথচ এর বিরোধিতা তো দূরের কথা, ইসলামি দুনিয়ার সর্বত্র তা জনপ্রিয় হয়ে গেলো। তবে ইবনে আবি শায়বার বর্ণনা অনুসারে একমাত্র ইবনে ওমর রা. এই কাজটিকে বিদয়াত বলেছিলেন। তবে হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, 'ইবনে ওমর রা.-এর এ মন্তব্যের পেছনে এ সম্ভাবনাও থাকতে পারে যে, তিনি এটিকে খারাপ মনে করেই বিদয়াত বলেছেন। আবার এমনও হতে পারে যে, শুধুমাত্র রসূল সা.-এর আমলে এটা চালু ছিলনা বলেই বিদয়াত বলেছেন, রসূল সা.-এর আমলে যা চালু ছিলনা তাকেই বিদয়াত নামে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু এ ধরনের কাজের মধ্যে কতোক ভালো এবং কতোক খারাপ হয়ে থাকে।' হাফেজ ইবনে হাজারের এই অভিমতের পক্ষে একটা যুক্তিও রয়েছে। স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. ইতিপূর্বে একটা 'ভালো বিদয়াত' করেছিলেন। তাছাড়া আরো একটা কাজকেও তিনি বিদয়াত নামে আখ্যায়িত করে তার প্রশংসাও করেছিলেন। এর উল্লেখ সামনে আসছে।

ইবনে ওমর রা. কর্তৃক চাসতের নামাযকে 'ভালো বিদয়াত' আখ্যা দান: চাসতের নামায রসূল সা.-এর বাস্তব কাজ দ্বারাই সুন্নত বলে সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত। তবে এটা নিয়মিতভাবে বা মসজিদে গিয়ে পড়ার রীতি রিসালাত যুগে চালু ছিলনা। পরবর্তীকালের লোকেরা এ রীতি প্রবর্তন করেন। এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'ওটা বিদয়াত, তবে ভালো বিদয়াত' (ইবনে আবি শায়ক)। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি বলেছিলেন, 'এটা একটা নতুন উদ্ভাবিত রীতি। তবে মানুষ যেসব ভালো রীতি উদ্ভাবন করেছে এটা তার একটা' (সাইদ বিন মানসুর) তৃতীয় আরেক রেওয়ায়েতে তার উক্তি, 'মানুষের উদ্ভাবিত জিনিসগুলোর মধ্যে আমার কাছে এর চেয়ে প্রিয় কিছু নেই।' (আব্দুর রাজ্জাক)। এই তিনটে রেওয়ায়েতই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত (দেখুন ফাতহুল বারী, বাব সালাতুদ্দুহা)।

ওমর রা. কর্তৃক তারাবীহকে 'ভালো বিদয়াত' আখ্যা দান: তারাবীহর নামাযও রসূল সা.-এর কাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তাই এটা যে একটা সুন্নত সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু এ নামায মসজিদে একই ইমামের পেছনে পড়া এবং তা জামাত সহকারে পড়ার সাধারণ ও সার্বজনীন রীতি ওমর রা. নিজ খেলাফত আমলে চালু করেন। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ছিলো: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ (এটা একটা চমৎকার বিদয়াত) এ কাজটাও ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয়ে শরিয়ত প্রণেতার প্রবর্তিত রীতিতে

নতুন সংযোজন ছিলো। কিন্তু ওমর রা.-এর মতো কঠোর সুন্নত অনুসারী ও খলিফা এটাকে নতুন রীতি জানা সত্ত্বেও ভালো রীতি মনে করে চালু করেছিলেন। সাহাবা, তাবেঈন, মুজতাহিদ ইমামগণ, ফকিহগণ ও মুহাদ্দিসগণ সকলেই নির্বিবাদে তার অনুকরণ করেন।

দরূদে সাইয়েদুনা ও মাওলানা শব্দের ব্যবহার: এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইবাদত জাতিয় কর্মকান্ডে রদবদল ও হ্রাসবৃদ্ধিকে একেবারে নিষিদ্ধ এবং এই সর্বব্যাপী মূলনীতিতে আদৌ কোনো ব্যতিক্রম চলবেনা, এরূপ মত পোষণ করা এমন এক উগ্র মনোভাব, যা সহীহ হাদিস দ্বারা সমর্থিত নয়। এরপর আমাদের দেখতে হবে যে, দরূদের নির্ধারিত ও প্রচলিত দোয়ায় 'সাইয়িদুনা ও মাওলানা শব্দের সংযোজন কি বাস্তবিকই নাজায়েজ ও নিষিদ্ধ? তবে আমি আলোচনার শুরুতেই একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে, আমি দরূদে শুধু সেই সব শব্দই বাড়ানো জায়েয মনে করি, যা সাধারণভাবে খোদ রসূল সা.-এর জন্য এবং অন্যান্যের জন্য ব্যবহার করা শরীয়তসম্মত, চাই তা দরূদের নির্ধারিত প্রচলিত দোয়ায় অন্তর্ভুক্ত থাক বা না থাক।

দরূদের প্রচলিত দোয়ায় ইবনে মাসউদ রা. যা যোগ করেছেন: আপনার একথা ঠিক যে, হাদিস থেকে রসূল সা.-এর যতোগুলো দরূদ জানা গেছে, তাতে সাইয়েদুনা শব্দ নেই। তবে এ দাবি ঠিক নয় যে, কোনো সাহাবি থেকে এমন কোনো দরূদ আদৌ প্রমাণিত হয়নি। এ দাবি হাফেজ ইবনে হাজার করে থাকলেও তা যথার্থ নয়। ইবনে হাজার দরূদ সংক্রান্ত অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের এ উক্তি উদ্ধৃত রয়েছে যে: 'তোমরা রসূল সা.-এর উপর দরূদ পাঠালে ভালো দরূদ পাঠাও। কেননা তোমরা জাননা, হয়তো তোমাদের দরূদ রসূল সা.-এর কাছে হাজির করা হয়।' লোকেরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে বললো, সেই ভালো দরূদটা আমাদেরকে শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন এভাবে দরূদ পড়ো: 'হে আল্লাহ, তোমার করুণা, রহমত ও বরকত নাযিল করো রসূলদের সরদার পরহেজগারদের নেতা, শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর, যিনি তোমার বান্দাহ ও রসূল, যিনি সততা ও কল্যাণের নেতা ও পথপ্রদর্শক এবং করুণার নবী। হে আল্লাহ, তুমি তাকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও, যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবমণ্ডলীর ঈর্ষার বস্তু।' এরপর ইবনে মাসউদ রসূল সা.-এর শিখানো বহুল প্রচলিত দরূদ পড়লেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের এই উক্তির সঠিক তাৎপর্য একটি উদাহরণ দ্বারা ভালোভাবে বুঝা যাবে। কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি কারুর বাড়িতে যায় এবং বাড়িওয়ালার ভৃত্যকে নিজের আগমনের খরব জানাতে বলে, তখন আগন্তুক নিজের মুখ দিয়ে একথা বলে না যে, 'তোমার মনিবকে জানাও মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব শুভাগমন করেছেন।'বরং আগন্তুক বলে, 'আব্দুর রহমান এসেছে।' এখন বাড়িওয়ালাকে জানাতে গিয়ে গৃহভৃত্য আগন্তুকের মর্যাদার সাথে মানানসই ভাষা ব্যবহার করবে, না আগন্তুক যা বলেছে অবিকল তাই বলবে, সেটা ভৃত্যের আদব তমিজ ও মর্যাদাবোধের উপর নির্ভর করে।

উপরোক্ত রেওয়ায়েতের বর্ণনাকারীরা সকলেই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। ইবনে মাসউদ রা.-এর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ শ্রোতা হিসাবে যিনি এ হাদিস বর্ণনা করেছেন, তার নাম আসওয়াদ বিন এজিদ। তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী। তাঁর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা কারোর সাক্ষ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। তাঁর কাছ থেকে যিনি বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন আবু ফাখতা সাইয়েদ বিন ইলাকা। হাফেজ ইবনে হাজার স্বীয় গ্রন্থ তাকরীবে তাকে বিশ্বস্ত বলে রায় দিয়েছেন। অতঃপর আবু ফাখতার কাছ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আওন বিন আব্দুল্লাহ। ইমাম আহমাদ, ইয়াহিয়া বিন মাঈন, আজালী ও নাসায়ী তাঁর বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

অতঃপর আওন থেকে বর্ণনা করেছেন আল মাসউদী আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ। এই শেষোক্ত রাবীই কিছুটা বিতর্কিত। তাঁকে কেউ কেউ বিকৃত মস্তিষ্ক আখ্যায়িত করে তার এ রেওয়ায়েতটিকে গ্রহণের অযোগ্য বলে থাকেন। অথচ উলামায়ে রিজাল (সনদ বিশেষজ্ঞগণ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। কেবল শেষ বয়সে মানসিক জটিলতার শিকার হন। ইমাম আহমদ এবং ইবনে আম্মার বলেন, কুফা ও বসরায় তার কাছ থেকে যেসব রেওয়ায়েত লোকে শুনেছে, তার সবই বিশুদ্ধ ও নির্ভুল। তবে বাগদাদ যাওয়ার পর তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ইবনে আবু হাতেম স্বীয় পিতা আবু হাতেমের উক্তি উদ্ধৃত করেন যে, মৃত্যুর দুই এক বছর আগে তিনি এই মানসিক জটিলতায় আক্রান্ত হন। ইবনে মাঈন বলেন, কাসেম ও আওন বিন আব্দুল্লাহ থেকে মাসউদী যেসব হাদিস বর্ণনা করেন তা বিশুদ্ধ। ইবনে উয়াইনা বলেন, আমার জানামতে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের তত্ত্বজ্ঞান মাসউদীর মতো আর কেউ শেখেনি। উলামায়ে রিজালের এই সাক্ষ্য দেখে অনুমান করা যেতে পারে যে, স্বার্থবিরোধী হাদিসগুলোকে কিরূপ নির্মমভাবে অগ্রাহ্য করা হয়ে থাকে।

রসূল সা. কি সত্যিই নিজের জন্য সাইয়েদ শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিলেন?: আপনার এ কথা মোটেই ঠিক নয় যে, রসূল সা. নিজের জন্য সাইয়েদ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন। কথাটা হাদিসকে না বুঝা এবং হাদিসের প্রেক্ষাপট না জেনে তার দ্বারা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ। ব্যাপারটার প্রকৃত রহস্য হলো রসূল সা. তোষামোদ এবং কারোর মুখের উপর তার প্রশংসা করাকে অত্যধিক অপছন্দ করতেন। বোখারি ও আবু দাউদে আবু বকর রা.-এর রেওয়ায়েত হলো, এক ব্যক্তি রসূল সা.-এর সামনে আর এক ব্যক্তির প্রশংসা করলো। তিনি তিনবার (অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে কয়েকবার) বললেন, 'তুমি তো তোমার বন্ধুর গলা কেটে দিলে।' তারপর তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে, তোমাদের কেউ যদি নিজের ভাই এর প্রশংসা করতেই চায় যা সে বলতে চায়, তা তার ভেতরে সত্যই আছে বলে জানে, তাহলে তার এভাবে বলা উচিত যে, 'আমি তাকে এ রকম মনে করি।' আর সেই সাথে একথাও বলা উচিত যে, তার সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানতো আল্লাহরই রয়েছে। আমি তাকে নির্দোষ বলতে আল্লাহকে বাধ্য করতে পারিনা।

এ বিষয়টা দৃষ্টিপাতে রাখুন এবং তারপর যে রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে বলা হয় যে, রসূল সা. নিজের জন্য 'সাইয়েদ' শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন তাও দেখুন। মুসনাদে আহমদে আনাস বিন মালেকের রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূল সা.-এর কাছে এসে বললোঃ 'হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হে আমাদের সরদার এবং সরদারের পুত্র হে আমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি এবং শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির পুত্র।' এ কথা শুনে রসূল সা. বললেন, 'হে জনমণ্ডলী, তোমরা সংযত আচরণ বজায় রাখো। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিপথে চালিত করতে না পারে। আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ, আল্লাহর বান্দাহ ও রসূল। আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, তা থেকে তোমরা আমাকে উর্ধ্বে তোলার চেষ্টা করো এটা আমি চাইনা। এর সাথে সাথে সেই রেওয়ায়েতটাও দেখুন যার ভিত্তিতে আপনি সাইয়েদ শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার তারিখ ১ম হিজরি নির্দিষ্ট করেছেন। মুসনাদে আহমাদে তিন জায়গায় এবং আবু দাউদের আদব সংক্রান্ত অধ্যায়ে এক জায়গায় উল্লেখ আছে যে, বনু আমেরের প্রতিনিধি দল রসূল সা.-এর কাছে হাজির হলো। এই প্রতিনিধি দলে মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ বিন আশ্‌শুখাইরের পিতাও ছিলেন। মুতাররিফ স্বীয় পিতার দেয়া বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। তার পিতা বলেনঃ আমরা উপস্থিত হয়ে রসূল সা.-কে সালাম করলাম এবং বললামঃ 'আপনি আমাদের অভিভাবক, আপনি আমাদের সাইয়েদ (সরদার), আপনি আমাদের প্রতি সর্বাধিক কৃপাকারী, সর্বাধিক দাতা এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য পরিবেশক।' তার এই তোষামোদী বাচনভঙ্গী দেখে, তার আপনি আমাদের সাইয়েদ, এই উক্তির জবাবে বললেন, 'সাইয়েদ তো আল্লাহ তায়ালা।' এরপরও যখন তিনি তোষামোদী কথাবার্তা বলতে থাকলেন, তখন রসূল সা. বললেন, তোমার যা বলার আছে তা বলো। শয়তান যেন তোমাকে নিজের দুরভিসন্ধি উদ্ধার করার জন্য ব্যবহার করতে না পারে।

এই উক্তিকে যুক্তি হিসেবে দাড় করিয়ে রসূল সা. নিজের জন্য সাইয়েদ শব্দের প্রয়োগ নিষিদ্ধ করেছেন বলে রায় দেয়াটা হাদিস জানা ও বুঝার কোনো ভালো দৃষ্টান্ত নয়। রসূল সা.-এর 'সাইয়েদ তো আল্লাহ তায়ালা' উক্তিটার মর্ম যদি এরূপ গ্রহণ করা হয় যে, আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাইয়েদ বলা যাবেনা, তাহলে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মানুষকে যে সব হাদিসে সাইয়েদ বলা হয়েছে সেই সাথে আল্লাহর বিশেষ নামগুলোর সাথে 'সাইয়েদ' শব্দটাও যোগ করতে হবে। অথচ এটাকে কেউ আল্লাহর নাম হিসেবে গণ্য করেনি কিন্তু কথাটার মর্ম যদি শুধু এ রূপ গ্রহণ করা হয় যে, অন্য সকলের বেলায়তো এ শব্দ প্রয়োগ করা যায় কিন্তু রসূল সা.-এর বেলায় এর ব্যবহার নিষিদ্ধ, তাহলে এটা হবে একেবারেই ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা। কেননা যে উক্তিটাকে আপনি যুক্তি হিসেবে দাঁড় করাচ্ছেন, কোনক্রমেই তার এ অর্থ হয়না। তাছাড়া এ মতটা এ কারণেও ভ্রান্ত যে, তোষামোদ ছাড়া অন্য কোনো ভঙ্গিতে রসূল সা. কে সাইয়েদ বলে সম্বোধন করলে তিনি তা করতে নিষেধ করেননি। এ প্রসঙ্গে মুসনাদে আহমাদে উদ্ধৃত নাদলা বিন তারিখের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। এতে বলা হয়েছে, তার গোত্রের জনৈক আব্দুল্লাহর স্ত্রী স্বামীর উপর রাগ করে পালিয়ে গেলো এবং একই

গোত্রের মুতাররিফ বিন বাহসালের বাড়িতে গিয়ে উঠলো। আব্দুল্লাহ গিয়ে মুতাররিফের কাছে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানালে সে প্রত্যাখ্যান করলো। অবশেষে সে রসূল সা.-এর কাছে ফরিয়াদী হয়ে হাজির হলো এবং কবিতার কয়েকটি পংক্তির আকারে স্বীয় অভিযোগ পেশ করলো। তার প্রথম পংক্তিটি ছিলো:

يا سيد الناس وديان العرب ، اليك اشكرو زبة من الدزب

'হে জননেতা ও আরবের শাসক। আপনার কাছে আমি জনৈকা কটুভাষী মহিলার বিরুদ্ধে নালিশ করছি।'

যেহেতু এটা তোষামোদমূলক বক্তব্য ছিলনা বরং একজন ফরিয়াদীর অভিযোগ, তাই এই সাইয়েদ শব্দের প্রয়োগে রসূল সা. আপত্তি তোলেননি। বরং তৎক্ষণাত মুতাররিফের নামে ফরমান লিখে দিলেন যে, এই ব্যক্তির স্ত্রীকে তার কাছে প্রত্যর্পণ করো।[৯]

সনদবিহীন ও অবান্তর রেওয়ায়েত দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন: কাজী ইয়াযের 'শেফা' নামক গ্রন্থ হতে আপনি যে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন তা কোথা থেকে এবং কোন সূত্রে পাওয়া গেছে, সে কথা কাজী সাহেব উল্লেখ করেননি।

এটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, যে রেওয়ায়েত দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাতো সনদ ছাড়া এবং বরাত ছাড়াই গৃহীত হয়। কিন্তু যে রেওয়ায়েত দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়না, তা যদি সিহাহ্ সিত্তার (৬টি সহীহ হাদিস গ্রন্থের) কোনো একটিতে ধারাবাহিক সনদেও বর্ণিত হয় তবুও তা গৃহীত হবেনা। বরং তার একজন বর্ণনাকারীর উপর বিনাতদন্তে অপবাদ আরোপ করে পুরো হাদিসটাই প্রত্যাখ্যান করা হবে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে জনৈক ফেরেশতার প্রশ্ন ও জিবরাইল আ.-এর পরামর্শক্রমে রসূলুল্লাহর জবাব সম্বলিত যে হাদিসটি আপনি উদ্ধৃত করেছেন, সেটা আলোচ্য বিষয়ের সাথে আদৌ সম্পৃক্ত নয়।

রসূল সা.-এর নির্দেশের উপর ওমর রা.-এর আপত্তি: আপনি সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, বনু কুরায়জার ব্যাপারে শালিশ হিসেবে ফায়সালা করার জন্য যখন সা'দ বিন মুয়াযকে ডাকা হলো, তখন রসূল সা. উপস্থিত জনতাকে অথবা আনসারদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, قوموا الى سيدكم (তোমাদের নেতার সম্মানে দাড়াও।)' কিন্তু বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ, সীরাত ও মাগামীর গ্রন্থাবলীতে এই ঘটনা প্রসঙ্গে যতোগুলো রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে, তার সবগুলোকে বাদ দিয়ে আপনার দৃষ্টি কেবল মুসনাদে আহমাদের এই একটি মাত্র রেওয়ায়েতের উপর গিয়েই থমকে দাঁড়ালো, যাতে বলা হয়েছে রসূল সা. قوموا الى سيدكم এই কথাটা বলা মাত্রই ওমর রা. ভরা মজলিশেই বলে উঠলেন, سيدنا الله عز وجل (আমাদের নেতাতো আল্লাহ তায়ালা) অন্যান্য রেওয়ায়েতে যে এ কথার উল্লেখ

৯. ইনি বনু মাযেন গোত্রের শাখা বনু হিরমাযের লোক। রসূল সা. কে 'দাইয়ানুল আরব' (আরবের শাসক) বলে তিনি যে সম্বোধন করেছেন তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই গোত্রের ইসলাম গ্রহণের সময়টা ছিলো মক্কা বিজয় ও হোনায়েন যুদ্ধের মাঝখানে। তখন রসূল সা. বাস্তবিক পক্ষেই সারা আরবের শাসক হয়ে গিয়েছিলেন।

নেই, সেটা না হয় ক্ষণিকের জন্য বিবেচনার বাইরে রাখুন। ওমর রা. যে রসূল সা.-এর সামনে এমন বেয়াদবী করতে পেরেছেন, এটা আপনার বোধগম্য হলো কি করে? তিরমিযিতে আয়েশা রা. কর্তৃক ওমর রা.-এর এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে: 'আবু বকর আমাদের নেতা, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমাদের সবার চাইতে রসূল সা.-এর প্রিয়।' তাঁর আরো একটা উক্তি বোখারিতে জাবের বিন আব্দুল্লাহ কর্তৃক এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا يعنى بلالا 'আবু বকর আমাদের নেতা। তিনি আমাদের নেতা বিলালকে মুক্ত করেছেন।' যে ওমর এ সব কথা বলতে পারেন, তার পক্ষে অনুরূপ উক্তি করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

রসূল সা.-কে দোয়ায় 'সাইয়েদুনা' বলা কি দোয়ার মর্যাদা ক্ষুন্ন করে?: আপনার বক্তব্য হলো, দরূদে রসূল সা. কে 'সাইয়েদ' বলে আখ্যায়িত করা দোয়ার মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। কেননা দোয়া ও আবেদনে দাসসুলভ ও কাকুতি মিনতি ফুটে ওঠা চাই। যার জন্য দোয়া করতে হবে তার সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে হবে যে, এক অসহায় বান্দাহ আপনার দরবারে হাজির হয়েছে। এমনভাবে বলা ঠিক নয় যে, আমাদের নেতা ও সরদার হাজির হয়েছে। আপনার এ অভিমত সেই ক্ষেত্রে সঠিক হতে পারে, যখন কেউ নিজের জন্য দোয়া করে। কিন্তু যখন রসূল সা.-এর জন্য দোয়া করা হয় তখনও কি একথা খাটে? আপনি কি তার সম্পর্কে দোয়া করার সময় এভাবে বলতে পারবেন (নাউযুবিল্লাহ) যে, হে আল্লাহ বেচারা দীনতিদীন মুহাম্মদের উপর রহমত নাযিল করো? তা হলে আপনার এ বক্তব্য কিভাবে সঠিক হতে পারে, যখন মুসনাদে আহমদে, মুসনাদে আবু উয়াযাতে, সহীহ ইবনে হাব্বানে এবং হাফেজ মারজাবীর মুসনাদে আবু বকর সিদ্দিকে প্রামাণ্য সনদে কেয়ামতের দিনের শাফায়াত সম্পর্কে এই মর্মে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামানকে আবু বকর রা. এবং আবু বকরকে স্বয়ং রসূল সা. বলেছেন যে, সেদিন আল্লাহ তায়ালা রসূল সা.-কে দোয়ার এমন এক পদ্ধতি শিক্ষা দেবেন, যা ইতিপূর্বে আর কোনো মানুষকে শিক্ষা দেননি। রসূল সা. সেদিন বলবেন, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে আদমের বংশধরের 'সাইয়েদ' (সরদার) বানিয়েছ, এতে আমার কোনো গর্ব নেই। আর কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মাটি ফুঁড়ে বেরুনো মানুষটি আমাকেই করেছ, সে জন্যও আমি গর্বিত নই।' দেখুন, এখানে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা রসূল সা. কে দোয়া করার পদ্ধতি শিখাচ্ছেন এবং এখানে আদম বংশধরের সাইয়েদ বা সরদার শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে কি দোয়ার মর্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে?

সাইয়েদ শব্দটি শরিয়ত সম্মত: আপনার সকল আপত্তি খণ্ডন করার পর এখন আমি বলছি, সাইয়েদ শব্দটা একটা শরিয়তসম্মত শব্দ। বহু হাদিসে এ শব্দ রসূল সা.-এর জন্য এবং অন্যান্য মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

বোখারি, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালেসী, তিরমিযি, আবু দাউদ, দারামী এবং অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে বিপুল সংখ্যক সনদের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরী, ও আনাস বিন মালেক রা.-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। এতে তারা বর্ণনা করেন, রসূল সা. বলেছেন:

انا سيدو ولد آدم القيامة ولا فخر ، انا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر

এসব রেওয়ায়েতের কোনো কোনোটিতে يوم القيامة শব্দটি নেই বরং سيد ولدادم শুধু রয়েছে। মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, লেয়ান (স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপের ক্ষেত্রে উভয়ের পারস্পরিক অভিসম্পাতের মাধ্যমে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা।) সম্পর্কে আল্লাহর বিধান নাযিল হওয়ার আগে যখন প্রশ্ন উঠলো যে, স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে ভিন্ন পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখলে কি করবে? তখন সাদ বিন উবাদা অস্বাভাবিক ঘৃণা প্রকাশ করলেন। এ সময় রসূল সা. সমবেত আনসারগণকে সম্বোধন করে বললেন, اسمعوا الى ما يقول سيدكم 'তোমাদের সরদার কি বলছে শোন। অনুরূপভাবে বোখারি, মুসলিম, নাসায়ী প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থে আয়েশার উপর অপবাদ আরোপের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাতে রসূল সা. সাদ বিন উবাদাকে 'সাইয়্যিদুল খাযরাজ' (খাযরাজের সরদার) নামে আখ্যায়িত করেছেন। তাছাড়া সাদ বিন মুয়াজকে সাইয়েদ আখ্যা দেয়ার কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদ এবং ইবনে মাজাতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ কর্তৃক উবাই বিন কাব 'সাইয়েদুল কুররা' নামে অভিহিত করেছেন।

মুসলিম, আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতিতে রসূল সা.-এর উক্তি এই মর্মে উদ্ধৃত হয়েছে যে, দাসদাসীদের উচিত স্বীয় মনিবকে রব (প্রভু) না বলে 'সাইয়েদ' বা 'সাইয়েদা' (অভিভাবক ও অভিভাবিকা) বলা।

বোখারি, মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতিতে রসূল সা.ফাতেমা রা.-কে سيدة نساء هذه الامة (মুসলিম নারীদের সরদার), سيدا النساء المؤمنين বা سيدة النساء المؤمنات (মুমিন নারীদের সরদার বা মুমিনদের স্ত্রীদের সরদার) এবং سيدة النساء هذه الامة (বেহেশতের নারীদের সরদার) বলে অভিহিত করেছেন।

বোখারি, তিরমিযি ও আবু দাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে হাসান রা. সম্পর্কে রসূল সা.-এর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, ابى هذا اسيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين (আমার এই দৌহিত্র একজন নেতা বা সরদার। হয়তো আল্লাহ তার দ্বারা মুসলমানদের দুটো দলের মধ্যে আপোষ করিয়ে দেবেন।) এ হলো বোখারির ভাষ্য। অন্যান্য রেওয়ায়েতে শব্দের কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। তবে সব জায়গাতেই হাসান রা.-কে সাইয়েদ বলা হয়েছে।

তিরমিযি, ইবনে মাজা, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমাদে হাসান ও হুসাইন রা.-এর জন্য سيد اكهول اهل الجنة (বেহেশতের যুবকদের সরদার) এবং তিরমিযি, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদে আবু বকর রা. ও ওমর রা.-এর জন্য سيد اكهول اهل الجنة (বেহেশতের বৃদ্ধদের সরদার) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

এ সমস্ত হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাইয়েদ শব্দটার প্রয়োগ রসূল সা.-এর জন্যও শরিয়ত বিরোধী নয়, অন্য লোকদের ক্ষেত্রেও নয়। এই দুনিয়াতেও তা অবৈধ নয়, আখেরাতেও নয়। সুতরাং নামাযের ভেতরে বা বাইরে রসূল সা.-এর নামের দরূদ পড়তে গিয়ে এ শব্দের ব্যবহার কিভাবে নিষিদ্ধ হতে পারে?

'মাওলা (বন্ধু) শব্দটাও শরিয়ত সম্মত: 'মাওলা' শব্দের ব্যাপারটাও তদ্রূপ। ইবনে মাজাতে বর্ণিত হয়েছে, একবার হজ্জের সময় সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. মোয়াবিয়া রা.-এর সাথে দেখা করতে গেলেন। সেখানে আলী রা.-এর সম্পর্কে অশোভন কথাবার্তা হচ্ছিলো। তা শুনে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. রাগান্বিত হয়ে বললেন: 'আপনি এ ধরনের কথা সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা.-কে আমি বলতে শুনেছি যে, 'আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু।'

মুসনাদে আহমাদ ও নাসায়ীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বারিদা রা. এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, আমি আলী রা.-এর সাথে ইয়ামান অভিযানে গেলাম। সেখানে আলী রা.-এর সাথে কঠোর আচরণ করা হয় বলে জানতে পারলাম। আমি ফিরে এসে রসূল সা.-এর নিকট অভিযোগ করলাম। আমার কথা শুনে রসূল সা.-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি বললেন, 'শোন বারিদা, আমি কি মুমিনদের কাছে তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় নই? আমি বললাম: নিশ্চয়ই ইয়া রসূলুল্লাহ' রসূল সা. বললেন: আমি যার কাছে প্রিয় (মাওলা) আলীও তার কাছে প্রিয় হওয়া উচিত।' হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন: এ রেওয়ায়েতের সনদ উত্তম শক্তিশালী এবং এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

নাসায়ীতে যায়েদ বিন আরকামের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। এতে বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে রসূল সা. গাদীরে খুম নামক জায়গায় যে ভাষণ দেন তার বিবরণ দিয়ে যায়েদ বলেন: অতঃপর রসূল সা. আলীর হাত ধরে বললেন: 'আমি যার মাওলা (বন্ধু বা অভিভাবক) এই ব্যক্তিও তার ওলী (অভিভাবক)। হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন: আমাদের প্রবীণ ওস্তাদ ইমাম যাহাবী এ রেওয়ায়েতকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মুসনাদে আহমাদে যায়েদ বিন আরকামের বর্ণনার ভাষা এরূপ, রসূল সা. খুম উপত্যকায় ভাষণ দেয়ার সময় বললেন: তোমরা কি জাননা অথবা তোমরা কি সাক্ষ্য দাওনা যে, আমি প্রত্যেক মুমিনের মাঝে প্রাণাধিক প্রিয়? সকলে বললো, অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, আমি যার প্রিয়, আলীও তার প্রিয়।' ইবনে কাসীর বলেন, এ রেওয়ায়েত নির্ভুল এবং এর বর্ণনাকারীগণ হাদিস বর্ণনার শর্তানুসারে বিশ্বস্ত।

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'মাওলা' (বন্ধু অভিভাবক বা প্রিয়জন) শব্দটা রসূল সা.-এর জন্য এবং অন্যদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য ও শরিয়তসম্মত। সুতরাং নামাযে ও নামাযের বাইরে রসূল সা.-এর প্রতি দরূদ পাঠাতে গিয়ে 'সাইয়েদুনা ও মাওলানা' শব্দ (আমাদের সরদার আমাদের প্রিয়জন) ব্যবহার করাতে দোষ কি? কোন্ যুক্তিতে এ কাজ নিষিদ্ধ, নাজায়েজ বা মাকরূহ সাব্যস্ত হতে পারে? (তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর: ১৯৭৫)

০৯. কাকের গোশত, ঝড় তুফানে আযান এবং খালি মাথায় নামায।

প্রশ্ন: ১. কাকের গোশত কি হালাল? পশু পাখির মধ্যে কোন্ কোন্‌টি হালাল এবং কোন্ কোন্‌টি হারাম? কেউ কেউ দূররে মুখতার' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে কাকের গোশতকে হালাল বলে থাকে। এবক্তব্য কি সঠিক?

২. বিগত ঝড় তুফানের সময় অনেক লোক ঘরের ছাদে উঠে আল্লাহর ভয়ে আযান দিয়েছে। এরূপ করা কি বৈধ? এ কাজ কি মুস্তাহাব না গুনাহ নাকি শরিয়ত বিরোধী?

৩. টুপি কিংবা কাপড় থাকা সত্ত্বেও খালি মাথায় নামায পড়া কি বৈধ? এমন কোনো হাদিস আছে কি, যা দ্বারা খালি মাথায় নামায পড়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

জবাব: ১. যেসব প্রাণী হারাম হবার ব্যাপারে কুরআন হাদিসে সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো হারাম হবার ব্যাপারে গোটা উম্মত একমত। কিন্তু যেসব প্রাণীর ব্যাপারে সরাসরি কোনো কথা বলা হয়নি বরঞ্চ শুধু মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে, সেগুলো হালাল ও হারাম হবার ব্যাপারে ফকিহগণের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। কাকের গোশত সম্পর্কে দুররুল মুখতার গ্রন্থে লেখা হয়েছে এবং হালাল নয় সেই কাক, যার রং সাদা কালো মিশ্রিত এবং যে মৃত প্রাণী খায়। কেননা সেই শ্রেণীর কাক 'খাবাইস' বা নোংরা প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। একথা লিখেছেন মূল গ্রন্থকার (অর্থাৎ তানবীরুল আবসারের গ্রন্থকার)। অতঃপর তিনি লিখেছেন, নোংরা প্রাণী হচ্ছে সেগুলো, সুস্থ স্বভাব ও বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন লোক যেগুলোকে নোংরা ও নাপাক মনে করে।'

আল্লামা শামী রদ্দুল মুখতার গ্রন্থে উল্লিখিত বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, মিশ্রিত রং (সাদা কালো মিশ্রীত) এবং কালো রং এর কাক তিন ধরনের হয়ে থাকে। এর মধ্যে এক ধরনের কাক হচ্ছে সেইগুলো, যেগুলো সাধারণত শস্যবীজ খেয়ে থাকে এবং মৃত প্রাণী খায়না। এ ধরনের কাকের গোশত মাকরূহ নয়। দ্বিতীয় ধরনের কাক হচ্ছে সেগুলো, যেগুলো মৃতপ্রাণী খায়। এ ধরনের কাকের গোশত মাকরুহ। গ্রন্থকার এ ধরনের কাককেই মিশ্রিত রং এর কাক বলেছেন। তৃতীয় ধরনের কাক হচ্ছে সেগুলো, যেগুলো কখনো মৃত প্রাণী খেয়ে থাকে এবং কখনো শস্যবীজ। গ্রন্থকার এ ধরনের কাকের বিধান উল্লেখ করেননি। ইমাম আবু হানিফার মতে এরূপ কাকের গোশত মাকরূহ নয়, আর ইমাম আবু ইউসুফের মতে মাকরূহ।[১০]

এই গ্রন্থেরই উপরোক্ত আলোচ্য বিষয় পুরোটা পড়ে নিলে আপনি জানতে পারবেন কোন্ কোন্ প্রাণী হালাল।

২. ঝড় তুফান, বন্যা কিংবা বিপদকালে আযান দেয়া মুসলমান সমাজে চালু হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যতোদূর জানি, এটা রসূল সা. থেকে প্রমাণিত নয়। সম্ভবত লোকেরা এটাকে সাহায্যের জন্যে আল্লাহ তায়ালাকে ডাকার একটা পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছে। লোকেরা যদি এটাকে শরিয়তের বিধান মনে করে পালন করে, তবে তা ভুল হবে। আর যদি কেবলমাত্র আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করার এবং তার অনুগ্রহ প্রার্থনার জন্যে করে তবে তা মুবাহ।

৩. নামাযের সময় মাথা ঢাকার কিংবা খালি মাথায় নামায পড়ার কোনো হুকুম আমার জানা নেই। অবশ্য নবী করিম সা. এবং সাহাবায়ে কিরাম রা. পাগড়ি কিংবা টুপি পরে নামায পড়তেন। কুরআনে 'খুযু যীনাতাকুম ইন্দা কুল্লি মাসজিদ'-এর হুকুমের দাবিও এটাই মনে

১০. রদ্দুল মুখতার, জিলদ:৫, পৃষ্ঠা ২৬৬।

হয় যে, নামায উত্তম পোশাক পরিধান করে পড়তে হবে। আর টুপি কিংবা পাগড়ি উত্তম পোশাকেরই অন্তর্ভুক্ত। তা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি যদি খালি মাথায় নামায পড়ে, তার নামায হয়ে যাবে। (তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর: ১৯৭৬)

১০. ব্যাংকে টাকা রাখার বৈধ পন্থা।

প্রশ্নঃ ব্যাংকে অর্থ আমানত করার ব্যাপারে আমার প্রশ্ন হলো, আমি যদি সেভিংস এ্যাকাউন্টে টাকা জমা করি, তাহলে ব্যাংক তাতে সুদ দেবে। কিন্তু যদি কারেন্ট এ্যাকাউন্টে জমা করা হয়, তাহলে তাতে যদিও আমি সুদ পাবো না, কিন্তু ব্যাংক ঐ টাকাকে সুদ ভিত্তিক কারবারে খাটাবে। তার মানে আমার টাকায় ব্যাংক সুদ গ্রহণ করবেন। এর পরিবর্তে আমি যদি সেভিংস এ্যাকাউন্টে জমা করি এবং প্রাপ্ত সুদের টাকা যদি অভাবী লোকদের কল্যাণে ব্যয় করি, তাহলে সেটা কেমন হয়? সুদটা ব্যাংক খাবে কেন? তা দিয়ে বরঞ্চ কোনো অভাবী লোকের অভাব পূরণ করলে ক্ষতি কি? এ ব্যাপারে আমাকে সঠিক পথ নির্দেশনা দেবেন।

জবাবঃ টাকা কারেন্ট এ্যাকাউন্টে রাখলে তাতে সুদ হয়না এবং কারেন্ট এ্যাকাউন্টের টাকা কারবারে খাটানো ব্যাংকের পক্ষে বিধি বহির্ভূত কাজ। এখন ব্যাংক যদি ঐ টাকা সুদী কারবারে খাটায়, তাহলে তার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায় না। কেননা আমরা তো শুধু নিরাপত্তার জন্য তার কাছে টাকা রাখি, সুদী কারবারের জন্য নয়। পক্ষান্তরে সুদ পাওয়া যায় এমন খাতে যদি টাকা জমা করা হয় এবং তা গরীবের সাহায্যে ব্যয় করা হবে এরূপ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত করা হয়, তবে এ কাজটা হবে গরীবদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে পকেট মারার মতো। (তরজমানুল কুরআন, আগস্ট: ১৯৭৬)

১১. হানাফী মাযহাব অনুসারীর অন্য মাযহাব অনুসরণ করা চলে কি?

প্রশ্নঃ কোনো ব্যাপারে যদি হানাফী ও শাফেয়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে মতভেদ থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে হানাফীদের সমস্যা সমাধানে হানাফী দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আছে কি? বিশেষত যে ব্যাপারে আদালত শাফেয়ী দৃষ্টিভঙ্গিকে অধিকতর বলিষ্ঠ মনে করে।

জবাবঃ এ প্রশ্নটির দুটো দিক রয়েছে। একটি নীতিগত, অপরটি বাস্তব। নীতিগতভাবে বিচারক যদি সূক্ষ্ম অনুসন্ধান চালানোর পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আলোচ্য বিশেষ সমস্যাটির ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের তুলনায় শাফেয়ী, মালেকী বা হাম্বলী মাযহাবের যুক্তি প্রমাণাদি অধিকতর বলিষ্ঠ, তাহলে তার পক্ষে সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ফায়সালা করা শুধু জায়েযই নয় বরং বলিষ্ঠতর মাযহাব বাদ দিয়ে দুর্বলতর মাযহাব অনুযায়ী ফায়সালা করা নাজায়েজ। কিন্তু বাস্তবতার দিক দিয়ে এতে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে।

প্রথমত, আমাদের দেশে অন্যান্য মাযহাবের বিস্তৃত গ্রন্থাবলী পাওয়া যায়না। ঐসব মাযহাবের যুক্তি প্রমাণাদি বিশদভাবে জানা যায় এবং একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত খুটিনাটি বিধির প্রতি অন্য কোনো মাযহাব অনুসারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন তা অবহিত হওয়া যায়, এমন বই কিতাব এ দেশে দুর্লভ।

দ্বিতীয়ত, হাদিস গ্রন্থাবলী, তার ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থাবলী এবং হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবন ও চরিত্রের বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থাবলীর (আসমাউর রিজাল) পরিপূর্ণ মজুদ কোনো আদালতের লাইব্রেরি বা সাধারণ গ্রন্থাগারে বিদ্যমান নেই। তা যদি থাকতো তাহলে একটি মাযহাবের ফেকাহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলী যেসব হাদিসের বরাত দিয়ে থাকে, সেসব হাদিস শুদ্ধ না অশুদ্ধ তা নির্ণয় করার জন্য মূল উৎসগুলো খুঁজে দেখা সম্ভব হতো।

তৃতীয়ত, ফেকাহ ও হাদিসের যাবতীয় বই কিতাব আরবি ভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমাদের দেশের বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাগণ এবং উকিলগণ ভাষা হিসেবে আরবিতে যদি যথেষ্ট বুৎপত্তিসম্পন্ন হয়েও থাকেন, তবু ফেকাহ, উসূলে ফেকাহ (ফেকাহতত্ত্ব) হাদিস ও উসূলে হাদিস (হাদিস তত্ত্ব) প্রভৃতি শাস্ত্রে যে বিশেষ আরবি ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে তারা কোনো নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করেননি। শুধুমাত্র আরবি ভাষা জানা এসব শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট নয়। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের এ উপমহাদেশের আইন কলেজগুলোতে ইসলামি আইন শাস্ত্রের যথোচিত শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা এ যাবত করা হয়নি।

সর্বশেষ সমস্যা হলো, কোনো উচ্চতর আদালত যদি যথোচিত তত্ত্বানুসন্ধানের পর হানাফী মাযহাব ছাড়া অন্য কোনো মাযহাব অনুযায়ী ফায়সালা করে, তবে সেটা নিম্নতর আদালতগুলোর জন্য একটা নীতিগত দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে এবং ইজতিহাদী যোগ্যতা ছাড়াই অন্যান্য মাযহাব অনুসারে রায় দেয়ার পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আমাদের উপমহাদেশের সাধারণ মানুষ হানাফী মাযহাবের অনুসারী এবং আমাদের আলেম সমাজও এই মাযহাব সম্পর্কেই বুৎপত্তির অধিকারী। শুধু বুৎপত্তিসম্পন্নই নন, তারা এর কঠোর বাস্তব অনুসারীও। এ জন্য অপরিপক্ক জ্ঞানের ভিত্তিতে যখন নিম্নতর আদালতগুলো থেকে হানাফী মাযহাবের বিপরীত রায় ঘোষিত হতে থাকবে, তখন তা নিয়ে দেশে তুলকালাম কাণ্ড বেধে যাবে। এ সব সমস্যার কথা বিবেচনা করে আমি এই পরামর্শ দেয়াই সমীচীন মনে করি যে, এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারিঃ ১৯৭৭)

১২. ফেকাহশাস্ত্রীয় মত ও পথকে 'মাযহাব' অভিহিত করা কি ঠিক?

প্রশ্নঃ জানুয়ারি মাসের তরজমানুল কুরআনে আপনি একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে হানাফী ফেরকা অথবা শাফেয়ী ফেরকাকে হানাফী মাযহাব অথবা শাফেয়ী মাযহাব নামে আখ্যায়িত করেছেন। আমার ধর্মীয় জ্ঞান একজন সাধারণ মুসলমানের ন্যায়। তাই ধর্মকে আমি এসব ফেরকাবন্দীর উর্ধ্বের জিনিস মনে করি। আমাদের সকল ফেরকার ধর্ম কি এক নয়?

জবাবঃ আরবি ভাষায় 'মাযহাব' শব্দের অর্থ ধর্ম নয়, বরং School of thought বা তাত্ত্বিক ধারা বিশেষ। হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী ইত্যাদি কোনো ফেরকা বা সম্প্রদায় নয়, বরং ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত স্বীকৃত বিভিন্ন মত ও পথ বা ধারা। মাযহাব শব্দটাই এর পারিভাষিক নাম। কোনো যুগেই মনীষীরা এগুলোকে ফেরকা বা সম্প্রদায় নামে আখ্যায়িত করেননি। (তরজমানুল কুরআন, মার্চঃ ১৯৭৭)

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

০১. বিদ্রোহ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফার অনুসৃত পথ।

প্রশ্নঃ তরজমানুল কুরআনের ১৯৬৩ সালের নভেম্বর সংখ্যায় 'বিদ্রোহ' শীর্ষক আমার পূর্বেকার চিঠি ও তার যে উত্তর ছাপানো হয়েছে এজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই উত্তরে আমার সেই অস্থিরতা দূরীভূত হয়নি, যা খিলাফত প্রসঙ্গে অধ্যয়ন করতে গিয়ে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অনুসৃত পথ সম্পর্কে আমার মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। তাই আমি আমার আবেদন কিছুটা বিস্তারিত ভাবে আপনার সামনে পেশ করবো। আশা করি তার জওয়াবও আপনি তরজমানুল কুরআনে প্রকাশ করে অত্র পত্রিকার পাঠকদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবেন।

'খিলাফত প্রসঙ্গে' আপনি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর যে অভিমত বর্ণনা করেছেন, তাতে আপনি 'যালেম ফাসেক' এর ইমামত (নেতৃত্ব) সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমতের তিনটি পৃথক দিক পেশ করেছেন। এক. ইমাম সাহেব না মুতাযিলা ও খারিজীদের মতো তার ইমামতকে এই অর্থে বাতিল সাব্যস্ত করেন যে, তার নেতৃত্বে কোনো সামগ্রিক কাজ বৈধ পন্থায় সমাধা হতে পারেনা এবং মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের গোটা ব্যবস্থাই অকেজো হয়ে যাবে। আর না মুরজিয়াদের মতো তাকে এরূপ বৈধ ও যথার্থ বলে স্বীকার করেন যে, মুসলমানগণ তার প্রতি আশ্বস্ত হয়ে বসে যাবে এবং তার পরিবর্তনের চেষ্টা করবেনা, ইমাম সাহেব বরং এই দুই চরমপন্থী মতের মাঝখানে এ ধরনের ইমামত সম্পর্কে একটি ন্যায় নিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ মত পেশ করেন। তা হলো, তার নেতৃত্বে যাবতীয় সামাজিক ও সামগ্রিক কাজ বৈধ হবে। কিন্তু এই ইমামত স্বয়ং অবৈধ ও বাতিল গণ্য হবে। দুই. স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যেক মুসলমানের সত্য ন্যায়ের আদেশ এবং অসত্য ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার অধিকার থাকবে বরং এই দায়িত্ব পালন করা সব মুসলমানের কর্তব্য। তিন. ইমাম আজম রহ.-এর মতে, এ ধরনের যালেম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাও বৈধ। তবে শর্ত হচ্ছে, এই বিদ্রোহের ফলে যেন বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার সূত্রপাত না হয় বরং দুস্কৃতিপরায়ণ নেতৃত্বের স্থলে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব কায়েম হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। এই অবস্থায় বিদ্রোহ কেবলমাত্র বৈধই নয় বরং অপরিহার্য।

এ প্রসঙ্গে আমার আবেদন হলো, ইমাম আবু হানিফার মতে 'যালেম ও ফাসেক' (স্বৈরাচারী ও দুস্কৃতিপরায়ণ এর ইমামত (নেতৃত্ব) বাতিল এবং তার সরকারের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ ঘোষণা জায়েয', এ কথা বলায় তাঁর মাযহাবের সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয়না। আমার মতে এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব হলো, স্বৈরাচারী ও অসৎ ব্যক্তি নিজ ক্ষমতা বলে যদি জনগণের উপর চেপে বসে, যাকে

ফকীহগণের পরিভাষায় মুতাগাল্লিব বলা হয় এবং তার নির্দেশ গায়ের জোরে কার্যকর করার ক্ষমতা রাখে, সে যালেম ফাসেক যাই হোক এবং প্রচলিত পন্থায় তার আনুগত্যের শপথ না নেয়া হোক, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. তার নেতৃত্বের এই অর্থ করে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সাব্যস্ত করেন যে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অবৈধ মনে করেন। তিনি যেভাবে তার নেতৃত্বে অন্যান্য সামগ্রিক কার্যাবলী জায়েয ও নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেন, অনুরূপভাবে বিদ্রোহকেও এ ধরনের সরকারের বিরুদ্ধে অবৈধ সাব্যস্ত করেন। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে আমার এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

"সম্মানিত ও প্রভাবশালী লোকদের বাইআত হওয়ার মাধ্যমে ইমাম নিযুক্ত হয়। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী ইমামের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের মাধ্যমেও এবং শক্তি বলে নেতৃপদে সমাসীন হওয়ার মাধ্যমেও ইমাম হওয়া যায়। যেমন শারহুল মাকাসিদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে মাসাইরা গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, খলিফা যদি নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কারো নাম ঘোষণা করেন অথবা একদল আলেম অথবা একদল প্রতিভাবান ব্যক্তি আনুগত্যের শপথ নেয়, তবে এভাবেও খলিফা নিযুক্ত হতে পারে। খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে যদি জ্ঞান ও ন্যায়নিষ্ঠার অভাব থাকে কিন্তু তাকে খিলাফত থেকে সরিয়ে দিলে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে আমরা এরূপ ব্যক্তির খিলাফত অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে রায় দেই, যাতে আমরা এমন ব্যক্তির মতো না হই, যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে কিন্তু গোটা শহর ধ্বসিয়ে দেয়। ইমাম ন্যায়নিষ্ঠ হোক অথবা যালেম, তার আনুগত্য অপরিহার্য, যতোক্ষণ সে শরিয়তের বিরুদ্ধে না যায়। এটা জানা কথা যে, ইমাম তিনটি বাক্যের মাধ্যমে নিযুক্ত হন, যার মধ্যে তৃতীয়টি জোরপূর্বক ইমাম হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত, চাই তার মধ্যে ইমাম হওয়ার শর্তাবলী বর্তমান না থাক।" (রদ্দুল মুখতার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪২৮)

যাই হোক ইমামের (রাষ্ট্র প্রধানের) মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠা (আদালত) বর্তমান থাকা শর্ত। কিন্তু ইমামত সঠিক ও যথার্থ হওয়ার জন্য তা শর্ত নয়। এই কারণে ফাসেকের ইমামতকে মাকরূহ (অপছন্দনীয়) বলা হয়েছে, অযথার্থ বলা হয়নি।

'হানাফীগণের মতে ন্যায়নিষ্ঠতা শুদ্ধ ও যথার্থ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। অতএব ফাসেক ইমামের আনুগত্য অপছন্দীয় হলেও বৈধ।' (শামী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১২)

এই বিধানের আওতায় হানাফীগণ জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীর ইমামতকে সহীহ বলেন: 'জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীর সরকার প্রয়োজনের ভিত্তিতে সঠিক' (পূর্ব গ্রন্থ)

এই ধরনের ফাসেক সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর নীতি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: 'তার জন্য দোয়া করা অত্যাবশ্যক, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অত্যাবশ্যকীয় নয়। আবু হানিফা রহ. থেকে এভাবে বর্ণিত আছে।'

এসব উদ্ধৃতি ইবনুল হুমাম তাঁর মাসাইরা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে একজন ফাসেক ও স্বৈরাচারী শাসকের সরকারের অধীনে যেভাবে দীনের অন্যান্য সামগ্রিক কাজ বৈধ পন্থায়

সম্পাদন করা যেতে পারে, অনুরূপভাবে এই সরকারের বিরুদ্ধে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে বিদ্রোহ ও তার পদচ্যুতি উভয়ই বৈধ। কিন্তু এতে শর্ত হচ্ছে, বিদ্রোহ ও সরকারের উৎখাত যেন বিশৃঙ্খলার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু প্রতি যুগে প্রতিটি বিদ্রোহ তার সাথে অনেক বিপর্যয়সহ আত্মপ্রকাশ করে, এজন্য কতিপয় হানাফী ফকীহ এ পর্যন্তও বলেছেন: 'সরকারি প্রশাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মুসলমানদের ঐকমত্য অনুযায়ী হারাম। (অবৈধ) চাই সে ফাসেক অথবা জালেমই হোক না কেন।' (মিরকাত)

এ জন্য এরূপ সরকারের অধীনে মৌখিকভাবে দীনের প্রচারের দায়িত্ব পালন করলেই যথেষ্ট হবে। মুসলিম বিদ্রোহীদের সম্পর্কে আমি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গি যতোটা অনুধাবন করতে পেরেছি তা হলো, যেসব অবস্থায় বিদ্রোহ করা জায়েয নয়, সেসব অবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে যারা বিদ্রোহ করেছে, তাদের হত্যা করা বৈধ। অবশ্য যেসব লোকে বিদ্রোহীদের সাথে বিদ্রোহে যোগদান করেনি তাদের হত্যা করা বৈধ নয়। চাই তারা শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ অথবা অন্ধই হোক অথবা অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই হোক, যারা বিদ্রোহীদের সাথে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেনি। এর প্রমাণস্বরূপ হানাফী ফকীহগণের নিম্নোক্ত বক্তব্য দেখা যেতে পারে। ইমাম সারাখসী রহ. তার আল মাবসূত গ্রন্থের ১০ম খণ্ডে ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন:

'মুসলিমগণ যদি একজন শাসকের অধীনে সংঘবদ্ধ থাকে, শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যে থাকে এবং যাতায়াতের পথও নিরাপদ থাকে, অতঃপর এই শাসকের বিরুদ্ধে মুসলমানদের একটি দল বিদ্রোহ করে, তবে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করতে সক্ষম তার কর্তব্য হচ্ছে মুসলমানদের সাথে সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা।'

যুদ্ধ অপরিহার্য হওয়ার জন্য ইমাম সারাখসী রহ. তিনটি দলিল পেশ করেছেন। তার মধ্যে একটি দলিল হচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াত: 'অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতোক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।' (সূরা হুজরাত: আ. ৯)

ইমাম সাহেব যুদ্ধ অপরিহার্য হওয়ার স্বপক্ষে আরও একটি দলিল পেশ করেছেন: 'তা এজন্য যে, বিদ্রোহীরা মুসলমানদের কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করেছে। আর কষ্ট দূরীভূত করা দীনের অংগ এবং তাদের বিদ্রোহ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত অতএব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অন্যায়ের প্রতিরোধের অন্তর্ভুক্ত এবং তা ফরজ।'

তিনি তৃতীয় দলিল এই বর্ণনা করেছেন: 'এবং এজন্য যে, তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। মহানবী সা. বলেন, বিশৃঙ্খলা হচ্ছে নিদ্রালু। যে ব্যক্তি তাকে জাগরিত করে, তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। অতএব যে ব্যক্তি শরিয়ত প্রণেতার বাণী অনুযায়ী অভিশপ্ত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়।'

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর সাহায্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। শরিয়তের দৃষ্টিতে এমন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ হতে

পারে, যাদের রক্ত নিরাপরাধ নয়। মহানবী সা.-এর নিম্নোক্ত বাণীতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

'আমাকে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতোক্ষণ না তারা বলে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রসূল। যখন তারা এরূপ করবে, তখন তারা আমার থেকে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করবে।'

অতএব বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যখন বাধ্যতামূলক হলো তখন জানা গেলো যে, তাদের জীবনের পূর্ণ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা অর্জিত নেই বলে তখন যুদ্ধও বৈধ হবে। এ কারণেই হানাফী ফকীহগণ নিজেদের গ্রন্থসমূহে পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন যে, বিদ্রোহীদের হত্যা করা বৈধ। বাদাই ওয়াস সানাই' গ্রন্থের রচয়িতা বিদ্রোহীদের হত্যা করা সম্পর্কে লিখেছেনঃ 'যুদ্ধে লিপ্তদের মধ্যে যাদের হত্যা করা বৈধ এবং যাদের হত্যা করা বৈধ নয় সে সম্পর্কে বলা যায় যে, শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ ও অন্ধদের হত্যা করা যেমন বৈধ নয়, তেমনি বিদ্রোহীদের মধ্যেও এসব লোকদের হত্যা করা বৈধ নয়। কারণ বিদ্রোহীদের কেবলমাত্র তাদের হত্যাকাণ্ডের নিকৃষ্টতা বন্ধ করার জন্য হত্যা করা হয়। এ জন্য তা যুদ্ধ করার যোগ্য লোকদের জন্য নির্দিষ্ট। আর এসব লোক যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। অতএব তাদের হত্যাও করা যাবেনা। তবে তারা যদি যুদ্ধ করে তবে তাদের হত্যা করা যাবে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বা তারপরেও।' -৭ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৪১।

ফকীহগণের এসব বক্তব্যের আলোকে বিদ্রোহীদের সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা রহ. -এর মাযহাবের মত এই যে, মুসলিম বিদ্রোহীদের উপর ইসলামি সরকার বিজয়ী হলে সে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হত্যা করে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা যাবে। চাই তারা পূর্বে এই শর্ত (বিদ্রোহ করলে মৃত্যুদণ্ড ভোগ) কবুল করুক বা না করুক। কিন্তু এই যুদ্ধ কেবলমাত্র বিদ্রোহীদের অস্ত্র সমর্পণ করা পর্যন্তই চলতে পারে। তারা অস্ত্র সমর্পণ করলে যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে হবে। অবশ্য তাদের সম্পদ যুদ্ধলব্ধ মাল (গনীমত) হিসেবে বন্টন করা যাবে না বরং যুদ্ধ শেষে অস্ত্র সমর্পণের পর তাদের সম্পদ তাদেরকেই ফেরত দিতে হবে।

'অনুরূপভাবে তাদের সম্পদ থেকে যা কিছু নেয়া হবে তা তাদের ফেরত দিতে হবে। কারণ এই সম্পদ দারুল ইসলামে (ইসলামি রাষ্ট্রে) থাকার কারণে নিরাপদ এবং তা বিজয়ীর এলাকা হিসাবে গণ্য হবেনা।' (আল মাবসূত, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১২৬)

ফকীহগণের এসব বক্তব্যে যদি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাবের সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয়ে থাকে, যেমন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, তবে তা বর্তমান থাকতে বুদ্ধিবৃত্তি কি করে এটা বিশ্বাস করতে পারে যে, মাওসিলে মুসলমানরা বিদ্রোহ করেছিল এবং মানসুরের সাথে যেহেতু তারা এই শর্ত করেছিল যে, ভবিষ্যতে তারা যদি মানসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তবে তাদের জান মাল তার জন্য হালাল হয়ে যাবে? এজন্য ফকীহগণের সামনে এই প্রশ্ন রাখা হয়েছিল যে, যুদ্ধশেষে এসব

বিদ্রোহীদের জান মালের উপর হস্তক্ষেপ করা জায়েয হবে কিনা এবং এ সম্পর্কেই মানসুরের বক্তব্যের উপর ইমাম হানিফা রহ. ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, তাদের জান মাল (হরণ) আপনার জন্য বৈধ নয়।

পুনরায় এ কথা অনেকটা আশ্চর্যজনক হয় যে, আপনি শামসুল আইম্মা সারাখসীর বর্ণনা শুধু এ কারণে নির্ভরযোগ্য মনে করে না যে, তাঁর বর্ণনা ঐতিহাসিকদের বর্ণনার বিপরীত। অথচ বিদ্রোহের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফকীহ্ সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন প্রবীণ ফকীহ এবং ইমামে আজমের মতো একজন ফিকাহ এর ইমামের মাযহাব জ্ঞাত হওয়ার জন্য ইমাম সাহেবের মাযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ফকীহগণের বক্তব্যের উপরই অধিক নির্ভর করা উচিৎ। কোনো মাযহাবের একজন ইমামের ফিকহী মতামত সংকলনের ক্ষেত্রে যতোটা ভুল হতে পারে, তার তুলনায় ইতিহাসের ঘটনাবলী সুসংবদ্ধ করতে গিয়ে অধিক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া ইমাম সারাখসী রহ. তার আল মাবসূত গ্রন্থে এই ঘটনা যেভাবে নকল করেছেন, শায়খ ইবনূল হুমামও তার ফাতহুল কাবীর গ্রন্থে (৫ খন্ড পৃ. ৩৪১) হুবহু সেভাবে নকল করেছেন। এই দুই ইমামের মোকাবেলায় ইবনুল আছীর অথবা আল কারদারীর বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দেয়া নিশ্চিতই আমাদের বুদ্ধি জ্ঞানের বাইরে।

জবাবঃ বিদ্রোহ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব সম্পর্কে আপনি যা কিছু লিখেছেন, সে সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু বলার পূর্বে আমি চাই যে, আপনি আরও দুই তিনটি কথার উপর আলোকপাত করুন।

এক. আবু বাকর আল জাসসাস, আল মওয়াফফাক আল মাক্কী ও ইবনুল বাযযার আল কারদারীও হানাফী ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত কিনা? আপনার অজ্ঞাত থাকার কথা নয় যে, আবু বাকর আল জাসসাস রহ. প্রবীণ (মুতাকাদ্দিমীন) হানাফী ফকীহগণের অন্তর্ভুক্ত, আবু সাহল আল যাজ্জাজ ও আবুল হাসান আল কারখীর ছাত্র এবং নিজ যুগের (৩০৩-৩৭০ হি.) 'ইমাম আবু হানিফা' বলে স্বীকৃত ছিলেন। তার বিখ্যাত তাফসির 'আহকামূল কুরআন' (কুরআনের বিধান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত) হানাফী মাযহাবের ফিকহের কিতাবসমূহের মধ্যে গণ্য। আল মওয়াফফাক আল মাক্কীও (৪৮৪-৫৬৮ হি.) হানাফী ফকীহগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং আল কিফতীর বক্তব্য অনুযায়ী كانت له معرفه تامة في الفقة والادب (ফিকহ ও সাহিত্যে তার পরিপূর্ণ পাণ্ডিত্য ছিলো)।

আল কারদারীও হানাফী ফকীহগণের অন্তর্ভুক্ত এবং 'ফতোয়া আল বায্যাযিয়া', 'আদাবুল ফুকাহা' এবং আল মুখতাসার ফী বাইয়ানি তারীফাতির আহকাম' শীর্ষক গ্রন্থাবলী সমধিক প্রসিদ্ধ। আমি উপরোক্ত তিনজন ফকীহ এর গ্রন্থাবলী থেকে হাওয়ালাসহ যা কিছু নকল করেছি, আমি চাই যে, আপনি সেগুলোর মর্যাদা সম্পর্কেও কিছুটা আলোকপাত করুন।

দুই. যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন রা. ও নফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহের ঘটনায় ইমাম আজম রহ.-এর যে ভূমিকা উপরোক্ত তিনজন গ্রন্থকার এবং অপরাপর অনেক

ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, তাকে আপনি সঠিক ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য করেন কিনা? যদি এসব ঘটনা ভ্রান্ত হয়, তবে আপনি কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যের সাহায্যে তা প্রত্যাখ্যান করুন। আর যদি তা সঠিক হয়ে থাকে, তবে ইমাম আজম রহ.-এর মাযহাব অনুধাবনের জন্য ঐ সব গ্রন্থের সাহায্য নেয়া যেতে পারে কিনা? যাই হোক এ কথা তো ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতো মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস করা যায় না যে, তার ফিকহী অভিমত একরূপ ছিলো আর ভূমিকা ছিলো ভিন্নরূপ। অতএব দুটি কথার মধ্যে একটি অবশ্যই মানতে হবে। হয় ঐ সব ঘটনাই ভুল, অথবা ইমাম সাহেবের মাযহাবের সঠিক প্রতিনিধিত্ব তাই হতে পারে, যা তার ভূমিকার সাথে সংগতিপূর্ণ।

মাওসিলবাসীদের সম্পর্কে শামসুল আইম্মা সারাখসী যা কিছু লিখেছেন সে সম্পর্কে আমি কেবল এতোটুকুই বলবো যে, দ্বিতীয় বর্ণনাটি আল কারদারীর, তিনিও শুধু ঐতিহাসিক নন বরং ফকীহও। আল কারদারী লিখেন যে, মানসূর ফকীহগণের সামনে নিম্নোক্ত প্রশ্ন পেশ করেছিলেন: 'একথা কি সঠিক নয় যে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: 'মুমিনদের সাথে স্থিরকৃত শর্তাবলীর উপর চুক্তি হবে। মাওসিলের অধিবাসীগণ এই শর্ত মেনে নিয়েছিলো যে, তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। অথচ তারা আমার প্রশাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং তাদের রক্তপাত আমার জন্য বৈধ হয়ে গেছে।'

জওয়াবে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন: 'তারা আপনার সাথে এমন জিনিসের শর্ত করেছে যার মালিক তারা নয়, অর্থাৎ তাদের জীবন। এটা চূড়ান্ত ব্যাপার যে, জীবন কাউকে দান করা যায় না। এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে বলে, তুমি আমাকে হত্যা করো এবং সে তাকে হত্যা করলো, তবে হত্যাকারীর উপর রক্তপণ (দিয়াত) ধার্য হবে। আপনি তাদের সাথে এমন শর্ত করেছেন যার এখতিয়ার আপনারই নেই। কারণ মুসলমানদের রক্তপাত তিনটি জিনিসের মধ্যে যে কোনো একটি ব্যতিত বৈধ হয় না। আপনি যদি তাদের জীবন সংহার করেন, তবে তা আপনার জন্য হালাল নয়। আপনার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শর্ত পূরণ করাই অধিক প্রয়োজনীয়।' (মানাকিবুল ইমাম আল আজম, ২য় খন্ড, পৃ. ১৬-১৭)

উপরোক্ত বাক্যে প্রশ্নকর্তা ও মুফতী উভয়ে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন যে, ঘটনাটি মুসলমানদের সাথে সম্পর্কিত ছিলো।

প্রশ্ন: আপনার পত্র পেয়েছি। আপনি যে সব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সে সম্পর্কে সংক্ষেপে বলছি যে, আবু বাকর আল জাসসাস, আল মওয়াফফাক আল মাক্কী ও ইবনুল বাযযার আল কারদারী নিশ্চিতই ফকীহগণের মধ্য গণ্য। অনুরূপভাবে আহকামুল কুরআন এবং আপনার উদ্ধৃত অন্যান্য গ্রন্থাবলীও সুপ্রসিদ্ধ কিতাব। কিন্তু তথাপি মর্যাদার বিচারে তাদের স্থান ইমাম সারাখসীর অনেক নিচে। অনুরূপভাবে তার আল মাবসূত গ্রন্থের মর্যাদাও আহকামুল কুরআন ও অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় হানাফী বিশেষজ্ঞদের মতে অনেক উর্ধ্বে। এজন্য ফিকহী বিষয়ে

ইমাম আজমের অভিমত নির্ধারণের ক্ষেত্রে সারাখসীর আল মাবসূত এর সিদ্ধান্তই নির্ভরযোগ্য হবে, আহকামুল কুরআন ইত্যাদির বক্তব্য নয়। আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রহ. মুহাককিক ইবনে কামাল থেকে ফকীহগণের স্তর বিন্যাস করতে গিয়ে ইমাম সারাখসীকে তৃতীয় স্তরে স্থাপন করেছেন এবং এই স্তরটি হচ্ছে মুজতাহিদ ফকীহগণের। তিনি আবু বাকর আল জাসসাসকে চতুর্থ স্তরে স্থাপন করেছেন যা কেবল মুকাল্লিদ (অনুগামী) ফকীহগণের স্তর।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বিদ্রোহ শীর্ষক বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাযহাব তাই নির্ধারিত হবে যা আল মাবসূত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, আহকামুল কুরআন বা ইতিহাসের অন্যান্য গ্রন্থে যা লিপিবদ্ধ আছে তা নয়।

এখন যায়েদ ইবনে আলী ইনবুল হুসাইন ও নফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহের ঘটনাবলীতে ইমাম আজম রহ. এর ভূমিকা সম্পর্কে বলা যায়, ঐতিহাসিক বিচারে আমি তাকে শতকরা একশ ভাগ সঠিক মনে করি। সকল ঐতিহাসিক একমত যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. তাদের উভয়ের বিদ্রোহে তাদের সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এই মাসয়ালার আইনগত অবস্থা ঐতিহাসিক অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। হানাফী ফিকহের সমস্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এমনকি যাহিরী মাযহাবের গ্রন্থাবলীতেও বিদ্রোহ প্রসংগে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাবে এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ন্যায়নিষ্ঠ শাসক তো দূরের কথা, যালেম স্বৈরাচারী ও জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শাসকের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করা অবৈধ এবং হারাম। অতএব আমাদেরকে পরস্পর বিরোধী এই দুই বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করতে হবে অথবা একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে বলা যায়, আমরা ফকীহগণের স্বীকৃতি মূলনীতি সামনে রেখে হানাফী ফকীহগণের বর্ণনাকে ঐতিহাসিকদের বর্ণন্যার উপর এজন্য অগ্রাধিকার দেব যে, মাযহাব (মতামত) নির্ধারণের ব্যাপারে মাযহাবী অভিমত বর্ণনাকারীদের বক্তব্যে অধিক নির্ভরযোগ্য। আর ঐতিহাসিকদের মধ্যে যারা ফকীহও, যেমন আবু বাকর আল জাসসাস আল রাযী, আল মুওয়াফফাক আল মাক্কী ও ইবনুল বাযযায, তারা যেহেতু মর্যাদার দিক থেকে মাযহাবের মূল বর্ণনাকারীদের সমকক্ষ নন, তাই তাদের বর্ণনাও অন্যদের বর্ণনার মোকাবিলায় নির্ভরযোগ্য গণ্য করা যাবে না। চাই ঐতিহাসিক বর্ণনা ও ঘটনাবলী বর্ণনার মুলনীতি অনুযায়ী তা যতো শক্তিশালীই হোক না কেন।

আর আমরা যদি সামঞ্জস্য বিধান করতে চাই, তবে আমার বুদ্ধিতে সামঞ্জস্য সাধনের উত্তম পন্থা হলো, যেহেতু যায়েদ ইবনে আলী রা.-এর বিদ্রোহের ঘটনা আপনার বক্তব্য অনুযায়ী ১২২ হিজরির সফর মাসে সংঘটিত হয়েছিল এবং নফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহের ঘটনা আপনার লেখা অনুযায়ী ১৪৫ হিজরিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলো এবং ইমাম আবু হানিফা রহ. আল্লামা ইবনে কাসীরের বক্তব্য (আল বিদায়া, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৭) অনুযায়ী ১৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। এভাবে নফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহের পর ইমাম সাহেব কমপক্ষে পাঁচ বছর জীবিত ছিলেন। এর ভিত্তিতে বলা

যায় যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. শেষ জীবনে নিজের পূর্বের মত পরিবর্তন করে বিদ্রোহ প্রসংগে নতুন মত এভাবে ব্যক্ত করেন, 'বিদ্রোহ হারাম, জায়েয নয়' এবং তিনি পূর্বতন মত থেকে প্রত্যাবর্তন করে থাকবেন এবং ঐ সময় হতে ইমাম আযম অপরাপর মুহাদ্দিসের অনুরূপ এই কথার প্রবক্তা হয়ে থাকবেন যে, 'বিদ্রোহ জায়েয নয় বরং হারাম। সংস্কার ও সংশোধনের জন্য বিদ্রোহের পরিবর্তে সত্য ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।' মোল্লা আলী আল কারী রহ. হয়ত এ কারণেই বলে থাকবেন: 'তাদের (প্রশাসকদের) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রসংগে বলা যায় যে, মুসলমানদের ঐকমত্য অনুযায়ী তা হারাম। চাই সে ফাসেক এবং জালেম হোক না কেন' (মিরকাত)।

উপরের আলোচনা থেকে যখন একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, বিদ্রোহ প্রসংগে ইমাম আজম রহ.-এর মাযহাব নাজায়েযের পক্ষে এবং মুসলিম বিদ্রোহীদের শাস্তি ফকীহগণের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড যেমন পূর্বের চিঠিতে ফকীহগণের উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। অতএব মাওসিলবাসীদের প্রসঙ্গেও আমার মতে ইমাম সারাখসী ও শায়খ ইবনুল হুমামের বর্ণনাই সঠিক। এই ঘটনা মুশরিক যিম্মীদের সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিলো, মুসলিম বন্দীদের সাথে নয়। কারণ মুসলিম বিদ্রোহীদের সম্পর্কে ইমাম সাহেবের মাযহাব হলো, তাদের হত্যা করা হবে। তার মাযহাব এই নয় যে, তাদের হত্যা করা যায়েজ নয় যদিও আল কারদারীর বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনা মুসলিম বিদ্রোহীদের সাথে সংশ্লিষ্ট মনে হয়।

জবাব: আপনার পত্র হস্তগত হয়েছে। আমার ধারণা এখন আমার দৃষ্টিভংগী আপনার নিকট উত্তমরূপে প্রতিভাত হবে। অনুগ্রহপূর্ব নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে চিন্তা করুন।

আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এই বিশেষ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর কর্মনীতি। আর আপনি যুক্তি প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে হানাফী মাযহাবের বক্তব্যসমূহ উদ্ধৃত করেছেন। আপনার মতো বিজ্ঞ ফকীহ এর সামনে একথা অজ্ঞাত থাকতে পারে না যে, আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত বা কর্মনীতি এবং হানাফী মাযহাব এক জিনিস নয়। আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত কেবল তার বক্তব্য ও কর্মের উপর প্রযোজ্য হতে পারে। আর হানাফী মাযহাব বলতে ইমাম সাহেব ছাড়াও তার সহচরগণ এবং পরের মুজতাহিদ ফকীহগণের অভিমতও তাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এমন অনেক জিনিস হানাফী মাযহাবভুক্ত হয়েছে, যা ইমাম সাহেব বা তাঁর সহচরদের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত নয়। এমনকি এই মাযহাবে এমন বিষয়ও বর্তমান আছে, যে সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের ফতোয়া (সমাধান) ইমাম আজম রহ.-এর বক্তব্যের বিপরীত।

আবু বাকর আল জাসসাস, আল মওয়াফফাক আল মাক্কী এবং ইবনুল বাযযায রহ. তাই প্রথম স্তরের ফকীহ না হোক কিন্তু ঐ স্তরের ফিকহ সম্পর্কে তো অজ্ঞাত হতে পারেন না যে, নিজ মাযহাবের সবচেয়ে বড় ইমামের সাথে অনুসন্ধান ছাড়াই এমন কথা ও কাজ সম্পৃক্ত করবেন, যা তার নিশ্চিত অভিমতের পরিপন্থী। বিশেষত আবু

বাকর আল জাসসাস রহ. তো ইমাম আযম রহ. এর খুবই নিকটতম যুগের লোক ছিলেন ইমাম সাহেবের ইন্তেকাল এবং তার জন্মের মাঝখানে মাত্র ১৫৫ বছরের ব্যবধান। বাগদাদে তিনি প্রবীণ হানাফী আলেমগণের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, যাদের মাঝে আবু হানিফা রহ.-এর চিন্তাগোষ্ঠীর (School of thoughts) বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত ছিলো। কোনো ভুল বক্তব্য যদি গুজবের মতো ইমাম সাহেবের প্রতি আরোপিত হয় তাহলে তিনি হতেন সর্বশেষ ব্যক্তি, যিনি তার সঠিক বা ভ্রান্ত সবকিছু আহকামুল কুরআনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী গ্রন্থে নকল করে বসতেন। ইমাম আজম-রহ. থেকে এই মত প্রত্যাহারের কথা যদি প্রমাণিত হতো, তবে সে সম্পর্কেও তিনি অনবহিত থাকতেন না এবং তা গোপনও করতেন না।

ইমাম সাহেবের এই মত প্রত্যাহারের ধারণা এ জন্যও যথার্থ নয় যে, তাই যদি হতো তবে মানসুর তাঁর জীবনের শত্রু হতেন না বরং এরপর তো তাঁর ও ইমাম সাহেবের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হতো। উপরন্তু কেউ ইংগিতে অথবা পরোক্ষেও একথা নকল করেননি যে, ইমাম সাহেব কখনও নফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করাকে ভ্রান্ত মনে করে থাকবেন।

আমার নিকট বিষয়টি সম্পূর্ণ নিসন্দেহ যে, আলোচ্য বিষয়ে ইমাম আযম রহ. এর অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গী তাই ছিলো, যা তাঁর নকলকৃত বক্তব্য ও ভূমিকা থেকে প্রমাণিত। অবশ্য হানাফী মাযহাবে পরবর্তীকালে সেই মতই স্বীকৃত হয়েছে, যা আপনি উল্লেখ করেছেন। এই মত স্বীকৃত হওয়ার কারণ হলো, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর যুগের হাদিসবেত্তাদের একটি দল যে মত পোষণ করতেন (যা আমি ইমাম আওযাইর বরাতে আমার প্রবন্ধে উল্লেখও করেছি), হিজরি দ্বিতীয় শতকের শেষ পর্যায় পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে ঐ মতই গোটা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতে গৃহীত হয় এবং এই রায়কে যুক্তিবাদী কালামশাস্ত্রবিদের মধ্যে আশআরীগণ (মুতাযিলাদের বিপরীতে) গ্রহণ করে। এই রায়ের জনপ্রিয়তা মূলত চূড়ান্ত দলিলের ভিত্তিতে নয় বরং বিদ্রোহের ঘটনাবলী থেকে ধারাবাহিকভাবে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, এখানে তার যথেষ্ট প্রভাব ছিলো। এ কারণে শরিয়তের সার্বিক কল্যাণের দাবি তাই মনে করা হলো, যা ফকীহগণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালের ফকীহগণ যে সিদ্ধান্তে পৌছেন, প্রথম হিজরি শতকের প্রবীণ ইমাম ও ফকীহগণের অভিমতও তাই ছিলো, এরূপ বক্তব্যের পেছনে আমি কোনো প্রমাণ খুঁজে পাইনি।

এটাও চিন্তার বিষয় যে, ১৯৫৭ সালের শেষ দিকে লাহোরে যে আন্তর্জাতিক আলোচনা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ইংলান্ডের একজন প্রাচ্যবিদ যথারীতি এই অভিযোগ করেছিলেন যে, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি একবার বিকৃত হয়ে যায় তবে তার পরিবর্তনের কোনো পন্থা ইসলামে নেই। এ অভিযোগের সমর্থনে আশআরী ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের বক্তব্যসমূহ পেশ করে তিনি বলেছিলেন, বিকৃতির প্রাদুর্ভাব হওয়ার ক্ষেত্রে ফকীহগণের এসব বক্তব্য অনুযায়ী শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে সত্য কথা তো বলা যেতে পারে, কিন্তু কোনো সম্মিলিত

প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব নয়। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত পেশ করা ব্যতীত আমাদের নিকট এই প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিলনা। এখন তাও যদি ভ্রান্ত হয়ে থাকে, তবে আপনি এই অভিযোগের কোনো জওয়াব আমাদের বলে দিন।

বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ প্রসঙ্গে একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, তারা যদি অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়, তবে তাদের (যোদ্ধাদের) হত্যা করা যেতে পারে এবং তাদের ধনসম্পদও লুণ্ঠন করা যেতে পারে। কিন্তু একথা কি সত্য যে, তারা যে এলাকায় বিদ্রোহ করে থাকবে, সেখানকার সমস্ত লোকের জানমাল হরণ এং তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা যেতে পারে? ফিকহী হুকুমের ব্যাখ্যা যদি এই হয়, তবে ইয়াযীদ বাহিনী হারার হৃদয় বিদারক ঘটনার পর মদিনার জনগণের বিরুদ্ধে যা কিছু করেছে, তা বৈধ হওয়া উচিত। এ উপর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও পরবর্তীকালের আলেম ও ফকীহগণ যে কঠিন আপত্তি উত্থাপন করেছেন, শেষ পর্যন্ত তার কি আইনানুগ মূল্য আছে? (তরজুমানুল কুরআন, নভেম্বরঃ ১৯৬৩, জানুয়ারিঃ ১৯৬৪)

০২. খেলাফত সংক্রান্ত আলোচনা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন -১

জবাবঃ (বিগত কয়েক মাসব্যাপী তরজমানুল কুরআনে খেলাফত সম্পর্কে যে নিবন্ধমালা প্রকাশিত হয়ে আসছে, সেই নিবন্ধমালার একটি 'খেলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য।' এর শেষাংশ এবং খেলাফত থেকে রাজতন্ত্র' শীর্ষক পুরো নিবন্ধটি নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন ও আপত্তি আমার কাছে এসেছে। এই সমস্ত প্রশ্ন সম্পূর্ণ উল্লেখ করে তার জবাব দিতে গেলে আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে পড়বে। এ জন্য আমি সেই সবকটি প্রশ্নের জবাব একত্রে এখানে দিচ্ছি। জবাবের প্রতিটি শিরোনাম থেকে প্রশ্নের ধরন আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। (আবুল আ'লা মওদূদী)

প্রকাশিত নিবন্ধমালার ধরনঃ সর্বপ্রথম জ্ঞাতব্য বিষয় হলোঃ যে নিবন্ধমালা নিয়ে এসব প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তা মূলত আমার একখানা বই এর দুটো অধ্যায়। মাসিক তরজমানুল কুরআনে বেশ কিছুদিন যাবত এই বই এর অধ্যায়গুলো কিস্তিতে কিস্তি তে প্রকাশিত হচ্ছে। এ ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। এর প্রথম অধ্যায়টি ছিলো 'কুরআনের রাজনৈতিক শিক্ষা'। দ্বিতীয় অধ্যায় 'ইসলামের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি'। তৃতীয় অধ্যায় 'খেলাফতে রাশেদা ও তার বৈশিষ্ট্য'। চতুর্থ 'খেলাফত থেকে রাজতন্ত্রে উত্তরণ'। এই শেষোক্ত অধ্যায়টিতে আমি আলোচনা করেছি যে, খেলাফতে রাশেদার স্থলে রাজতন্ত্র কিভাবে এলো এবং কি কারণে এলো। এরপর এখন পঞ্চম অধ্যায় তরজমানুল কুরআনে ছাপা আরম্ভ হয়েছে। খেলাফতের জায়গায় রাজতন্ত্র কায়েম হওয়ায় কি পার্থক্য সূচিত হলো, তার কি ফলাফল দেখা দিলো এবং এই পার্থক্য সূচিত হওয়ার পর মুসলমানরা নিজেদের ইসলামি জীবনধারা রক্ষার জন্য কি পথ অবলম্বন করলো, তা এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ অধ্যায় পরে প্রকাশিত হবে। মুসলমানদের মধ্যে উপদল সৃষ্টির সূচনা কিভাবে ও কি কি কারণে হলো, কি কি কারণে এই উপদলীয় কোন্দল বৃদ্ধি পেলো এবং এই বিশৃংখলা ও আরজকতার আমলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কর্মপদ্ধতি কি ছিলো, তা ঐ

অধ্যায়ে আলোচিত হবে। এরপর ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসূফের ভূমিকা আলোচিত হবে। মোটকথা এটা একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ, যার বিভিন্ন অধ্যায় একে একে পাঠকের সামনে আসছে। কাজটা সম্পূর্ণ হবার পর পূর্ণ গ্রন্থখানা পড়ে মতামত স্থির করলেই ভালো হতো।

এসব আলোচনার প্রয়োজন কি? এই নিবন্ধমালায় যে ঐতিহাসিক তথ্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে তা গৃহীত হয়েছে ইসলামের ইতিহাসের প্রামাণ্যতম গ্রন্থাবলী থেকে। পরবর্তীতে আমি সেই সব গ্রন্থের বিবরণ দেবো। আমি যতগুলো ঘটনা উল্লেখ করেছি তার বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়েছি এবং কোনো কথাই উৎসের বরাত না দিয়ে লিখিনি। মূল গ্রন্থাবলীর বিবরণের সাথে মিলিয়ে বিদ্বানগণ নিজেরাই দেখতে পাবেন যে, এ সব বিবরণ সেখানে আছে কিনা এবং আমি তাতে কোনো কমবেশি করেছি কিনা।

এ ইতিহাস কোথাও লুকানো অবস্থায় পড়ে ছিলনা যে আমি তা হঠাৎ করে জনসমক্ষে হাজির করেছি। শত শত বৎসর ধরে এ সব বৃত্তান্ত দুনিয়াময় প্রচারিত হচ্ছে এবং আধুনিক প্রকাশনা ব্যবস্থার কল্যাণে তা লক্ষ কোটি জনতার গোচরে এসেছে। কাফের ও মুমিন, শত্রু ও মিত্র নির্বিশেষে সকলেই তা পড়ছে। শুধু আরবি জানা লোকদের মধ্যেই এগুলো সীমিত নেই বরং প্রাচ্যবীদগণ সকল পশ্চিমা ভাষায় এবং আমাদের এতদ্দেশীয় লেখকগণ আমাদের ভাষায় ব্যাপকভাবে তা প্রকাশ করেছেন। এখন এগুলো লুকানোও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পাঠক সমাজকে একথাও বলতে পারিনে যে, তোমরা ইসলামের ইতিহাসের এই যুগটা অধ্যয়ন করো না। আর এ ঘটনাবলী নিয়ে সমালোচনা করতেও মানুষকে নিষেধ করতে পারিনে। অবিকৃত ও নির্ভুল উদ্ধৃতি সহকারে, যুক্তিসঙ্গত ও প্রামাণ্য পন্থায় এবং ভারসাম্যপূর্ণ ভঙ্গীতে আমরা নিজেরাই যদি এ ইতিহাস বর্ণনা না করি আর এ ইতিহাস থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত আহরণ করে সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্তভাবে জগতবাসীর সামনে উপস্থিত না করি, তাহলে তো পাশ্চাত্যের যেসব প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত এবং বিকৃত মানসিকতা ও মেজাজের অধিকারী মুসলিম লেখকবৃন্দ অত্যন্ত বিভ্রান্তির পন্থায় এ ইতিহাস বর্ণনা করতে অভ্যস্ত, তারা মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের মনমগজে ইসলামের ইতিহাসের একবারেই ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণা বদ্ধমূল করে দেবে। সম্ভবত এটা আপনার অজানা নয় যে, পাকিস্তানের সকল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম এ পরীক্ষায় এরূপ প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কুরআনে রাষ্ট্রের কি কি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। রসূল সা.-এর আমলে এসব মূলনীতির বাস্তবায়ন কিভাবে করা হয়েছে, খেলাফত কাকে বলে এবং খেলাফত কিভাবে ও কেন রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হলো? এখন এসব প্রশ্নের যে জবাব পশ্চিমা লেখকগণ দিয়েছেন, আপনি কি চান যে, মুসলিম ছাত্ররাও সেই জবাবই দিক? অথবা তার জবাবে ইমাম শাফেয়ী ও মোল্লা আলী ক্বারীর বক্তব্য উদ্ধৃত্ত করে দিক?[১]

১. উক্ত ইমামদ্বয় সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতভেদের সমালোচনা করতে নিষেধ করছেন। আলোচ্য উক্তিতে সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আমার বুঝে আসেনা, আমাদের ইতিহাসের এসব বাস্তব ঘটনাকে আমরা কেন সাহসের সাথে মোকাবিলা করবো না? নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত মনে ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা কেন সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়ে দেব না যে, খেলাফত আসলে জিনিসটা কি, তার বৈশিষ্ট্য কি কি এবং তার সাথে রাজতন্ত্রের নীতিগত পার্থক্য কি কি? আমাদের সমাজে খেলাফত থেকে রাজতন্ত্রে উত্তরণ কেন ও কিভাবে ঘটলো, আর এই পরিবর্তনের ফলে আমাদের সামষ্টিক জীবনে বাস্তবিক পক্ষে কি পার্থক্য সূচিত হলো? এই পার্থক্যের কুফল থেকে রক্ষা পাওয়া বা তা কমিয়া আনার জন্য আমাদের মুরব্বীরা কি চেষ্টা করেছেন যতোক্ষণ আমরা এ সব প্রশ্নের সুস্পষ্ট, যুক্তিসঙ্গত ও সুবিন্যস্ত জবাব না দেবো;ততোক্ষণ মানুষের ভুল বুঝাবুঝি দূর হবে না।

এ থেকে আপনি বুঝতে পারেন যে, কি উদ্দেশ্যে আমি এতো মাথা ঘামাচ্ছি। বহু বৎসর ধরে আমি এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলাম। কাজটা অপ্রীতিকর হলেও জরুরি ছিলো। আমি অপেক্ষায় ছিলাম যে, অন্য কেউ একাজ করে দিক। তাহলে আমি বেঁচে যাই। অবশেষে যখন দেখলাম, এ প্রয়োজনটি কেউ পূরণ তো করছেই না, অধিকন্তু এমন সব বই বেরুচ্ছে যার কোনটা অতিমাত্রায় বাড়াবাড়িতে পরিপূর্ণ, আবার কোনটা অতিরিক্ত নমনীয়। এ উভয় ধরনের বইপুস্তক খেলাফতের প্রকৃত ভাবমূর্তিকে বিকৃত করে দিচ্ছিলো। এমতাবস্থায় বাধ্য হয়ে আমি অনুভব করলাম যে, এ খিদমতটা এখন আমার উপর মুসলিম জনগণের একটা ঋণের বোঝা হিসাবে চেপে বসেছে এবং এ ঋণ আমাকে পরিশোধ করতেই হবে।

সত্যের আহবায়কের করণীয়: আমার কোনো কোনো বন্ধু আমাকে এ ধরনের পরামর্শ দিয়েও চিঠি লিখেছেন যে, আপনি বিতর্কিত বিষয়ে জড়িত হবেন না। আপনার কাজ হলো ইসলামের দাওয়াত দেয়া। কাজেই আপনি ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যান। সকলে আপনার কথা শুনবে। আমি তাদের এই উপদেশের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না যে, ইসলামের আহবায়ক বেচারা যদি বিরোধিতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হাদিস, তফসীর, ফেকাহ, আকায়েদ, ইতিহাস কোনোটা নিয়েই আলোচনা না করে, তাহলে সে কি নিয়ে আলোচনা করবে, আর তার দাওয়াতের বিভিন্ন দিক সে বিশ্লেষণ করবেই বা কিভাবে?

الصحابہ کلھم عدول এর সঠিক অর্থ কি? এমন আশংকাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ জাতিয় আলোচনা দ্বারা সাহাবিদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এবং তাদের উপর মুসলমানদের যে আস্থা থাকা দরকার তা ব্যাহত হয়। এ ব্যাপারে আমি কয়েকটি কথা স্পষ্ট করে বলে দেয়া জরুরি মনে করি।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সকল হাদিসবেত্তা, ফেকাহ বিশারদ ও মুসলিম আলেমদের যে আকিদা বিশ্বাস, আমারও তদ্রুপ। সকলেই বিশ্বাস করে যে, کلھم عدول অর্থাৎ তাঁরা সকলে বিশ্বস্ত ও সত্যনিষ্ঠ। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সাহাবায়ে কেরামই আমাদের কাছে ইসলাম পৌঁছার মাধ্যম। তাদের বিশ্বস্ততা ও সত্যনিষ্ঠায়

যদি সন্দেহ দেখা দেয়, তাহলে ইসলামই সন্দেহজনক হয়ে পড়ে। কিন্তু 'সাহাবাগণ সকলে বিশ্বস্ত ও সত্যনিষ্ঠ' একথার আমি এরূপ অর্থ গ্রহণ করিনা যে সকল সাহাবি নির্ভূল ও নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁরা সর্বপ্রকারের মানবীয় দূর্বলতার উর্ধ্বে ছিলেন এবং তারা কখনো কোনো ভুলভ্রান্তি করেননি। বরঞ্চ অমি এর এই অর্থ গ্রহণ করি যে, রসূল সা. থেকে রেওয়ায়েত করতে এবং তার সম্পর্কে কোনো কথা বলতে গিয়ে কোনো সাহাবি কখনো সত্যবাদিতা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি বা আদৌ কোনো অসত্য ভাষণের আশ্রয় নেননি। প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করা হলে ইতিহাস তো দূরের কথা, বিশ্বস্ততম ও প্রামাণ্যতম হাদিসও তা সমর্থন করেনা। আর শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করা হলে তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং তার বিরুদ্ধে কেউ নির্ভরযোগ্য সূত্রে কোনো বক্তব্য হাজির করতে পারবে না। এমনকি সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহের সময়েও, যখন বেশ কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তাদের ভেতর সংঘটিত হয়ে গেছে, তখনও কোনো পক্ষ নিজেদের স্বার্থের তাগিদে কোনো মনগড়া হাদিস বানিয়ে তাকে রসূল সা.-এর বাণী হিসেবে পেশ করেনি এবং কোনো পক্ষ তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় বলে কোনো হাদিসকে অস্বীকারও করেনি। এজন্য সাহাবায়ে কেরামের মতবিরোধের ক্ষেত্রে কখনো এ দুশ্চিন্তায় পড়া চাই না যে, কোনো সাহাবির বক্তব্য সঠিক এবং কোনো সাহাবির মত ভ্রান্ত বলে মেনে নিলে ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়বে। আমরা নির্বিশেষে সকল সাহাবি সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখি যে, তাঁরা রসূল সা. থেকে কোনো কিছু বর্ণনা করার বেলায় অকাট্যভাবে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত এবং প্রত্যেকের বর্ণানাকে নির্বিবাদে গ্রহণ করি।

ভুলভ্রান্তি সংঘটিত হলে কারো মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়না: নবী রসূল নয় এমন কোনো মানুষকেই, চাই সে সাহাবিই হোকনা কেন, আমি ত্রুটিমুক্ত মনে করি না। ত্রুটিহীনতা ও নিষ্পাপত্ব একমাত্র নবীদেরই বৈশিষ্ট্য। আমার মতে, নবী ব্যতীত আর কোনো মানুষ এ অর্থে মহৎ ও মর্যাদাবান নন যে, তাঁর কোনো ভুল হওয়া অসম্ভব কিংবা তিনি কখনো কার্যত ভুল করেননি। বরং তাদের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ হলো, জ্ঞান ও কর্মের দিক দিয়ে তাদের ভেতরে ভালো ও কল্যাণের দিকটাই প্রধান। এই ভালোর দিকটা যার ফেতরে যতো বেশি প্রাধান্য বিস্তার করে, আমি তাকে ততো বেশি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ বলে মানি। আর এ ধরনের ব্যক্তির কোনো কাজ বা কিছু কাজ ভুল হলেও আমার মতে তার মহত্ত্ব ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না।

এ ব্যাপারে আমার ও অন্যান্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সেই কারণে অনেক সময় অনেকে আমাকে ভুল বোঝেন। লোকেরা সাধারণত মনে করে যে, যে ব্যক্তি মহান, তিনি ভুল করেন না। আর যিনি ভুল করেন তিনি মহান নন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তারা চান যে, কোনো মহান ব্যক্তির কোনো কাজকে যেন ভুল বলা না হয়। তদুপরি তারা এও মনে করেন যে, যে ব্যক্তি এ ধরনের মহান ব্যক্তিগণের ভুল ধরে, সে তাদেরকে মহান বলে স্বীকার করেনা। আমার দৃষ্টিভঙ্গী এর বিপরীত। আমার মতে, নবী ছাড়া অন্য কোনো মহান ব্যক্তির কোনো কাজ ভুল হতে

পারে এবং তা সত্ত্বেও তিনি মহান থাকতে পারেন। আমি কোনো মহান ব্যক্তির কোনো কাজকে কেবল তখনই ভুল বলি, যখন তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হয় না এবং কোনো যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ দ্বারা তাকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করার উপায় থাকেনা। কিন্তু এরূপ শর্ত সাপেক্ষে যখন আমি নিশ্চিত হই যে, একটা ভুল কাজ সংঘটিত হয়েছে, তখন আমি সেটাকে ভুল বলে মেনে নেই এবং সেই কাজটার মধ্যেই নিজের সমালোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখি। এই ভ্রান্তি ধরা পড়ার কারণে আমার দৃষ্টিতে সেই মহান ব্যক্তির মহত্ত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় না এবং তার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধও আদৌ বিচলিত হয় না। যাকে আমি মহান বলে মানি, তার প্রকাশ্য ভুলভ্রান্তিকে অস্বীকার করবো, গোঁজামিল দিয়ে তা লুকাবো কিংবা অযৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে নির্ভূল সাব্যস্ত করবো, এর কোনো প্রয়োজন আমি অনুভব করি না। ভুলকে নির্ভূল ও সঠিক বলার অনিবার্য ফল দাঁড়াবে এই যে, আমাদের মূল্যবোধ বিকৃত হয়ে যাবে এবং যেসব ভুল কাজ বিভিন্ন মহান ব্যক্তি আলাদা আলাদাভাবে করেছেন, তা সব একত্রে আমাদের ভেতরে পুঞ্জিভূত হয়ে যাবে। বস্তুত গোঁজামিল ও জোড়াতালি দেয়া কিংবা প্রকাশ্য দৃশ্যমান ব্যাপারগুলোকে ধামাচাপা দেয়াতে আমার মতে কোনো কিছু শোধরায় না বরং বিকৃত হয়। এতে বরঞ্চ সাধারণ মানুষ এরূপ ভ্রান্ত ধারনায় লিপ্ত হবে যে, আমাদের যেসব মহাপুরুষ বস্তুতই শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ মার্গে উপনীত হয়েছিলেন, আমরা বোধ হয় তাদের ইতিহাসও এরকম বিকৃত করে ফেলেছি।

সাহাবিদের মধ্যে মানের তারতম্যঃ সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে হাদিস ও সীরাত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, রসূল সা.-এর সাহচর্যের মর্যাদায় তো তারা সবাই সমান। কিন্তু জ্ঞান, গরিমা, রসূল সা.-এর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক ভাবধারা অর্জন এবং তার সাহচর্য ও শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মানের তারতম্য ছিলো। নবুয়াতের প্রদীপ যে সমাজে প্রজ্জ্বলিত ছিলো, সেটা মানুষেরই সমাজ ছিলো। সে সমাজের সকল মানুষ ঐ প্রদীপ থেকে সমান আলো আহরণ যেমন করেনি, তেমনি সবাই তার সমান সুযোগও পায়নি। তাছাড়া প্রত্যেকের স্বভাব ও মেজাজ ছিলো বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের। সবার গুণমাধুরী, দুর্বলতা ও দোষত্রুটির এক রকমের ছিলনা। তারা সকলে নিজ মেধা ও প্রতিভা অনুসারে রসূল সা.-এর সাহচর্য ও শিক্ষার প্রভাব কমবেশি গ্রহণ করেছিলো। তবে তাদের মধ্যেও এমন লোকও থাকা সম্ভব ছিলো এবং বাস্তবিক পক্ষে ছিলো, তাদের মধ্যে চরিত্রশুদ্ধির এই সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ সত্ত্বেও কোনো না কোনো দিক দিয়ে কোনো দূর্বলতা থেকে গিয়েছিলো। এটা একটা অকাট্য সত্য ও অনস্বীকার্য বাস্তবতা। সাহাবায়ে কেরামের আদব রক্ষার স্বার্থে এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করাও জরুরি কিছু নয়।

মহাপুরুষদের কার্যকলাপের সমালোচনার পদ্ধতিঃ সাধারণভাবে সকল অনন্য সাধারণ মুসলিম মনীষীদের এবং বিশেষভাবে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আমার নীতি হলো, যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাহায্যে কিংবা বিশ্বস্ত ও

প্রামাণ্য বর্ণনার মাধ্যমে তাদের কোনো উক্তি বা কর্মের সঠিক তাৎপর্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত সেই তাৎপর্য গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় এবং অনন্যোপায় না হওয়া পর্যন্ত তাকে ভ্রান্ত আখ্যা দেয়ার দৃষ্টতা দেখানো সমীচীন নয়। অপরদিকে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার সীমা অতিক্রম করে এবং গোঁজামিল দিয়ে সত্যিকার ভ্রান্তিকে ধামাচাপা দেয়া অথবা ভুলকে সঠিক বানানোর চেষ্টা করা আমার মতে শুধু যে ন্যায়নীতি ও তাত্ত্বিক জ্ঞান গবেষণারই প্রতিকূল তা নয় বরং তাকে আমি ক্ষতিকরও মনে করি। কেননা এ ধরনের আনাড়ী ওকালতী দ্বারা কাউকেই খুশি বা তৃপ্ত করা যায় না। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, সাহাবা ও অন্যান্য মহান ব্যক্তিবর্গের আসল মহৎ গুণাবলী সম্পর্কে আমরা যা কিছু বলে থাকি, তাও সন্দেহভাজন হয়ে পড়ে। এজন্য যে ক্ষেত্রে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে কোনো জিনিস ভুল বলে প্রতিভাত হবে, সেখানে গোঁজামিলের ব্যাখ্যা দেয়ার চাইতে সোজাসুজি বলে দেয়াই আমার মতে সঙ্গত যে, অমুক বুজুর্গের অমুক কথা বা কাজ ভুল ছিলো। মানুষমাত্রেই ভুলত্রুটি হয়ে থাকে, তা সে যতো বড় মহামানবই হোক না কেন। এই ভুলত্রুটিতে তাদের মহত্ত্ব ও মর্যাদায় কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। কেননা তাদের মর্যাদা ও মান তাদের বড় বড় কৃতিত্ব দ্বারাই নির্ণিত হয়ে থাকে, একটা দুটো ভুলভ্রান্তি দ্বারা নয়।

আলোচনার তথ্যগত উৎস: 'খেলাফতে রাশেদা ও তার বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক নিবন্ধের শেষাংশে এবং 'খেলাফত থেকে রাজতন্ত্রে' শীর্ষক গোটা নিবন্ধে আমার ব্যবহৃত তথ্যগুলো যেসব বই কিতাব থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। কেউ কেউ সেসব গ্রন্থাবলী সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সাধারণত আমি দুধরনের বই কিতাব থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এক হলো: ইবনে আবুল হাদীদ, ইবনে কুতায়বা এবং আল মাসউদীর গ্রন্থাবলী। এসব গ্রন্থ থেকে আমি নিছক প্রাসঙ্গিক দুএকটা ঘটনা নিয়েছি। দ্বিতীয় হলো, ইবনে সাদ ইবনে আবদুল বার, ইবনুল আসীর, ইবনে জারীর তাবারী এবং কাছীরের ইতিহাসসমূহ। এদের বর্ণনাসমূহের উপর আমি আমার গোটা আলোচনাই দাঁড় করিয়েছি।

ক. ইবনে আবুল হাদীদ: প্রথমোক্ত উৎস সমূহের মধ্যে ইবনে আবুল হাদীদ যে একজন শিয়া ব্যক্তিত্ব, তা সবার জানা। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে আমি শুধু এই ঘটনাটা নিয়েছি যে, আলী রা. বাইতুলমাল থেকে নিজের সহোদর ভাই আকিলকেও প্রাপ্যের অতিরিক্ত দিতে অস্বীকার করেছিলেন। এটা আসলে একটা সত্য ঘটনা। অন্যান্য ঐতিহাসিকও বলেন যে, এ কারণেই আকিল স্বীয় ভাইকে ত্যাগ করে বিরোধী শিবিরে গিয়ে ভিড়েছিলেন। উদাহরণস্বরুপ, ইসাবা ও ইস্তিয়াব গ্রন্থ দু'টিতে আকিলের জীবনী পড়ে দেখুন। তাই কেবল ইবনে আবুল হাদীদ শিয়া হওয়ার কারণে এই সত্য ঘটনাকে অস্বীকার করা যায়না।

খ. ইবনে কুতায়বা: ইবনে কুতায়বা শিয়া ছিলেন কিংবা শিয়াদের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিলো, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তিনি অনির্ভরযোগ্যও ছিলেন না কখনো। তিনি আবু হাতেম সাজিস্তানী ও ইসহাক বিন রাহওয়ের মতো ইমামদের শিষ্য ছিলেন এবং

দিনাওয়ারের কাজী ছিলেন। ইবনে কাছীর তাঁকে كان ثقة نبيلا 'নির্ভরযোগ্য ও সম্ভ্রান্ত জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনে হাজার তাঁকে صدوق 'পরম সত্যভাষী' এবং খাতিব বাগদাদী كان ثقة دينا فاضلا 'বিশ্বস্ত, দীনদার ও সুপণ্ডিত' বলে রায় দিয়েছেন। মাসলামা বিন কাসেম মন্তব্য করেন: 'তিনি অত্যন্ত সত্যভাষী ও সুন্নি মুসলমান ছিলেন। অনেকের মতে তিনি ইসহাক বিন রাহওয়ের অনুসারী ছিলেন।' ইবনে হাজমের বক্তব্য হলো: 'তাঁর দীনদারী ও পান্ডিত্য, দুটোই নিভর্রযোগ্য'। ইবনে হাজার তাঁর মত ও পথ সম্পর্কে বলেন: 'সালাফীর মতে, ইবনে কুতায়বা নির্ভরযোগ্য ও সুন্নি ছিলেন। কিন্তু হাকেম চিন্তাধারার দিক দিয়ে তার বিরোধী ছিলেন। তবে আমার ধারণা, চিন্তাধারা বলতে তিনি 'নাসেবিয়াত' বুঝিয়েছেন। কেননা ইবনে কুতায়বা 'আহলে বাইত' (রসূল সা.-এর বংশধর) থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন।' কিন্তু হাকেম ছিলেন এর বিপরীত।'

এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, শিয়া হওয়া তো দূরের কথা, ইবনে কুতায়বার বিরুদ্ধে উগ্র সুন্নিপন্থী হওয়ার অভিযোগ ছিলো। ইবনে কুতায়বার গ্রন্থ 'আল ইমামাতু ওয়াসসিয়াসাহ' এর কথা অবশ্য ভিন্ন। এটা ইবনে কুতায়বার লেখা নয়, এমন কথা কেউ জোর দিয়ে বলেনি। এ ব্যাপারে কেবল সন্দেহ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কেননা এতে কিছু কিছু বক্তব্য এমন সন্নিবেশিত হয়েছে, যা ইবনে কুতাইবার জ্ঞান ও অন্যান্য গ্রন্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। আমি নিজে এ কিতাবটা আদ্যোপান্ত পড়েছি। এর কোনো কোনো রেওয়ায়েতকে আমিও সংযোজন মনে করি। কিন্তু তাই বলে পুরো গ্রন্থখানাকে প্রত্যাখান করা আমার মতে বাড়াবাড়ি। এতে বেশ কিছু কাজের কথা রয়েছে। তাছাড়া বইটা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার মতো কোনো আলামত এতে দেখা যায়না। এ বই থেকে আমি এমন কোনো বক্তব্য গ্রহণ করিনি, যার তত্ত্বগত সমর্থন অন্য কোনো পুস্তক থেকে পাওয়া যায় না। আমার লিখিত উদ্ধৃতিগুলো থেকেই এ কথার যথার্থতার প্রমাণ মেলে।

গ. আল মাসউদী: মাসউদী নিসন্দেহে মুতাজিলা (ভিন্ন মতাবলম্বী) শিয়া ছিলেন। তবে তিনি উগ্র শিয়া ছিলেন একথা বলা ঠিক নয়। 'মুরুজুয যাহাব' গ্রন্থে তিনি আবু বকর রা. ও ওমর রা. সম্পর্ক যা লিখেছেন পড়ে দেখবেন। কোনো উগ্রপন্থী শিয়া ব্যক্তি প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা সম্পর্কে এ ধরনের বক্তব্য রাখতে পারে না। তবুও শিয়া মতের দিকে ঝোঁক যে তার ছিলো একথা সত্য। এই ব্যক্তির কাছ থেকেও আমি এমন কোনো বর্ণনা নেইনি, যার সমর্থনকারী বর্ণনা অন্যান্য কিতাব থেকে উদ্ধৃত করিনি।

এবার দ্বিতীয় প্রকারের উৎসগুলোর বর্ণনায় আসা যাক। এসব গ্রন্থের উদ্ধৃত উক্তিগুলোর উপর আমার গোটা আলোচনার ভিত্তি নির্ভরশীল।

ক. ইবনে সাদ: এসব উৎসের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখের দাবি রাখে মুহাম্মদ ইবনে সাদ। ইবনে সাদের বর্ণিত তথ্যসমূহকে আমি অন্যান্যের বর্ণিত তথ্যাবলীর উপর

অগ্রাধিকার দিয়েছি এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যে, ইবনে সাদের বর্ণনার বিপরীত কোনো তথ্য অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে গ্রহণ না করি। এর কারণ হলো, তিনি খেলাফতে রাশেদার আমলের নিকটতম যুগের লেখক। তিনি ১৬৮ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ২৩০ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তিনি অত্যন্ত ব্যাপক তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি। সীরাত ও ইসলামি যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসের ব্যাপারে সকল হাদিসবেত্তা ও তাফসীরকার তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করেছেন। আজ পর্যন্ত কোনো জ্ঞানীজন তার প্রতি শিয়া হওয়ার সন্দেহ পর্যন্ত প্রকাশ করেননি। ঐতিহাসিক খতিব বাগদাদী বলেন: 'মুহাম্মদ বিন সাদ আমাদের কাছে ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর বর্ণিত হাদিস তাঁর সত্যভাষী হওয়ার প্রমাণ দেয়। কেননা তিনি তার বহু সংখ্যক বর্ণনায় যাচাই বাছাই প্রয়োগ করেছেন।' হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: احد الحفاظ الكبار الثقات المتحرين 'তিনি হাদিসের একজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও সতর্ক হাফেজ।' ইবনে খাল্লাকান বলেন: كان صدوقا وثقة 'তিনি অত্যন্ত সত্যভাষী ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন।' 'হাফেজ সাখাওয়ী বলেন: 'তিনি নির্ভরযোগ্য, যদিও তাঁর উস্তাদ ওয়াকেদী দূর্বল ছিলেন।' ইবনে তাগরী বারভী বলেন: 'ইয়াহিয়া ইবনে মাঈন ছাড়া সকল হাফেজে হাদিস তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।'

স্বয়ং তাঁর উস্তাদ ওয়াকেদীকে হাদিসের বর্ণনাকারী হিসেবে দূর্বল বলা হলেও সীরাত ও ইসলামি যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস বর্ণনাকারী হিসেবে সকল হাদিসবেত্তা তার উপর নির্ভর করেছেন। তাঁর অন্যান্য উস্তাদ হিশাম বিন মুহাম্মদ বিন সায়েব কালবী এবং আবু মাশারের অবস্থাও তদ্রুপ। অর্থাৎ তাঁরা সবাই সীরাত ও যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাসে নির্ভরযোগ্য।

খ. ইবনে জারীর তাবারী: ইবনে সাদের পরেই ইবনে জারীর তাবারীর স্থান। একধারে তাফসির বিশারদ, হাদিসবেত্তা, ফেকাহবিদ ও ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান সর্বজন স্বীকৃত। বিদ্বান ও পরহেজগার হিসাবেও তাঁর স্থান অনেক উচ্চে। তাকে কাজীর পদ অলংকৃত করার আহবান জানানো হয়েছিল। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রধান ন্যায়পালের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হলে তিনি তাও অস্বীকার করেন। ইমাম ইবনে খুজায়মা তাঁর সম্পর্কে বলেন: 'বর্তমান ভূ-পৃষ্ঠে ইবনে জারীরের চেয়ে জ্ঞানী কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।' ইবনে কাছীর বলেন: 'কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান এবং তদনুসারে কাজ করার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন মুসলমানদের অন্যতম ইমাম (পুরোধা ব্যক্তি)।' ইবনে হাজার বলেন: 'ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য ইমাম।' খতীব বাগদাদী বলেন: 'তিনি আলেমদের অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাঁর কথা অনুসারে রায় দেয়া হয় এবং তাঁর মতামত অনুসন্ধান করা হয়। কেননা জ্ঞান ও মর্যাদার দিক দিয়ে তিনি এর যোগ্য। জ্ঞান বিজ্ঞানের এতো অধিক সংখ্যক শাখায় তার পান্ডিত্য বিস্তৃত ছিলো যে, তার সমকালীন লোকদের মধ্যে কেউ তার সমকক্ষ ছিলনা।'

ইবনুল আসীর বলেন: 'ইতিহাস লেখকদের মধ্যে আবু জাফর ইবনে জারির সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য।'

হাদিস শাস্ত্রে তাঁকে স্বতন্ত্র এক হাদিসবেত্তা বলে স্বীকার করা হয়। ফেকাহ্ শাস্ত্রে তিনি নিজেই একজন মুজতাহিদ ছিলেন এবং তাঁর মাযহাব একটি মুস্তী মাযহাব রূপে গণ্য হতো। ইতিহাসের ব্যাপারে তার উপর নির্ভর করেনি এমন লোক পাওয়া দুষ্কর। বিশেষত ইসলামের ঘোর আরজকতার যুগ সম্পর্কে তো গবেষক ও বিশ্লেষকগণ তাঁর মতামতের উপরই অধিকতর নির্ভর করেছেন। ইবনুল আসীর স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থ 'আল কামেলে'র ভূমিকায় লিখেছেন, 'সাহাবায়ে কেরামের কলহ কোন্দলের ব্যাপারে আমি অন্য সকল ঐতিহাসিকের তুলনায় ইবনে জারীর তাবারীর তথ্যের উপরই বেশি নির্ভর করেছি। কেননা, তিনিই যথার্থ দক্ষ ও সূক্ষ্ম বিচারক, ব্যাপকতর জ্ঞানের অধিকারী, নির্ভুল আকিদা বিশ্বাস পোষণকারী ও সত্যনিষ্ঠ ইমাম।' ইবনে কাসীরও ঐ যুগের ইতিহাসের ব্যাপারে ইবনে জারীরের মতামত অনুসরণ করেছেন এবং লিখেছেন, আমি শিয়াদের পরিবেশিত তথ্য আগ্রহ্য করে ইবনে জারীরের মতামতের উপর অধিকতর নির্ভর করেছি।

فانه من ائمة هذا الشأن 'কেননা তিনি এরূপ মর্যাদাসম্পন্ন ইমামই ছিলেন।' কতিপয় ফেকাহ শাস্ত্রীয় মাসয়ালা ও 'গদীরে খুম'-এর ব্যাপারে শিয়া দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে মতৈক্য হওয়ার কারণে কেউ কেউ অনর্থক তাকে শিয়া আখ্যায়িত করে ফেলেছে। একজনতো তাকে ইমামিয়া শিয়া মতাবলম্বীদের ইমাম বলে অভিহিত করেছেন। অথচ সুন্নি ইমামদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার কোনো মতই শিয়া মতের সাথে মেলেনা, চাই তা ফেকাহ সংক্রান্ত মাসয়ালা নিয়ে হোক অথবা কোনো হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয়ের ব্যাপারে হোক। ইমাম ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে তো আপনার জানাই আছে যে, শিয়া মতবাদের নামগন্ধও যে ব্যক্তির মধ্যে আছে, তাকে তিনি ক্ষমা করেন না। অথচ মুহাম্মদ ইবনের জারীর তাবারীর তাফসির সম্পর্কে তিনি রায় দিয়েছেন যে, প্রচলিত সকল তাফসিরের মধ্যে তাঁর তাফসিরই সব চাইতে শুদ্ধ।

وليس فيه بدعة এ তাফসিরে কোনো বিদয়াত নেই।'[২] আসলে হাম্বলীরাই সর্বপ্রথম ইবনে জারীরের উপর শিয়া হওয়ার অপবাদ আরোপ করে। কারণ তিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে ফকীহ বলে স্বীকার করতেন না, শুধু হাদিসবেত্তা হিসাবে মানতেন। এজন্য ক্রুদ্ধ হাম্বলীরা তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর শত্রু হয়ে গিয়েছিলো এবং তাঁর কাছে যেতে লোকজনকে নিষেধ করতো। এমনকি তাঁর ইন্তিকালের পর তারা তাঁকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন পর্যন্ত করতে দেয়নি। ফলে তাঁকে তাঁর নিজ বাড়িতেই সমাহিত করা হয়।[৩] এই বাড়াবাড়ির জন্যই ইমাম ইবনে খোযায়মা বলেন: لقد ظلمته الحنابل 'হাম্বলীরা তাঁর উপর জুলুম করেছে।' তাঁর দূর্নামের আরো একটা কারণ হলো, তাঁর সমকালীন ইমামদের মধ্যে 'মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী' নামে

---

২. ফাতওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, ২য় খন্ড, ১৯২ পৃ., মাতবায়ায়ে কুরদিস্তান আল ইলমিয়া, মিশর, ১৩২৬ হি.।
৩. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১১খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৬।

অন্য এক ইমাম ছিলেন এবং তিনি শিয়া ছিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বয়ং চোখ মেলে 'তাফসিরে ইবনে জারীর' ও তারীখে তাবারী' পড়েছে, সে কখনো এরূপ ভুল ধারণায় লিপ্ত হতে পারে না যে, দুখানা কিতাব সেই শিয়া মতাবলম্বী মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারীর কর্তৃক লিখিত।[৪]

গ. ইবনে আব্দুল বার: তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন হাফেজ আবু ওমর ইবনে আব্দুল বার। হাফেজ যাহাবী স্বীয় গ্রন্থ 'তাযকিরাতুল হুককাযে' তাকে 'শায়খুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আবুল ওলীদ আল্‌বাজী বলেন: 'স্পেনে আবু ওমরের মতো হাদিসবেত্তা আর কেউ ছিলনা।' ইবনে হায্‌ম বলেন: 'হাদিস তত্ত্বে আমার জানামতে তার সমকক্ষ কেউ ছিলো না, তার চেয়ে উত্তম হওয়াতো দূরের কথা।' ইবনে হায্‌ম আরো বলেন: 'তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর কোনো জুড়ি নেই। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আল ইস্তিয়াব। সাহাবিদের জীবনী বিষয়ে এর সমতুল্য কোনো গ্রন্থ নেই।'

বস্তুত সাহাবিদের জীবনেতিহাসের ব্যাপারে আল ইস্তিয়াবের উপর নির্ভর করেননি এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর এ গ্রন্থ পড়লে এর লেখক শিয়া মতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন বলে সন্দেহ করার কোনোই অবকাশ থাকে না।

ঘ. ইবনুল আসীর: চতুর্থ ব্যক্তি হচ্ছেন ইবনুল আসীর। তাঁর লেখা ইতিহাস গ্রন্থ 'আল কামেল' এবং 'উসূদুল গাবাহ' ইসলামের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীর অন্যতম বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে সকল গ্রন্থকারই এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন। তার সমকালীন কাজী ইবনে খাল্লাকান বলেন: 'তিনি হাদিসের সংরক্ষণ, হাদিসতত্ত্ব ও হাদিসের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিদ্যায় ইমাম ছিলেন, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে সুবিজ্ঞ ছিলেন, এবং আরব জাতির বংশ পরিচয় ও তাদের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।'

শিয়া মতবাদের প্রতি তাঁর সামান্যতম ঝোঁক ছিলো এমন ধারণা কেউ প্রকাশ করেনি। স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, আমি সাহাবায়ে কেরামের বিরোধ বিতর্কের বিবরণ দিতে গিয়ে অন্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছি।

ঙ. ইবনে কাসীর: পঞ্চম ব্যক্তি ইবনে কাসীর। তাফসিরকার, হাদিসবেত্তা ও ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর মর্যাদা সমগ্র মুসলিম জগতে স্বীকৃত। তার রচিত ইতিহাসগ্রন্থ 'আল বিদায়াহ ওয়ান্ নিহায়াহ' ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। 'কাশফুজ্ ছুনুন' গ্রন্থের লেখকের মতে এ গ্রন্থের সবচেয়ে চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হলো: 'এ গ্রন্থ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ তথ্য যাচাই বাছাই করে।' হাফেজ যাহাবী তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন: 'ফতোয়া বিশারদ, দক্ষ হাদিসবেত্তা, সূক্ষ্মদর্শী ফেকাহশাস্ত্রবিদ, হাদিস বর্ণনায় পরিপক্ক এবং অন্যদের মতামত উদ্ধৃত্ত করে তাফসির করার সিদ্ধহস্ত ইমাম।'

---

৪. সুন্নী ইবনে জারীর এবং শিয়া ইবনে জারীর উভয়ের জীবন চরিত হাফেয ইবনে হাজর প্রণীত 'লিমানুল মীযান' ৫ম খ-ের পৃষ্ঠা ১০০ থেকে ১০৩ পর্যন্ত পড়ে দেখুন।

দুটো কারণে আমি বিশেষভাবে তাঁর ইতিহাসের উপর নির্ভর করেছি। প্রথমত শিয়া মতবাদের প্রতি ঝোঁক থাকা তো দূরের কথা, তিনি এর কাঠোর বিরোধী। শিয়াদের বর্ণিত তথ্যাবলী তিনি বলিষ্ঠভাবে খণ্ডন করেন। সাহাবায়ে কেরামের কারোর ভাবমূর্তি যথাসাধ্য ক্ষুণ্ন হতে দেননি। বিশৃংখলার যুগের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি শুধু মোয়াবিয়া রা.-এর নয় বরং এজিদের পর্যন্ত সাফাই দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এতদসত্ত্বেও এতো সততা বজায় রেখে চলেছেন যে, ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো ঘটনা ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করেননি। দ্বিতীয় কারণ হলো, তিনি কাজী আবু বকর ইবনুল আবারী ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া, উভয়ের উত্তরসূরী। কাজী আবু বকরের গ্রন্থ 'আল আওয়াসেম মিনাল কাওয়াসেম' এবং ইবনে তাইমিয়ার 'মিনহাজুস সুন্নাহ' গ্রন্থ তার সুবিদিত। ইবনে তাইমিয়ার তিনি শুধু শিষ্য নন, বলতে গেলে তাঁর প্রেমিক ছিলেন এবং তাঁর কারণে তিনি অনেক বিপদেও পতিত হয়েছেন।[৫] এ জন্য তিনি শিয়াদের বর্ণনা দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হতে পারেন, অথবা তা গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো শৈথিল্য দেখাতে পারেন অথবা কাজী আবু বকর ও ইবনে তাইমিয়া যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারেন, এরূপ সন্দেহ আমি করতে পারিনা।

এসব ইতিহাস কি নির্ভরযোগ্য নয়ঃ এখন ভেবে দেখুন আমি এ সব উৎস থেকেই আমার আলোচনার যাবতীয় উপাদান সংগ্রহ করেছি। এসব গ্রন্থ যদি সে যুগের ইতিহাস সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য না হয়ে থাকে, তাহলে ঘোষণা করে দিন যে, রসূল সা.-এর যুগ থেকে অষ্টম হিজরি শতক পর্যন্ত সময়কার কোনো ইসলামি ইতিহাসের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। কেননা নবুয়ত যুগ থেকে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত গোটা ইসলামি ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফার ইতিহাসসহ, এ সব গ্রন্থের মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এগুলো যদি বিশ্বাসযোগ্য না হয়ে থাকে, তাহলে এসব কিতাবের বর্ণিত খেলাফতে রাশেদার ইতিহাস, ইসলামের ইমামগণের জীবনবৃত্তান্ত এবং তাদের কর্ম ও অবদান সবই মিথ্যার ঝুলি ছাড়া আর কিছু নয়। এ সব তথ্য আমরা কারোর কাছে আত্মবিশ্বাসের সাথে পরিবেশন করতে পারবো না।

জগতবাসী কখনো বিশ্বাস করবে না, আর জগতবাসী দূরে থাক, স্বয়ং মুসলমানদের বর্তমান বংশধররাও কখনো মেনে নিতে পারবে না যে, এসব ইতিহাসে আমাদের পূর্ব পুরুষদের যে সব সদগুণ ও শুভকর্মের বিবরণ পাওয়া যায় তাতো সবই শুদ্ধ, কিন্তু এসব গ্রন্থ থেকেই যে সব ত্রুটি বিচ্যুতির বিবরণ পাওয়া যায় তা সব ভুল। আর যদি আপনি মনে করেন শিয়াদের ষড়যন্ত্র এতো শক্তিশালী ছিলো যে, এতো বড় বড় সুন্নি মনীষীও তাদের বিভ্রান্তিকর তথ্যাবলী থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি এবং তাদের লেখা বই কিতাবেও শিয়াদের বর্ণনা অনুপ্রবেশ করে সে যুগের গোটা ইতিহাসকে বিকৃত করে ফেলেছে, তাহলে আমি ভেবে অবাক হই যে, এই হস্তক্ষেপ থেকে আবু

---

৫. দেখুন, আদ্দুররুল কামেন, ইবনে হাজার প্রণীত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৪, প্রকাশনা দায়েরাতুল মায়ারেফ, হায়দারাবাদ ১৩৪৮ হিজরি।

বকর রা.ও ওমর রা.-এর জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁদের আমলের ইতিহাস কিভাবে নিরাপদ থাকতে পারলো?

ওকালতির মৌলিক ত্রুটি: ঐতিহাসিক তথ্যের উৎস সংক্রান্ত এ আলোচনার সমাপ্তি টেনে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে আমি এটাও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, আমি কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবীর গ্রন্থ 'আল আওয়াসেম মিনাল কাওয়াসেম' ইমাম ইবনে তাইমিয়ার গ্রন্থ 'মিনহাজুস সুন্নাহ' এবং শাহ আব্দুল আজীজের গ্রন্থ 'তোহফায়ে ইসনা আশারিয়া'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিনি কেন? আমি এই মনীষীবর্গের অত্যন্ত ভক্ত এবং এমন ধারণা ঘুর্ণাক্ষরে আমার মনে স্থান পায়না যে, এসব ব্যক্তি তাঁদের সততা, বিশ্বস্ততা ও বিশুদ্ধ তথ্য উদঘাটনের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নন। কিন্তু যে কারণে আমি এ সমস্যার ব্যাপারে তাঁদের উপর পুরোপুরি নির্ভর করার পরিবর্তে সরাসরি মূল উৎসসমূহ থেকে নিজেই তথ্যানুসন্ধান ও স্বাধীনভাবে মত স্থির করার পথ অবলম্বন করেছি তা হলো, এই তিন ব্যক্তি মূলত শিয়াদের গুরুতর অভিযোগসমূহ এবং তাদের বাড়াবাড়ি খণ্ডন এর উদ্দেশ্যেই এই কিতাবগুলো লিখেছেন। এ জন্য তাদের অবস্থান আত্মপথ সমর্থনকারী উকিলের মতো হয়েছে। ওকালতি, তা বাদী বিবাদী যে পক্ষেরই হোক না কেন, তাতে স্বভাবতই মানুষ শুধুমাত্র নিজের মোয়াক্কেলের মতামতকে মজবুত করার উপাদান সংগ্রহেই একান্ত ভাবে নিয়োজিত থাকে, আর যে সব তথ্য দ্বারা তার মোয়াক্কেলের মতামত দূর্বল হয় তা এড়িয়ে যায়। বিশেষত কাজী আবু বকর তো এ ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। নিজে সরাসরি ইতিহাস অধ্যায়ন করেছে এমন কোনো লোক তাঁর বক্তব্য পড়ে ভালো ধারণা পোষণ করতে পারেনা। (অসম্পূর্ণ) (তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর: ১৯৬৫)

০৩. খেলাফত সংক্রান্ত আলোচনা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন-২:

জবাব: এবার আমি আমার উক্ত ধারাবাহিক নিবন্ধমালায় আলোচিত মূল সমস্যাগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি।

আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে ওসমান রা.-এর নীতির ব্যাখ্যা: মুসলিম উম্মাহর অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক ওসমান রা. স্বীয় আত্মীয় স্বজনের ব্যাপারে যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন, সে সম্পর্কে এ কথা কখনো আমার চিন্তায়ও আসেনি যে, নাউজুবিল্লাহ তার পেছনে কোনো খারাপ নিয়ত সক্রিয় ছিলো। ঈমান আনার পর থেকে শাহাদাত লাভ করা পর্যন্ত তাঁর সমগ্র জীবন সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি রসূল সা.-এর একনিষ্ঠতম ও প্রিয়তম সাহাবিদের অন্যতম ছিলেন। ইসলামের জন্য তাঁর ত্যাগ তিতিক্ষা, তার অতি পূতপবিত্র চরিত্র এবং পরহেজগারী ও শালীনতা দেখে কোনো বিবেকমান ও কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ ভাবতেই পারে না যে, এমন চরিত্র ও স্বভাবের অধিকারী মানুষ অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আজকালকার রাজনৈতিক পরিভাষায় যাকে স্বজন প্রীতি বলা হয়, সেই আচরণ অবলম্বন করতে পারে। আসলে তাঁর এই নীতি ও আচরণের ভিত্তি কি ছিলো সেটা তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। সেটা হচ্ছে, তিনি

এটাকে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার যে নির্দেশ ইসলামে রয়েছে, তারই দাবি বলে মনে করতেন।[৬] তাঁর ধারণা ছিলো যে, কুরআন ও সুন্নাহে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আপন জনদের সাথে সাধ্যমত ভালো আচরণ করা দ্বারাই তার দাবি পূরণ হওয়া সম্ভব। এটা অসৎ উদ্দেশ্যে প্রসুত ছিলনা বরং ভুল সিদ্ধান্ত বা অন্য কথায় ইজতিহাদী ভুল অর্থাৎ চিন্তা ও বিচার বিবেচনার ক্রটি ছিলো। একে অসদুদ্দেশ্য প্রসূত বলা যেতো কেবল তখনই, যদি তিনি এ কাজকে অবৈধ জেনেও নিছক নিজ স্বার্থে অথবা আপন জনদের স্বার্থের খাতিরে করতেন। অবশ্য তাঁর এ সিদ্ধান্তকে ইজতিহাদ তথা বিচার বিবেচনার ভুল না বলেও উপায় নেই। কেননা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করাটা তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব ছিলো, খেলাফত তথা রাষ্ট্রনায়কের পদের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিলনা। তিনি সারা জীবন ব্যক্তিগত পর্যায়ে আত্মীয় স্বজনের সাথে যে মহানুভবতার আচরণ করেছেন, সেটা নিসন্দেহে আত্মীয়- স্বজনের সাথে সদাচরণের অনুপম আদর্শ ছিলো। তিনি নিজের সমগ্র সহায়- সম্পদ ও জমি-জমা আপন আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং আপন সন্তানদেরকেও তাদের সমান অংশ দান করেন। এ মহানুভবতার যতো প্রশংসাই করা হোক, তা যথেষ্ট নয়। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বদান্যতা প্রদর্শনের কোনো নির্দেশ খেলাফতের পদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলনা। তাই খলিফা হিসেবেও আপন আত্মীয় স্বজনের উপকার করে যেতে হবে, তা নাহলে এ নির্দেশ মান্য করা হবেনা, এরূপ মনে করা তাঁর ঠিক হয়নি।

صلة رحمى তথা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার ব্যাপারে শরিয়তের নির্দেশের তাৎপর্য নির্ণয় করতে গিয়ে ওসমান রা. খলিফা হিসেবে আপন আত্মীয়দের সাথে যে আচরণ করেছেন, তার কোনো অংশকে শরিয়তের বিধি অনুসারে নাজায়েজ বলা যায় না। এটা সকলেরই জানা যে, খলিফা তার কোনো আত্মীয়কে আদৌ কোনো সরকারি পদে নিয়োগ করতে পারবেন না, শরিয়তে এমন কোনো বিধি নেই। গনিমতের সম্পদ বন্টনে বা সরকারি কোষাগার থেকে সাহায্য দেয়ার ব্যাপারেও এমন কোনো বিধি শরিয়তে ছিলনা, যা তিনি লংঘন করেছেন। এ ব্যাপারে ওমর রা.-এর ইন্তিকালের প্রাক্কালে কৃত যে ওসিয়তের কথা আমি ইতিপুর্বে উল্লেখ করেছি, সেটাও শরিয়তের কোনো বিধান ছিলনা, যা মান্য করা তার জন্য বাধ্যতামূলক এবং লংঘন করা অবৈধ হতো। এ জন্য তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আরোপ করা যায় না যে, তিনি এ ব্যাপারে আইনগত বৈধতার সীমালংঘন করেছেন। কিন্তু তাই বলে আবু বকর রা. ও ওমর রা. আপন আত্মীয় স্বজনের ব্যাপারে যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন এবং যা মেনে চলার জন্য ওমর রা. তাঁর সম্ভাব্য উত্তরসুরীদেরকে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন, কৌশলগত দিক দিয়ে সেটাই যে সবচেয়ে নির্ভুল নীতি ছিলো, তাও কি অস্বীকার করা চলে? আর ওসমান রা. সেটা বাদ দিয়ে যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা যে কৌশলগতভাবেও বেমানান ও অনুচিত ছিলো এবং কার্যতও তা যে নিদারুণ ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে,

৬. দেখুন, কানযুল উম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদিস নং ২৩,২৪ এবং তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৪।

সে কথা মেনে নিতে কি দ্বিধা করার কোনো অবকাশ আছে? সন্দেহ নেই যে, মহান খলিফা এর ফলে এতো বড় ক্ষতি হবে তা ধারণা করতে পারেননি। বুঝেসুজেই এতো বড় ক্ষতির ঝুঁকি তিনি গ্রহণ করেছেন, চরম নির্বোধ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ এমন কথা ভাবতে পারে না। সে যাই হোক, কৌশলের ভুলকে ভুল না মেনে উপায় নেই। ইনিয়ে বিনিয়ে যতো ব্যাখ্যাই দেয়া হোক রাষ্ট্রপ্রধান নিজের গোত্রের একজনকে সরকারের মুখ্য সচিব পদে অধিষ্ঠিত করবেন এবং আরব উপদ্বীপের বাইরের সকল মুসলিম দখলকৃত এলাকার গভর্নরও নিজের বংশের একজনকেই নিয়োগ করবেন এটাকে কিছুতেই সঙ্গত বলে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। (এখানে উল্লেখ্য যে, তৎকালীন প্রশাসনিক কাঠামোতে আফ্রিকার সকল বিজিত এলাকা মিশরের গভর্নরের অধীন, আজরবাইজান, আর্মেনিয়া, খোরাসান ও পারস্যের সমগ্র এলাকা কুফা ও বসরার শাসকদ্বয়ের শাসনাধীন ছিলো। ওসমান রা.-এর আমলে এক সময়ে এই সকল প্রদেশের গভর্নররা তাঁরই আত্মীয় ছিলো। এটা এক আকাট্য ঐতিহাসিক সত্য। ঘটনা হিসেবে তাঁর সমর্থক ও বিরোধী সকলেই এর সত্যতা স্বীকার করেছে এবং বাস্তবিক পক্ষে এরূপ ঘটনা ঘটেনি এমন কথা কেউ বলেনি।)

এই কৌশলকে যথার্থ ও সঙ্গত প্রমাণ করার জন্য অনেকে এই বলে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, ওসমান রা. যাদেরকে নিয়োগ করেছিলেন, এদের অধিকাংশ ওমর রা.-এর আমলেও নিয়োগ পেয়েছিলেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত খোড়া যুক্তি। প্রথমত ওমর রা. নিজের আত্মীয় স্বজনকে চাকুরী দেননি। দিয়েছিলেন অন্যদেরকে, যাদের মধ্যে ওসমান রা.-এর আত্মীয়স্বজনও ছিলো। এতে কারোর মনে ক্ষোভের সঞ্চার হতে পারতো না। মানুষ ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তখনই, যখন রাষ্ট্রপ্রধান স্বয়ং আপন আত্মীয়স্বজনকে বড় বড় চাকুরীতে নিয়োগ করতে থাকেন। দ্বিতীয়ত ওমর রা.-এর আমলে ঐ সব লোককে কখনো অত বড় বড় পদে চাকুরী দেয়া হয়নি, যা পরবর্তীকালে তাদেরকে দেয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ তাঁর আমলে মিশরের কেবল একজন সাধারণ সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। মোয়াবিয়া রা. শুধু দামেস্ক এলাকার গভর্নর ছিলেন। ওলীদ বিন উকবা শুধু আলজাজিরার আরব অধ্যুষিত অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সাঈদ ইবনুল আস এবং আব্দুল্লাহ বিন আমেরও ছোট ছোট পদে চাকুরী করতেন। একই গোত্রের গভর্নরদের অধীনে আরব উপদ্বীপের বাইরের সকল অঞ্চল শাসিত হবে আর সে গোত্রও হবে খোদ ক্ষমতাসীন খলিফারই গোত্র, এমনাবস্থা ওমর রা.-এর আমলে কখনো হয়নি।

আরো একটা ব্যাপার অস্বীকার করা যাবে না। তা হলো: যাদেরকে ওসমান রা.-এর শেষ ভাগে এতো বড় বড় পদ দেয়া হয়েছিল তারা সকলেই মক্কা বিজয়ের সময় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আওতায় ক্ষমাপ্রাপ্ত লোক। রসূল সা.-এর শিক্ষা ও সাহচর্য দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ তারা খুব কমই পেয়েছিলো। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, এসব লোককে বয়কট করা কিংবা ইসলামি রাষ্ট্রের সকল কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা খোদ রসূল সা.-এরও নীতি ছিলনা এবং তারপর আবু বকর রা. ও ওমর রা. এটা অনুসরণ করেননি। স্বয়ং রসূল সা. এবং তার পরবর্তী

সময়ে প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা তাদের মন জয় করে এবং তাদেরকে যথাযোগ্যভাবে ইসলামি শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে মুসলিম সমাজে একাকার ও একাত্ম করে নেয়ার চেষ্টা করতেন এবং তাদেরকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে কাজেও লাগাতেন। কিন্তু যারা মক্কা বিজয়ের বহু পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের পরিবর্তে এখন এসব লোককে সামনে এগিয়ে দিতে হবে এবং মুসলিম সমাজের ও ইসলামি রাষ্ট্রের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে তাদেরকেই অধিষ্ঠিত করতে হবে, এটা রসূল সা.-এর ও নীতি ছিলনা, প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফারও না। পরবর্তীকালে যখন বনু উমাইয়া কার্যত নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হলো, তখন বাস্তব ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, বিজয়োত্তর যুগের এই সকল নব্য মুসলমান অনৈসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এবং প্রশাসনিক ও সামরিক দিক দিয়ে যতো সুযোগ ও সুদক্ষই হোক না কেন, মুসলিম জাতির নৈতিক ও আদর্শিক নেতৃত্ব দানের জন্য তারা মোটেই উপযোগী ও মানানসই ছিলনা। এ বাস্তব সত্য ইতিহাসে এতো স্পষ্ট লক্ষণীয় যে, শত সাফাই দিয়েও এটাকে ধামাচাপা দেয়ার সাধ্য কারোর নেই।

মোয়াবিয়া রা. কে একটানা ১৬-১৭ বছর একই প্রদেশের গভর্নর পদে বহাল রাখা শরিয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ ছিলনা। কিন্তু কৌশলগতভাবে অনুচিত অবশ্যই ছিলো। কেবল কয়েক বছর অন্তর অন্তর তাকে এক প্রদেশ থেকে আর এক প্রদেশে বদলি করলেই চলতো। এতে তিনি কোনো এক প্রদেশে এতোটা শক্তিশালী হতে পারতেন না যে, কখনো কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে বসা তার পক্ষে সম্ভব হয়।

বাইতুল মাল থেকে আত্মীয়দেরকে সাহায্য দানের প্রশ্ন: বাইতুলমাল থেকে আপন আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য দানের ক্ষেত্রে ওসমান রা. যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, তার ব্যাপারেও শরিয়তের বিধানের আলোকে কোনো আপত্তি তোলার অবকাশ নেই। নাউজুবিল্লাহ, তিনি আল্লাহর ও মুসলমানদের অর্থ সম্পদে কোনো খেয়ানত করেননি। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তার কর্মপন্থা। কৌশলগত দিক দিয়ে অন্যদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার না করে ছাড়েনি। মুহাম্মদ বিন সাদ স্বীয় গ্রন্থ তাবাকাতে ইমাম জুহরীর নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: 'ওসমান রা. স্বীয় শাসনামলের শেষ ৬ বছরে নিজের আত্মীয় ও স্বগোত্রীয়দেরকে সরকারি পদে নিযুক্ত করেন। মারওয়ানের জন্য মিশরের রাজস্বের এক পঞ্চমাংশ (অর্থাৎ আফ্রিকার গনিমতের অর্থের এক পঞ্চমাংশ, যা মিশরের পক্ষ থেকে কেন্দ্রে প্রেরিত হয়েছিল) বরাদ্দ করেন, নিজের আত্মীয়দেরকে আর্থিক উপঢৌকন দেন এবং এ ব্যাপারে এরূপ ব্যাখ্যা দেন যে, এটা আল্লাহর নির্দেশিত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষণের কাজ। তিনি সরকারি কোষাগার থেকে নিজের প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করেন এবং ঋণও গ্রহণ করেন। আর বলেন যে, আবু বকর রা. ও ওমর রা. তাদের প্রাপ্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি সেটা নিয়ে আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করেছি। এ জিনিসটাকেই জনগণ অপছন্দ করেছিলো।' (তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬৪)

এটা ইমাম জুহরির বক্তব্য, যিনি ওসমান রা.-এর নিকটতম উত্তরসূরী এবং ইবনে সাদও জুহরীর নিকটতম উত্তরসূরী। ইবনে সাদ মাত্র দুজন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে তার এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। কথাটা যদি ইবনে সাদ জুহরীর কথিত বলে অথবা ইমাম জুহরি ওসমান রা.-এর কথিত বলে ভুল উদ্ধৃত করতেন, তাহলে হাদিসবেত্তাগণ এতে আপত্তি না তুলে ছাড়তেন না। তাই এ বর্ণনাকে সঠিকই ধরে নিতে হবে।

ইবনে জারীর তাবারীর এ উক্তি থেকেও উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় যে, আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ সেখানকার বাতরিকের (রোমান সেনাপতির) সাথে তিনশো কিনতার স্বর্ণের বিনিময়ে সন্ধি করেন এবং সেই স্বর্ণ ওসমান রা. হাকামের পরিবারের মধ্যে বন্টন করার নির্দেশ দেন। (অর্থাৎ মারওয়ানের পিতার পরিবারকে দেয়ার নির্দেশ দেন।[৭] একবার ওসমান রা.-এর সাথে আলী রা., সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা., যোবায়ের রা., তালহা রা. ও মোয়াবিয়া রা.-দের বৈঠক চলছিলো। সেখানে তার আর্থিক সাহায্য বিতরণের উপর আপত্তি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। ওসমান রা. সেই বৈঠকে উক্ত সাহায্যের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দেন।

আমার পূর্ববর্তী দুই খলিফা নিজের ব্যাপারে এবং নিজের আত্মীয় স্বজনের ব্যাপারে কঠোর নীতি চালিয়ে গেছেন। অথচ রসূল সা. স্বীয় আত্মীয়দেরকে অর্থসম্পদ দিতেন। আমি একটা স্বল্প আয়ের পরিবারের লোক। এ জন্য আমি এই সরকারের যেটুকু সেবা করছি, তার বদলায় সরকারি কোষাগার থেকে টাকাকড়ি নিয়েছি এবং এটা করার অধিকার আমার আছে বলে মনে করি। আপনারা যদি এটাকে ভুল মনে করেন, তাহলে এ টাকা ফেরত দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, আমি আপনাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেবো। সকলে বললো, আপনি এ কথাটা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত বলেছেন। অতঃপর উপস্থিত ব্যক্তিগণ বললেন, আপনি আব্দুল্লাহ বিন খালেদ বিন উসাইদ এবং মারওয়ানকে টাকা দিয়েছেন। তারা আরো বলেন যে, মারওয়ানকে ১৫ হাজার এবং ইবনে উসাইদকে ৫০ হাজার মুদ্রার পরিমাণে দেয়া হয়েছে। এ টাকা তাদের উভয়ের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে বাইতুল মালে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং লোকেরা সন্তুষ্ট হয়ে চলে যান।[৮]

এ সকল বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ওসমান রা.আত্মীয় স্বজনকে অর্থ সাহায্য দান করার যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা কোনো ক্রমেই শরিয়তের বৈধতার সীমার বাইরে ছিলনা। তিনি যা কিছু নিয়েছিলেন, তা হয় রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নিজের পারিশ্রমিক হিসেবে নিয়ে নিজে ভোগ করার পরিবর্তে আত্মীয়স্বজনকে দিয়েছিলেন। অথবা বাইতুল মাল থেকে ঋণ নিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন। অথবা নিজের বিবেচনা অনুসারে গণিমতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশ বন্টন করেছিলেন যার ব্যাপারে শরিয়তের কোনো বিস্তারিত বিধান বিদ্যমান ছিলনা। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, তিনি যদি নিজের আত্মীয়স্বজন

---

৭. তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১৩।

৮. তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১৪, ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৯।

ছাড়া অন্যান্যদের বেলায়ও এ ধরনের বদান্যতা ও মহানুভবতার নীতি অবলম্বন করতেন, তাহলে কারোর এতে আপত্তি থাকতোনা। কিন্তু তা না করে স্বয়ং খলিফা কর্তৃক নিজের আত্মীয় স্বজনের প্রতি এরূপ দেদার হস্তে দান করাতে অপবাদ রটনার দুয়ার খুলে গেলো। আবু বকর রা. ও ওমর রা. এ কারণেই নিজেকে সর্বপ্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে রাখার জন্য ব্যক্তিগতভাবে নিজের উপর কঠোরতা আরোপ করতেন এবং সর্বসাধারণের প্রতি যে বদান্যতা প্রদর্শন করতেন, তা থেকে নিজেদের প্রিয়জনদেরকেও বঞ্চিত রাখতেন। ওসমান রা. এই সাবধানতা অবলম্বন না করায় অসন্তোষের শিকার হন।

গণবিক্ষোভের কারণ: ওসমান রা.-এর বিরুদ্ধে যে গণবিক্ষোভ সংঘটিত হয়, সে সম্পর্কে এ কথা বলা ইতিহাসসিদ্ধ নয় যে, তার পেছনে কোনো যথার্থ কারণ ছিলনা, বরং নিছক কুখ্যাত ইহুদি আব্দুল্লাহ বিন সাবার ষড়যন্ত্রের ফলে তা সংঘটিত হয়েছিল। অথবা তা শুধু ইরাকবাসীর উশৃংখলতার ফল ছিলো। জনগণের মনে অসন্তোষ সৃষ্টির সত্যিকার কোনো কারণ যদি না থাকতো এবং অসন্তোষ যদি বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যমান না থাকতো, তাহলে কোনো কুচক্রী গোষ্ঠী এতো বড় বিদ্রোহ ঘটাতে পারতোনা এবং সাহাবিগণকে ও সাহাবিদের পুত্রগণকে পর্যন্ত তাদের দলে ভেড়াতে পারতোনা। এই লোকেরা তাদের দুরভিসন্ধিপূর্ণ আন্দোলনে কেবল এজন্য সফলতা লাভ করে যে, ওসমান রা. আপন আত্মীয়দের ব্যাপারে যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেন তার ফলে শুধু জনসাধারণের মধ্যে নয়, শীর্ষস্থানীয় সাহাবিদের মধ্যে পর্যন্ত অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিলো। এই ধুমায়িত অসন্তোষকেই তারা কাজে লাগিয়েছিলো এবং দুর্বল চিত্তের লোকদেরকে তারা আপন চক্রান্তের শিকার বানিয়েছিলো। ইতিহাস থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, নৈরাজ্যবাদীরা এই ফাঁকফোকর দিয়েই আপন দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার পথ খুঁজে পায়। ইবনে সাদ বলেন: 'ওসমান রা.-এর বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষের কারণ ছিলো এই যে, তিনি মারওয়ানকে শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত করে রেখেছিলেন এবং তার কথা মতো চলতেন। লোকেরা মনে করতো যে, ওসমান রা.-এর নির্দেশে সম্পাদিত বলে কথিত অনেক কাজ এমন ছিলো, যা প্রকৃতপক্ষে ওসমান রা. কখনো নির্দেশ দেননি বরং মারওয়ান তার মতামত না নিয়েই নিজ উদ্যোগে তা করে ফেলতো। এজন্যে মারওয়ানকে ঘনিষ্ট হওয়ার সুযোগ দেয়ায় ও তাকে এমন শীর্ষ পদে আসীন করায় তারা বিক্ষুব্ধ ছিলো। (তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬)

ইবনে কাসীর বলেন, কুফা থেকে যে প্রতিনিধিদলটি ওসমান রা.-এর কাছে অভিযোগ জানাতে এসেছিলো, সে দলটি সবচেয়ে কঠোরভাবে যে বিষয়ে আপত্তি তুলেছিলো তা ছিলো এই যে: 'কুফাবাসী কিছু লোককে ওসমান রা.-এর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য পাঠালো যে, তিনি বহু সংখ্যক সাহাবিকে পদচ্যুত করে তাদের স্থলে বনু উমাইয়া বংশের আপন আত্মীয় স্বজনকে নিযুক্ত করেন। তারা এ ব্যাপারে ওসমান রা.-এর সাথে অত্যন্ত কড়া ভাষায় কথা বলেন এবং ঐ সব লোককে পদচ্যুত করে অন্যদেরকে নিয়োগ করার দাবি জানান।' (আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৭)

আরো কিছু দূর গিয়ে হাফেজ ইবনে কাসীর লিখেছেন, ওসমান রা.-এর বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উস্কে দেয়ার ব্যাপারে তার শত্রুদের হাতে সবচেয়ে মারাত্মক যে অস্ত্রটি ছিলো তা হলো: 'ওসমান রা. শীর্ষস্থানীয় সাহাবিগণকে পদচ্যুত করে আপন আত্মীয় স্বজনকে যে শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে লোকেরা ক্ষোভ প্রকাশ করতো এবং এ ব্যাপারটা অনেকের মনে গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে যেত।" (ঐ পৃষ্ঠা ১৬৮)

তাবারী, ইবনে আসীর ও ইবনে কাসীর এই অরাজকতার সময়ে আলী রা. ও ওসমান রা.-এর মধ্যে যে আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, তা সবিস্তারে উদ্ধৃত করেছেন। তারা বলেন, মদিনায় যখন সর্বত্র ওসমান রা.-এর বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা হতে লাগলো এবং পরিস্থিতি এতোদূর পর্যন্ত গড়ালো যে, কতিপয় সাহাবি (যায়েদ বিন সাবেত, আবু উসায়েদ সায়েদী, কা'ব বিন মালেক ও হাসসান বিন সাবেত রাজিয়াল্লাহু আনহুম) ছাড়া খলিফার পক্ষে কথা বলার মতো একজন সাহাবিও রইলো না, তখন লোকেরা আলী রা.-কে বললো, আপনি ওসমান রা-এর সাথে এ সব ব্যাপারে আলোচনা করুন। তিনি গেলেন এবং ওসমান রা.-কে তার আপত্তিজনক নীতি পাল্টানোর পরামর্শ দিলেন। ওসমান রা. বললেন: যেসব লোককে আমি নিয়োগ করেছি, ওমর রা. ওতো তাদেরকে নিয়োগ করেছিলেন। লোকেরা এজন্যে আমার উপর আপত্তি তুলছে কেন? আলি রা. জবাব দিলেন, ওমর রা. যাকে কোথাও প্রশাসক নিয়োগ করতেন, তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বা আপত্তি এলে তিনি কঠোরভাবে তার প্রতিকার করে ছাড়তেন। কিন্তু আপনি তা করেন না। আপনি আপনার আপনজনদের সাথে নম্র আচরণ করেন। ওসমান রা. বললেন, তারাতো আপনারও আত্মীয়। আলী রা. বললেন: ان رحمهم منى لقريبه ولكن الفضيل فى غيرهم 'নিঃসন্দেহে তারা আমারও ঘনিষ্ট আত্মীয়। কিন্তু অন্যরা তাদের চাইতে ভালো লোক। ওমর রা.-এর গৃহভৃত্য ইয়ারকাও তাকে এতো ভয় করতোনা, যতোটা মোয়াবিয়া তাকে ভয় করতো। আর এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, মোয়াবিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা না করেই যা ইচ্ছে তাই করে বসে এবং সেটা আপনার নির্দেশ বলে প্রচার করে। অথচ আপনি তাকে কিছুই বলেননা।[৯]

আর এক সময় ওসমান রা. আলী রা.-এর গৃহে উপস্থিত হলেন এবং স্বীয় আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তাকে অনুরোধ করলেন যে, আপনি এই অরাজকতা দমনে আমাকে সাহায্য করুন। তিনি জবাব দিলেন, এসব কিছু হচ্ছে মারওয়ান বিন হাকাম, সাঈদ বিন আস, আবদুল্লাহ বিন আমের, ও মোয়াবিয়া রা.-দের কারণে। আপনি এদের কথা মতো চলেন, আমার কথায় কর্ণপাত করেননা। ওসমান রা. বললেন ঠিক আছে, এখন তোমার কথা শুনবো। অতঃপর আলী রা. আনসার ও মোহাজেরিনদের একটি দলকে সাথে নিয়ে মিশর থেকে আগত গোলযোগকারীদের

---

৯. তাবারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৭৭, ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃ. ৭৬, আল বিদায়া ৭ম খন্ড, পৃ. ১৬৮-১৬৯।

কাছে যান এবং তাদেরকে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন।[১০] একই গোলযোগের সময় আরেকবার আলী রা. অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ অভিযোগ করেন। আমি অসন্তোষ প্রশমনের চেষ্টা করি, আর মারওয়ান পুনরায় তা উস্কে দেয়। তিনি স্বয়ং মসজিদে নববীতে রসূল সা.-এর মেম্বারে দাঁড়িয়ে জনগণকে শান্ত করেন এবং পরক্ষণেই তিনি চলে যাওয়ার পর তারই দরজার উপর দাঁড়িয়ে মারওয়ান জনগণকে গালি দেয় এবং পুনরায় আগুন জ্বলে ওঠে।[১১]

ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, তালহা রা., যোবায়ের রা. এবং আয়েশা রা.ও এ পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট ছিলেন।[১২] কিন্তু তাদের কেউই এটা চাননি যে, কর্মরত খলিফার বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান ঘটুক অথবা পরিস্থিতি তার হত্যা পর্যন্ত গড়াক। তাবারী তালহা রা. ও যোবায়ের রা.-এর নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: 'আমরা শুধু এটাই চেয়েছিলাম যে, আমীরুল মুমিনীন ওসমান রা. কে তার ভ্রান্ত নীতি পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করি। আমরা আদৌ ও কথা ভাবিনি যে, তাকে হত্যা করে ফেলা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাওজ্ঞানহীন লোকেরা সহনশীলদের উপর বিজয়ী হয়ে গেলো এবং তারা তাকে হত্যা করলো।'

আলী রা.-এর খেলাফত: ওসমান রা.-এর শাহাদাতের পর যে পরিস্থিতিতে আলী রা. কে খলিফা নির্বাচিত করা হয়, তা সবার জানা। দুহাজার বহিরাগত গোলযোগকারী ক্ষমতাসীন খলিফাকে হত্যা করার পর তখনো রাজধানীতে চাড়াও হয়ে আছে। স্বয়ং রাজধানীর অধিবাসীদের মধ্যেও তাদের সমমনা একটি গোষ্ঠী বিদ্যমান। নতুন খলিফা নির্বাচনে তারা অবশ্যই যোগ দান করেছিলো এবং নিসন্দেহে এই মর্মেও বর্ণনা রয়েছে যে, আলি রা.-কে খলিফা নির্বাচন করার পর এসব লোক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে বায়য়াত (নির্বাচিত খলিফাকে মেনে নেয়া) করতে বাধ্য করেছিলো। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ নির্বাচন কি ভুল ছিলো? সে সময়ে আলি রা.-এর চাইতে উত্তম কোনো ব্যক্তি কি মদিনায় তো দুরের কথা, সমগ্র মুসলিম জগতেও খলিফা হওয়ার উপযুক্ত বিদ্যমান ছিলো? তৎকালীন প্রচলিত ও স্বীকৃত ইসলামি সংবিধান অনুসারে আলী রা. কি বিধিসম্মত খলিফা নির্বাচিত হয়ে যাননি? ইসলামি সংবিধানে কি কোথাও এমন কোনো বিধি পাওয়া যায় যে, নতুন খলিফা নির্বাচনে যদি সাবেক খলিফার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান সংঘটনকারী গোষ্ঠী অংশগ্রহণ করে বসে, তাহলে তার নির্বাচন অবৈধ সাব্যস্ত হবে? এটা কি ঠিক হতো বা হওয়া উচিত ছিলো যে, এক খলিফা তো শহীদ হয়েছে এবং তার জায়গায় অন্য খলিফা দ্রুত নির্বাচিত না হোক এবং মুসলিম জগত কিছুকাল বিনা খলিফাতেই পড়ে থাকুক? আর যদি ধরেও নেয়া যায় যে, আলী রা. ইচ্ছাকৃতভাবেই ওসমান রা.-এর খুনীদেরকে পাকড়াও করতে ও তাদের উপর মামলা চালাতে শৈথিল্য দেখাচ্ছিলেন অথবা তাদের হাতে অসহায় ছিলেন। তাহলেও

---

১০. তাবারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৯৪, ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃ. ৮১-৮২।
১১. তাবারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৯৮, ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃ. ৮৩-৮৪।
১২. তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃ. ৪৭৭-৪৮৬।

কি ইসলামি সংবিধানের দৃষ্টিতে কেবল এ কারণেই তার খেলাফত অবৈধ হয়ে যায় এবং তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করা জায়েয হয়ে যায়? পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে একটা সঠিক সিদ্ধান্ত আসার জন্য এই মৌলিক প্রশ্নগুলো চূড়ান্ত গুরুত্বের অধিকারী। কেউ যদি এ প্রশ্নগুলোর ইতিবাচক জবাব দিতে চায় তাহলে তার স্বপক্ষে তার উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করা উচিত।

কিন্তু হিজরি প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল সুন্নি মুসলমানগণ সর্বসম্মতভাবে আলী রা. কে চতুর্থ খলিফায়ে রাশেদা স্বীকার করে আসছে এবং সকল মুসলিম দেশে প্রত্যেক জুময়াতে অব্যাহতভাবে তাঁর খেলাফতের ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। খোদ আলী রা.-এর শাসনকালেও এরূপ অবস্থাই বিরাজ করছিল। একমাত্র সিরিয়া প্রদেশটি ছাড়া আরব উপদ্বীপে এবং তার বাইরে সকল মুসলিম শাসনাধীন অঞ্চলের মানুষ তার খেলাফত মেনে চলছিলো, সমগ্র মুসলিম সম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা কার্যত তারই খেলাফতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং মুসলিম উম্মাহর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল।

এতদসত্ত্বেও কেউ যদি দাবি করে যে, আলী রা.-এর খেলাফত সন্দেহজনক ছিলো এবং তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের শরিয়তে কিছু না কিছু অবকাশ ছিলো, তবে তাকে অত্যন্ত বড় রকমের গোঁয়ার্তুমী ও ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক না বলে পারা যায়না। বিশেষত আমি যখন দেখি যে, এক শ্রেণীর লোক এক দিকে এজিদের খেলাফতকে বৈধ এবং ইমাম হোসাইনকে ভ্রান্ত ঠাওরাতে খুবই গলদঘর্ম, কিন্তু অপরদিকে তারা মোয়াবিয়ার পক্ষে সাফাই গাইতে কোমড় বেঁধে লেগে যান, তখন আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। অথচ যেসব যুক্তি প্রমাণ দিয়ে এজিদের খেলাফতকে বিধিসম্মত প্রমাণের চেষ্টা করা হয়, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা আলী রা.-এর খেলাফত অকাট্য বিশুদ্ধতার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর যারা ওমসান রা. হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। তাদের এ কাজের স্বপক্ষে আদৌ কোনো শরিয়তসম্মত প্রমাণ পেশ করা যাবেনা। আল্লাহর শরিয়ত আপোষহীন বিধান। কারোর সম্মান ও মর্যাদার দিকে নজর দিয়ে আমরা ভুলকে সঠিক সাব্যস্ত করার চেষ্টা করবো, তার অবকাশ এতে নেই।

ওসমান হন্তাদের বিচারঃ আমি শরিয়তের বিধান সম্পর্কে যতোই চিন্তা গবেষণা চালিয়েছি, তাতে আমার মতে ওমসান রা. হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের শরিয়তসম্মত উপায় একটাই ছিলো। সেটি হলো, ক্ষমতাসীন খলিফার খেলাফত মেনে নিয়ে তাঁর কাছেই দাবি জানানো দরকার ছিলো যে, তিনি যেন ওসমান রা.-এর খুনীদের গ্রেফতার করে তাদের উপর মোকদ্দমা চালান এবং এই জঘন্য অপরাধ সংঘটনে যার যে ভূমিকা ছিলো, তা সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা চিহ্নিত করে আইন অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেন। অপরদিকে তৎকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতির ব্যাপারে আমি যতোটা অনুসন্ধান চালিয়েছি তার আলোকে আমি মনে করি যে, আলী রা. -এর সাথে সকলের সহযোগিতা করা এবং তাকে শান্ত পরিবেশে কাজ করার সুযোগ দেয়া ছাড়া

কার্যত এই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো উপায় ছিলনা। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকেই প্রমাণিত, যে উচ্ছৃংখল দলটি ষড়যন্ত্র করে মদিনায় আক্রমণ চালিয়েছিলো, তার সদস্য সংখ্যা ছিলো প্রায় দুহাজার। তাছাড়া খোদ মদিনার অধিবাসীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক তাদের সহযোগী ছিলো। মিসর, বসরা এবং কুফাতেও তাদের আস্কারা দানকারী এক একটা গোষ্ঠী সক্রিয় ছিলো এমতাবস্থায় নিরেট সত্যের অনুসারী সাহাবিগণ সকলে যদি আলী রা-এর পেছনে সমবেত হতেন এবং তার সহযোগিতা করতেন, তাহলে তিনি ঐ আস্কারাদাতা গোষ্ঠীগুলোকে বিচ্ছিন্ন করার পর খুনীদের বিরুদ্ধে সমুচিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু যখন একদিকে প্রভাবশালী সাহাবিগণ নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করলেন এবং অপরদিকে বসরা ও সিরিয়ায় শক্তিশালী বাহিনীগুলো আলী রা-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হয়ে গেলো, তখন তাঁর পক্ষে শুধু যে ঐ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়লো তা নয়, বরং এই শক্তিশালী যুদ্ধংদেহী বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে যাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া সম্ভব, তাদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে কার্যত বাধ্য হয়ে গেলেন এবং ওসমান রা. হন্তাদের বিরুদ্ধে পাশাপাশি আর একটা লড়াই করা থেকে নিবৃত্ত রইলেন। আমার এই অভিমতের সাথে যদি কারোর দ্বিমত থাকে, তাহলে তার কাছে আমি জানতে চাই যে, আলী রা.-এর পক্ষে ওসমান রা. হন্তাদের পাকড়াও করার উপযুক্ত সময় কখন ছিলো? খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই? অথবা উষ্ট্র যুদ্ধ চলার সময়? না সিফফীন যুদ্ধ চলার সময়? অথবা সিফফীন যুদ্ধের পরে, যখন একদিকে মোয়াবিয়া রা. ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলোকে একে একে বিচ্ছিন্ন করতে আরম্ভ করেছেন এবং অপরদিকে খারিজীরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত?

ইজতিহাদী ভুল কোন্‌টা এবং কোন্‌টা নয়?: এ পর্যন্ত আমি যে বিবরণ দিলাম তা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ওসমান রা. হন্তাদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যারা ক্ষমতাসীন খলিফার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছেন, তাদের এ কাজ শরিয়তের বিচারেও সঠিক ছিলনা, কৌশলগত দিক দিয়েও ভ্রান্ত ছিলো। আমি এ কথা স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র ও কুণ্ঠিত নই যে, তারা এই ভুলটা করেছিলেন সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এবং ন্যায়সঙ্গত মনে করে। তবে আমি এটাকে শুধু ভুল মনে করি। এটাকে ইজতিহাদী ভুল মেনে নিতে আমি সাংঘাতিকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত। যে সিদ্ধান্তের পক্ষে শরিয়তে কিছু না কিছু অবকাশ থাকে শুধুমাত্র তার ব্যাপারেই 'ইজতিহাদ' পরিভাষা প্রযোজ্য হতে পারে বলে আমি মনে করি। আর 'ইজতিহাদী ভুল' আমরা শুধু সেই সিদ্ধান্তকেই বলতে পারি, যার স্বপক্ষে একটি কিছু শরিয়তসম্মত যুক্তি আছে বটে, তবে তা সঠিক নয় অথবা অতিশয় দূর্বল। এখন কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে বলুক যে, আলী রা.-এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটানোর স্বপক্ষে কোনো দুর্বলতম যুক্তিও যদি শরিয়তে থেকে থাকে তাহলে সেটা কি? উষ্ট্র যুদ্ধের অজুহাত যদি দেয়া হয় তাহলে বলবো যে, নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে তালহা রা. ও যোবায়ের রা. যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে নিজেদের ভুল স্বীকার করে ময়দান থেকে সরে গিয়েছিলেন। আর

আয়েশা রা. পরে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছিলেন। মোয়াবিয়া রা.-এর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তিনি সব সময়ই নিজেকে পক্ষালম্বী মনে করতেন। কিন্তু তার অস্ত্র ধারণের পক্ষে বোধগম্য যুক্তি কোনটা হতে পারে ভেবে পাওয়া যায় না। সেটা কি এই যে, নতুন খলিফা একজন গভর্নরকে বরখাস্ত করেছেন অথবা তিনি সাবেক খলিফার হত্যাকারীদেরকে গ্রেফতার করে তাদের বিচার অনুষ্ঠিত করেননি। অথবা নতুন খলিফার খেলাফতই একটি প্রদেশের গভর্নরের বিবেচনায় আইন সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথবা তখন কেন্দ্রে এবং অন্য সকল প্রদেশে তার খেলাফত স্বীকৃত হয়ে গেছে এবং কার্যত তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কারণগুলোর কোনো একটিকেও ক্ষমতাসীন খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ন্যায়সঙ্গত কারণ বলার পক্ষে শরিয়তে যদি সামান্যতম কোনো অবকাশও থেকে থাকে তাহলে সেটা বর্ণনা করা হোক। এ ব্যাপারে কুরআনের وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا এ আয়াত দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন সম্পূর্ণ ভুল। কেননা এ আয়াত দ্বারা এ কথা বুঝা যায় না যে, ক্ষমতাসীন খলিফা খুনীদেরকে গ্রেফতার না করলে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের খলিফার বিরুদ্ধে লড়াই করা জায়েয হয়ে যায়।

একই সমস্যা দেখা দেয় আমর ইবনুল আস রা.-এর ব্যাপারেও। সিফফীন যুদ্ধে বর্শার ফলকের উপর কুরআন উঁচু করে ধরার প্রস্তাব এবং পরে দুমাতুল জানদালে সালিশীর কার্যক্রম সকল নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা দেখলে এ কথা না বলে উপায় থাকে না যে, এটা শুধু ভুল ছিলো। একে ইজতিহাদী ভুল বলার কোনো অবকাশ দেখা যায় না। ইবনে সাদ ইমাম জুহরীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, সিফফীন যুদ্ধে যখন সংঘর্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করতে লাগলো এবং যোদ্ধাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হলো, তখন আমর বিন আস রা. মোয়াবিয়া রা.-কে বললেন: 'আপনি যদি আমার কথা শোনেন, তাহলে সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিন তারা কুরআন খুলে দাঁড়িয়ে যাক এবং বলুক, ওহে ইরাকবাসী, আমরা তোমাদেরকে কুরআনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। এতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু নির্দেশ রয়েছে, সে অনুসারে নিষ্পত্তি হয়ে যাক। এ কাজটা যদি আপনি করেন তাহলে ইরাকবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে এবং সিরিয়াবাসীর ঐক্য বহাল থাকবে। মোয়াবিয়া রা. তার এ পরামর্শ মেনে নিলেন।

ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর এবং ইবনে আসীর এই ঘটনাটাই আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাদের সকলের সম্মিলিত বর্ণনা হলো, আমর ইবনুল আস রা. কুরআনকে সালিশ মানার প্রস্তাব দেয়ার সময় তার সার্থকতা দেখান এই যে, এতে আলী রা.-এর সৈন্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে অথবা তারা যদি মেনেও নেয়, তাহলে কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ থামিয়ে রাখার সুযোগ আমাদের হস্তগত হবে।[১৩] এছাড়া কুরআন তুলে ধরার তার কোনো উদ্দেশ্য আমার জানামতে কোনো

---

১৩. তাবারী, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৪, আল বিদায়া ৭ম খন্ড, পৃ. ২৭২, ইবনে আসীর, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৬০।

ঐতিহাসিক বর্ণনা করেননি। উক্ত সর্বসম্মত বর্ণনা থেকে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আসলে কুরআনের আলোকে নিস্পত্তি করানো ঐ প্রস্তাবের অভিপ্রায় ছিলনা। বরং ওটাকে শুধুমাত্র একটা সামরিক কৌশল হিসাবে পেশ করা হয়েছিল। এখন আমার জিজ্ঞাসা হলো, এটাকে কি যথার্থই 'ইজতিহাদ' নামে আখ্যায়িত করা চলে? আবার দুমাতুল জান্দালে সালিশীর সময়ে যে ঘটনা ঘটেছিল।

সে সম্পর্কে তাবাকাতে ইবনে সাদ, তারিখে তাবারী, আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া এবং ইবনুল আসীরের আল কামেলের সর্বসম্মত বর্ণনা হলো, আমর ইবনুল আস রা. এবং আবু মুসা আশয়ারী রা.-দের মধ্যে নিভৃতে যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, আবু মূসা রা. প্রকাশ্য জনসমাবেশে এসে সেটাই ঘোষণা করেছিলেন আর আমর রা. ঠিক তার বিপক্ষে নিজের সিদ্ধান্ত পেশ করেন।[১৪] এই বিবরণ পড়ার পর কোনো ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ কি বলতে পারে যে এটা 'ইজতিহাদ' ছিলো?

এজিদের মনোনয়নের ঘটনা: আমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর লাগে এজিদের মনোনয়নকে বৈধ প্রমাণের যুক্তি দেখে। এই যুক্তির উপস্থাপকরা ঐ মনোনয়নের যে খারাপ ফলাফল দেখা দিয়েছিল তা স্বীকার করেন বটে। তবে তারা বলেন, মোয়াবিয়া রা. যদি এজিদকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে নিজে বেঁচে থাকতেই তার পক্ষে বায়য়াত তথা আস্থা ভোট আদায় করে না নিতেন, তাহলে তার ইন্তেকালের পর মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে যেতো। সেই সুযোগে রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ চালাতো এবং ইসলামি রাষ্ট্রটাই খতম হয়ে যেতো। এজন্য এজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের যে কুফল দেখা দিয়েছিল, তা মনোনয়ন না করার শোচনীয়তম পরিণতি অপেক্ষা কমই মন্দ।

আমি জিজ্ঞাসা করি, সত্যিই যদি মোয়াবিয়া রা.-এর এ রকম ধারণা থেকে থাকে যে, তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী মনোনয়নকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে যেতে পারে আর এ জন্য তিনি বেঁচে থাকতেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বীয় উত্তরাধিকারীর পক্ষে বায়য়াত আদায় করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে থাকেন, তাহলে তিনি তাঁর এই মহৎ চিন্তাকে কার্যকরী করার জন্য তখনো জীবিত প্রবীণ সাহাবিগণকে এবং নামীদামী তাবেয়ীগণকে সমবেত করে তাদের সামনে এ কথা তুলে ধরতে পারতেন না? তাদেরকে কি তিনি নিজের জীবদ্দশায় একজন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করতে বলতে পারতেন না এবং যাকে তারা নির্বাচিত করতো তার পক্ষে সমগ্র জনতার বায়য়াত নিতে পারতেন না? এ পদ্ধতিটা অবলম্বন করতে তার অসুবিধা কি ছিলো? মোয়াবিয়া রা. যদি এ পথ অবলম্বন করতেন, আপনারা কি মনে করেন যে, তা হলেও গৃহযুদ্ধ না বেধে পারতো না এবং তখনও রোম সম্রাট আগ্রাসন চালিয়ে ইসলামি রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিয়েই ছাড়তো?

---

১৪. তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৫৬, ২৫৭। তাবারী, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৪৯-৫২। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খন্ড, পৃ. ২৮০-২৮৩। ইবনে আসীর, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

আলী রা.-এর প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্বের অপবাদঃ আপত্তিকারীরা আমার বিরুদ্ধে এই মর্মে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, আমি বুঝি আলী রা.-এর প্রতি অন্যায়ভাবে পক্ষপাতিত্ব করছি। অথচ আমি সাহাবায়ে কেরাম, বিশেষত খোলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত আগেই বর্ণনা করেছি যে, তাদের কোনো কাজ বা কথা যদি বাহ্যত ভুল বলে মনে হয়, তাহলে তাঁর নিজের অন্যান্য কথাবার্তায়, তৎকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এবং ঐ সাহাবি বা খলিফার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে তার ঐ কথা ও কাজের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে হবে, এবং তার স্বপক্ষে যে কোনো যুক্তিসঙ্গত সাফাই দিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, এই সাফাই যেন কোনোমতেই অন্যায় ও অশোভন ওকালতী না হয়। আলী রা.-এর ব্যাপারে রাসায়েল ও মাসায়েল প্রথম খণ্ডের নিবন্ধ 'আলী রা.-এর খেলাফতের উমেদারী' এবং আলোচ্য নিবন্ধে আমি যে দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেছি, তা মূলত এই অভিমতেরই অভিব্যক্তি। এটা কোনো অন্যায় পক্ষপাতিত্ব নয়, যার জন্য আমাকে দোষারোপ করা হচ্ছে। সকল নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফাদ্বয় এবং ওসমান রা.-এর গোটা খেলাফত আমলে তিনি যেরূপ আন্তরিকতা ও পরিপূর্ণ বন্ধু বাৎসল্যের সাথে তিনজন খলিফার সাথেই সহযোগিতা করেছেন। যে ধরনের সহৃদয়তা ও মমত্বের সম্পর্ক তাদের মধ্যে ছিলো এবং আবু বকর রা. ও ওমর রা.-এর ইন্তেকালের পর তিনি যেরূপ খোলামনে তাদের প্রশংসা করে গেছেন। তা যখন দেখি, তখন আমার কাছে সেই সব রেওয়ায়েত অত্যন্ত দুর্বল মনে হয়, যাতে বলা হয়েছে যে, তিনি তাদের প্রত্যেকের খলিফা নিযুক্তিতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। বরঞ্চ যেসব রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, তিনি প্রত্যেকের খেলাফতকে শুরুতেই মন দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলোই অধিকতর শক্তিশালী বলে মনে হয়। দুই ধরনের বর্ণনাই যখন রয়েছে এবং সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে, তখন যে বর্ণনাগুলো তাঁর জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল, সেগুলোকে অগ্রাধিকার না দেয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে আর যে বর্ণনাগুলো তার বিপরীত পরিদৃষ্ট হয়, অনর্থক সেগুলোকেই গ্রহণ করতে হবে কোন্ কারণে? অনুরূপভাবে ওসমান রা.-এর শাহাদাত থেকে শুরু করে আলী রা.-এর নিজের শাহাদাত পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে তার যে ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড ছিলো, তার প্রতিটি অংশের আমি একটা সুষ্ঠু সামঞ্জস্য খুঁজেছি এবং তার নিজের বক্তব্যে অথবা তৎকালীন পরিস্থিতি ও ঘটনা প্রবাহে আমি তা পেয়েছি। কেবল মালিক আল আশতার ও মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে গভর্নর নিয়োগের পদক্ষেপ এর ব্যতিক্রম। কোনো ব্যাখ্যা দ্বারাই এই দুটো পদক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত সাব্যস্ত করার অবকাশ আমি দেখতে পাইনি। এজন্য এক্ষেত্রে তার পক্ষ সমর্থনে আমি নিজের অক্ষমতা ব্যক্ত করেছি। (তরজমানুল কুরআন, অক্টোবরঃ ১৯৬৫)

০৪. খেলাফত ও রাজতন্ত্র।

প্রশ্নঃ আমি আপনার পুস্তক 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' এবং জনৈক আব্বাসী সাহেবের জবাবী পুস্তক 'তাবসেরায়ে মাহমুদী' প্রথম ও ২য় খন্ড নিরপেক্ষ মনে অধ্যয়ন করেছি

এবং আমি বুঝতে পেরেছি যে, আব্বাসী সাহেবের ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। ইসলামের যে রাজনৈতিক মতবাদ তিনি পেশ করেছেন, তাতে তার মানসিক বৈকল্যই ফুটে উঠেছে। তবে আমার মনে হয়, আপনি কয়েকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিলে আপনার বিরুদ্ধে পরিচালিত অপপ্রচার বিদগ্ধ সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। ব্যাখ্যার দাবিদার বিষয়গুলো হলো, আব্বাসী সাহেব বলেছেন যে, ইসলামে খলিফার জন্য কোনো নির্বাচন পদ্ধতি নির্দিষ্ট নেই। কেননা, সাকিফায়ে বনী সায়েদাতে যে আবু বকর রা.-এর খলিফা নিযুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল, সেখানে সর্বসাধারণের কোনো সমাবেশ ছিলনা, বরং এমন কতিপয় ব্যক্তি সমবেত হয়েছিলেন, যারা সর্বশ্রেণির জনগণের প্রতিনিধি স্থানীয়ও ছিলেন না। কাজেই এক্ষেত্রে জনমত বা জনসমর্থনের কোনো প্রশ্নই ছিলনা।

ওমর রা.-এর নিযুক্তি এভাবে সম্পন্ন হয়েছিল যে, আবু বকর রা. তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং সকলে সেই মনোনয়নে একমত হয়েছিল। এখানেও জনমত প্রকাশের কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। আব্বাসী সাহেব আরো বলেন যে, জনমতের নীতি যদি মেনেও নেয়া হয় তথাপি কথা থেকে যায় যে, বায়য়াত তথা আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশের অনুষ্ঠানতো কেবল মদিনাতেই হয়েছিল। সমগ্র দেশের জনমত তথা মুসলমানদের সার্বিক সম্মতির প্রশ্ন এখানেও অবান্তর।

আব্বাসী সাহেব এই মর্মেও প্রশ্ন তুলেছেন যে, মোয়াবিয়া রা.-এর শাসন যদি রাজতন্ত্র হয়ে থাকে, তাহলে সাহাবাদের সমাবেশে তার প্রতি সমর্থন ও আনুগত্য স্থাপন করা হলো কেন এবং সাহাবাগণ তার শাসনাধীন বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ গ্রহণ করলেন কেন?

আব্বাসী সাহেব আরো বলেন, হাদিস যেমন বর্ণনাকারীদের চরিত্রের চুলচেরা বিচারের মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করা হয়ে থাকে, ইতিহাসও সেভাবে গ্রহণ করা উচিত।

জবাব: আব্বাসী সাহেবের যে তিনটি উক্তি আপনি উদ্ধৃত করেছেন তার জবাব আমার পুস্তক 'খেলাফত ও মুলুকিয়াতে' রয়েছে।

১. নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬, ৭০-৭৫, ৮৩-৮৭, ১৫৭-১৬০, ২৪৯-২৫০ দেখুন।

২. মোয়াবিয়া রা.-এর শাসন রাজতন্ত্র হয়ে থাকলে সাহাবায়ে কেরাম তার বায়য়াত এবং তার সরকারে বিভিন্ন পদে নিয়োগ গ্রহণ করলেন কেন, এ প্রশ্নের জবাব ১৫৮, ২০১-২০২, ২৫১-২৫৪ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৩. শেষ প্রশ্নের একটা জবাব তো আমার পুস্তকের ৩১৬ থেকে ৩১৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। দ্বিতীয় জবাব হলো: আব্বাসী সাহেব স্বয়ং যেসব ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করেন, তাও তার বর্ণিত এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়। তৃতীয় জবাব হলো: এরূপ শর্তের অধীন যদি ইতিহাস লেখা

হয়, তাহলে পরবর্তী শতাব্দীগুলোরতো কথাই ওঠে না, প্রথম শতাব্দীর ইতিহাসের ৯/১০ অংশ উধাও হয়ে যেতে বাধ্য। আর এটাও ইসলামি ইতিহাসের বেলায় প্রযোজ্য। বাদবাকি দুনিয়ার সাধারণ ইতিহাসের গোটাটাই পানিতে ভাসিয়ে দিতে হবে। কেননা এতেতো সনদের শুদ্ধাশুদ্ধ যাচাই এবং বর্ণনাকারীদের চরিত্র বাছবিচারের প্রশ্নই ওঠে না। (তরজমানুল কুরআন, মার্চ: ১৯৬৭)

০৫. ইসরাইলী রাষ্ট্রের পক্ষে এক উদ্ভট যুক্তি।

প্রশ্ন: সূরা বনী ইসরাইলের ১০৪নং আয়াত সম্পর্কে লাক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত 'সিদকে জাদীদ' পত্রিকায় মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী 'সত্য ভাষণ' শিরোনামে এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এতে وَعْدَ الْآخِرَةِ (আখেরাতের প্রতিশ্রুতি) দ্বারা يَوْمَ الْآخِرَةِ (আখেরাতের দিন) বুঝানো হয়নি, বরং বুঝানো হয়েছে কেয়ামতের নিকটবর্তী একটা প্রতিশ্রুত সময়। আর جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (তোমাদের সকলকে একত্রিত করবো)। কথাটা দ্বারা বনী ইসরাইলের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে এক জায়গায় সমবেত করা বুঝানো হয়েছে। এরপর তিনি বলেন: 'এ আয়াতের মর্ম খুবই পরিষ্কার। অর্থাৎ ফেরাউনের নিমজ্জিত হয়ে মরার ঘটনার পরপরই ইসরাইলীদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, এখন তোমরা তো স্বাধীন। দুনিয়ার যেখানে খুশি থাকো ও বসবাস করো। তবে কেয়ামতের সময় যখন আসন্ন হবে, তখন আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন দেশ থেকে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, বিভিন্ন ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও এবং বিভিন্ন পোশাক পরিচ্ছদ ও বেশভূষা ধারণ করা সত্ত্বেও তোমাদের সকলকে এক জায়গায় সমবেত করবো। এই জায়গা আর কোন্‌টা হতে পারে? এটা তাদের আদিম জন্মভূমি ফিলিস্তিন ছাড়া আর কিছু নয়। আজ যে ফিলিস্তিন ভূখন্ডে সকল দেশ থেকে ইহুদিরা জড় হচ্ছে, এটা কি এই গায়েবী ভবিষ্যদ্বানীরই প্রতিফলন নয়।'

মাওলানা দরিয়াবাদী আলোচ্য আয়াত থেকে এই যে মর্ম উদ্ধার করেছেন, আমার আশংকা হয় যে, এটা ফিলিস্তিনের জন্য জেহাদের আবেগকে নিস্তেজ করে দেবে। কেননা এ ব্যাখ্যা মেনে নিলে তো ফিলিস্তিনে ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা স্বয়ং আল্লাহর অভিপ্রেত বলে প্রতীয়মান হবে।

জবাব: উল্লিখিত আয়াতের এ ব্যাখ্যা বিস্ময়কর। মূল আয়াতের ভাষাতো শুধু এই-

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا

'তারপর (অর্থাৎ ফেরাউনের ডুবে মরার পরে) আমি বনী ইসরাইলকে বললাম যে, পৃথিবীতে বসবাস করতে থাকো। অতঃপর যখন আখেরাতের প্রতিশ্রুতির সময় আসবে, তখন আমি তোমাদেরকে সমবেত করবো।'

এই বক্তব্যের ভেতরে 'কেয়ামতের নিকটবর্তী প্রতিশ্রুত সময়' এবং বনী ইসরাঈলের আদিম জন্মভূমিতে ইহুদিদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে দেশ দেশান্তর থেকে এনে সমবেত করার' মর্মটা কোথা থেকে বেরিয়ে এলো? وَعْدُ الْآخِرَةِ এর সোজা ও সরল অর্থ হচ্ছে

আখেরাতের প্রতিশ্রুতি, কেয়ামতের নিকটবর্তী কোনো প্রতিশ্রুত সময় নয়। আর সকলকে একত্রিত করার অর্থ কেয়ামতের দিন সমবেত করা। দুনিয়াতেই বনী ইসরাইলকে এক জায়গায় সমবেত করা হবে এমন কথা এখানে আভাস ইঙ্গিতেও বলা হয়নি। আরো বেদনাদায়ক ব্যাপার হলো 'এক জায়গায় একত্রিত' করার ধারণাকে আয়াতের বক্তব্যের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত থাকা হয়নি। অধিকন্তু এটাও স্থির করে দেয়া হয়েছে যে, সেই জায়গায় 'ইসরাইলীদের আদি বাসস্থান' ছাড়া আর কিছু নয়। এটাতো অবিকল ইহুদিদের দাবিরই সমর্থন। তারা দাবি জানিয়ে আসছে যে, দুহাজার বছরব্যাপী ফিলিস্তিন থেকে বেদখল থাকলেও তার উপর তাদের অধিকারই অগ্রগণ্য। কেননা ওটা তাদের প্রাচীনতম আবাসভূমি। আর এখন দুহাজার বছর ধরে এদেশ যাদের প্রকৃত আবাসভূমি, তাদের বদলে সেখানে ইহুদিদের বসবাসের অধিকারকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করে তাদেরকে সকল দেশ থেকে কুড়িয়ে এনে ওখানে বৃটেন, রাশিয়া ও আমেরিকা নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহই সমবেত করেছেন। এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা তো ইসরাইলী রাষ্ট্রের পত্তন আল্লাহর একটা প্রতিশ্রুতির ফল বলে সাব্যস্ত হয়। ওটা যে দুনিয়ার অত্যাচারী জাতিগুলোর একটা ষড়যন্ত্র, তা সাব্যস্ত হয়না। অথচ আয়াতের ভাষা যে রকম তাতে এ ধরনের মর্ম উদ্ধারের কোনো অবকাশ নেই। (তরজমানুল কুরআন, জুন: ১৯৬৭)

০৬. পাকিস্তান যে ইসলামি রাষ্ট্র হলো না সে জন্য কে দায়ি?

প্রশ্ন: সাপ্তাহিক 'তাহের' পত্রিকায় এবং তারপর 'নাওয়ায়ে ওয়াক্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার বক্তব্যে মুসলিম লীগ নেতৃত্বকে 'প্রতারক' আখ্যায়িত করা হয়েছে। আমি একজন মুসলিম লীগের লোক। আমি স্বীকার করি যে, কায়েদে আযম সম্পর্কে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনি আল্লাহর দেয়া এই দেশে ইসলামি শাসনতন্ত্র চালু করতে যথাসাধ্য চেষ্টা অবশ্যই করতেন। আমার ধারণা যে, বক্তৃতা করার সময় আপনি মুসলিম লীগের যে নেতৃত্বকে প্রতারক আখ্যায়িত করেছেন, সেটা কায়েদে আযমের মুসলিম লীগের সভাপতিত্ব থেকে পদত্যাগের পর চৌধুরী খালিকুজ্জামান ও লিয়াকত আলী খানের পরিচালনায় যে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে, সেই নেতৃত্বই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনি কায়েদে আযমের নন্দিত ব্যক্তিত্বকে লক্ষ্য করে একথা বলেননি।

নাওয়ায়ে ওয়াক্তে আজকাল এক দুঃখজনক বিতর্ক চলছে। আপনি নীরব থাকার কারণে সেটা আরো আস্কারা পাচ্ছে। বর্তমান নাজুক সময়ে আপনার ও নাওয়ায়ে ওয়াক্তের অগ্রণী ভূমিকার প্রয়োজন। এ সময়ে আপনি সামান্য একটু প্রতিবাদ করলেই সেটা একটা মুজাহিদসুলভ কাজ হবে।

জবাব: আইনজীবীদের সম্মেলনে আমি যে ভাষণ দিয়েছি সে সম্পর্কে একটা কথাতো জাজ্বল্যমান অসত্য বলা হয়েছে। সেটা হলো, আমার ভাষণ সম্মেলনের প্রথম দিনের শেষ ভাষণ ছিলো এবং মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ পরের দিন সম্মেলনের শুরুতেই ঐ ভাষণকে খণ্ডন করে বক্তৃতা করতে বাধ্য হন। অথচ আমার ভাষণ আসলে দ্বিতীয়

দিনের শেষ ভাষণ ছিলো। সে ভাষণের পরে আর কোনো বক্তৃতাই হয়নি। এজন্য আমার ভাষণ খণ্ডাতে মিয়া তোফায়েল সাহেবের কিছু বলার প্রশ্নই ওঠে না।

আরো একটা বাড়াবাড়ি আমার সাথে আগেও করা হয়েছে, এবারও করা হলো। সেটা হলো, যখনই আমি বিভাগোত্তর কালের পাকিস্তানের শাসকদের ইসলামি জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হওয়ার দায়ে অভিযুক্ত করি, অমনি মরহুম কায়েদে আযমকে সামনে টেনে আনা হয়। সেই সাথে অভিযোগ করা হয় যে, আমি নাকি আসলে কায়েদে আযমকেই দায়ি করেছি এবং তিনি ইসলামের বাস্তবায়ন চাইতেন না এ কথাই বলতে চেয়েছি। অথচ আমি এব্যাপারে কখনো মরহুম কায়েদে আযমের নামও উচ্চারণ করিনি। "তাহের" পত্রিকায় আমার বক্তৃতার যে সারাংশ ছাপা হয়েছে তা পড়ে দেখুন। সেখানে কোথাও কি একথা বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান হওয়ার পর ইসলামি ব্যবস্থা বাস্তবায়িত না হওয়ার জন্য কায়েদে আযম দায়ি ছিলেন কিংবা এ ব্যাপারে তিনি আন্তরিক ছিলেন না?

মরহুম কায়েদে আযম সম্পর্কে এ কথা বলাতো দূরের কথা, বরঞ্চ ১৯৫৩ সালে বিচারপতি মুনীরের তদন্ত কমিশনে আমি ঠিক এর বিপরীত কথাই বলেছিলাম। বিচারপতি মুনীর যখন বললেন যে, ১৯৪৭ সালের ১১ই আগষ্ট গণপরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতায় কায়েদে আযম চূড়ান্তভাবে রায় দিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষ ধাঁচের হবে, তখন আমি দেশবিভাগের পূর্বে ও পরে কায়েদে আযমের প্রদত্ত একাধিক ভাষণের উদ্ধৃতি দিয়ে বিচারপতি মুনীরের ঐ বক্তব্য খণ্ডন করি। আমার সেই লিখিত প্রতিবাদ সেই সময়েই পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়। এখনো তা আমার 'কাদিয়ানী সমস্যা এবং তার ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক' নামক পুস্তকের ১৮৮-১৯২ পৃষ্ঠায় পড়ে দেখা যেতে পারে। এখন জিজ্ঞাসা হলো, আমি নিজের এক ছাপানো বইতে যে কাল্পনিক অপবাদকে বিশদভাবে খণ্ডন করে এসেছি, সেই একই অপবাদ পুনরায় আমার উপর আরোপ করা কি কোনো ন্যায়সঙ্গত কাজ? বারংবার আমার উপর এ অপবাদ আরোপ করা হবে আর প্রত্যেকবার তা খণ্ডন করতে থাকবো এটা কি জরুরি?

কায়েদে আযম সম্পর্কে এটা সবার জানা যে, দেশের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব তার হাতে কার্যত কখনো আসেনি। ভারত বিভাগের পর তিনি মাত্র ১৩ মাস জীবিত ছিলেন, তারও একটা বিরাট অংশ তিনি রুগ্ন অবস্থায় কাটান। কিছুটা কর্মক্ষম থাকা অবস্থায় যে প্রাথমিক সময়টা তিনি পেয়েছিলেন, সে সময়েও পাকিস্তান হওয়ার প্রাথমিক সমস্যাবলীর সুরাহা করতেই তিনি ব্যস্ত থাকেন। এজন্য যখন আমি বলি, 'পাকিস্তানের শাসকরা ইসলামি ব্যবস্থা চালু করতে ইচ্ছুকই ছিলেন না, তখন আমি তা দ্বারা কায়েদে আযমের ব্যক্তিসত্তাকে বুঝাই না বরং যারা কার্যত কেন্দ্রে ও প্রদেশে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে গদিতে আসীন হয়েছেন তাদেরকেই বুঝাই। (তরজমানুল কুরআন, আগস্ট: ১৯৭৬)

০৭. একটা নির্জলা মিথ্যাচার।

প্রশ্নঃ করাচি থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'আফকার' এর ডিসেম্বর ১৯৭৬ সংখ্যায় জনাব রিয়াজ সিদ্দিকী সাহেবের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। এর শিরোনাম হচ্ছে 'কায়েদে আযমঃ এ যুগস্রষ্টা ব্যক্তিত্ব।' এই প্রবন্ধের শেষের দিকে 'জামায়াতে ইসলামি ও কায়েদে আযম' উপশিরোনামে তিনি লিখেছেন, '১৯৩৯ সালে কায়েদে আযম মাহমুদাবাদের রাজা সাহেব ও কামরুদ্দীন সাহেবের উপর মাওলানা মওদূদী ও আল্লামা এনায়েতুল্লাহ মাতরেকীকে মুসলিম লীগে যোগদানের দাওয়াত দেয়ার ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন। তখন মুসলিম লীগের অধিবেশনের সময় আসন্ন। কমরুদ্দীন সাহেব এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদীর সাথে যোগাযোগ করলেন। মাওলানা মওদূদী জানালেন, কায়েদে আযম নিজের দস্তখতসহ তার নামে দাওয়াতনামা পাঠালে তিনি মুসলিম লীগের অধিবেশনে যোগদান করবেন। তখন পর্যন্ত মুসলিম লীগে আনুষ্ঠানিক দাওয়াতনামা পাঠানোর রীতি চালু হয়নি। তবুও কমরুদ্দীন সাহেব কালবিলম্ব না করে দিল্লী চলে গেলেন এবং যেনতেন উপায়ে কাংখিত দাওয়াতনামা বের করতে সক্ষম হলেন। মাওলানা মওদূদী দাওয়াতনামা পেয়েও মুসলিম লীগের সভায় যোগদান করলেন না। কিছুটা তিক্ত সুরে অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন, আমি এমন কোনো তথাকথিত দলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা পছন্দ করিনা। যা ইসলামের প্রতিনিধিত্বশীল দল নয়। মুসলিম লীগে যোগদানকারীরা কেবল নামের মুসলমান। আমি এ ধরনের অর্থহীন রাজনৈতিক হৈ হল্লার সাথে যুক্ত হয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব খোয়াতে চাই না।' (আফকার করাচি, ডিসেম্বরঃ ১৯৭৬, পৃষ্ঠাঃ ২-২৩)

আমি আপনার ইসলামি চিন্তাধারা ও ইসলামি আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত এবং আপনার ব্যক্তিত্বের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখি। তাছাড়া আপনার চিন্তাধারা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে সাধ্যমত কিছুটা লেখার কাজেও নিয়োজিত আছি। এই সুবাদেই অনুরোধ জানাই যে, নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে উপকৃত করবেন।

১. সত্যই কি এ ধরনের দাওয়াতনামা আপনি রেখেছিলেন?

২. উল্লিখিত দাওয়াতনামা কি আপনার কাছে পৌঁছানো হয়েছিল?

৩. দাওয়াতনামা পাওয়ার পর সত্যই কি তিক্ত সুরে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন?

জবাবঃ আপনার বিস্তারিত প্রশ্নের অতি সংক্ষিপ্ত জবাব হলো, করাচির মাসিক আফকারের যে বক্তব্য আপনি উদ্ধৃত করেছেন, তার একটা বর্ণনাও সত্য নয়। ভাবতে অবাক লাগে যে, মানুষ কতো ঔদ্ধত্যের সাথে মিথ্যা লেখে, তা প্রচার করে এবং আখেরাত নামের একটা জায়গা যে রয়েছে, যেখানে গিয়ে তাদেরকে নিজেদের মিথ্যা রটনার জবাবদিহি করতে হবে, সে কথা ভুলে যায়। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারিঃ ১৯৭৭)

০৮. মুসলিম সরকারগুলো সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামির নীতি।

প্রশ্ন: ইংল্যান্ড থেকে এক ব্যক্তি আমাকে লিখেছেন, বিভিন্ন মুসলিম সরকার, বিশেষত সৌদি সরকারের সাথে ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের সহযোগিতার কারণে অনেক ক্ষতি হচ্ছে। ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপ এর উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, এই অপকৌশল দ্বারা মুসলিম সরকারসমূহের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে নানা ধরনের ভুল বুঝাবুঝিতে আচ্ছন্ন করে ফেলা হয়েছে। ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপ এই সম্মেলনে ইসলামের অনেক শিক্ষাকে বিকৃত করেছে। আপনার আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ব্যক্তিবর্গের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের দরুন অনেকে ভাবতে বাধ্য হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে সমর্থন করেন। আর এ কাজটা মুসলিম সরকারসমূহ, বিশেষত সৌদি সরকারের নীতিকে বৈধতার সনদ দেয়ার শামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে দাবি জানাচ্ছি যে, আপনি আপনার আন্দোলনের কর্মীদেরকে মুসলিম সরকারসমূহের সেবায় নিয়োজিত সকল জাতিয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান থেকে দূরে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রভাব খাটাবেন।

এই চিঠির সাথে বহু লোকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটা স্মারকলিপিও রয়েছে।

জবাব: বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির স্বাক্ষর দ্বারা সমর্থিত আপনার চিঠি পেলাম। মুসলিম সরকারসমূহ সম্পর্কে আমার ও জামায়াতে ইসলামির নীতি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১. ওগুলো মুসলিম সরকার, ইসলামি সরকার নয়। অর্থাৎ মুসলিম দেশসমূহের সরকার এবং সরকার প্রধানের মুসলমান হওয়ার সুবাদে আমরা ওগুলোকে মুসলিম সরকার বলি। কিন্তু যেহেতু তা ইসলামি নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত নয় এবং ইসলামি বিধানের আংশিক কিংবা মোটেই অনুগত ও অনুসারী নয়, তাই আমাদের মতে সেগুলো ইসলামি সরকার নয়। এ বক্তব্যটা আমরা আমাদের বইপুস্তকে এতো বেশি এবং এতো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি, যে এই বইপুস্তক পড়েছে এমন কোনো ব্যক্তি আমাদের নীতি সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত থাকতে পারে না।

২. আমরা আমাদের দেশ পাকিস্তানে প্রত্যক্ষভাবে সকল মুসলিম দেশে ইসলামি পুনরুজ্জীবনকামী আন্দোলনসমূহের সহযোগিতায় এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বে আমাদের সাহিত্য ও ইসলাম প্রচারক কর্মীদের মাধ্যমে ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ইসলামের সাথে অন্য কোনো আদর্শের সংমিশ্রণ ঘটানোকে কোনো মতেই আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত নই।

৩. কিন্তু আমরা ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকাকালে এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতে পারি না যে, আমরা নিজ দেশে, অন্য কোনো মুসলিম দেশে বা দুনিয়ার কোনো ভূখণ্ডেই শূন্যে কাজ করছি না। সর্বত্রই কোনো না কোনো সরকার ক্ষমতার মসনদে আসীন রয়েছে, কোনো না কোনো জীবনব্যবস্থা (চাই তা পুরোপুরি কুফরীভিত্তিক হোক অথবা ইসলাম ও অনৈসলামি আদর্শের জগাখিচুড়ি

হোক) চালু রয়েছে এবং মুসলিম দেশসমূহের মুসলিম জনসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইসলামের জ্ঞান এবং ইসলামি চরিত্র ও কর্ম থেকে অনেকাংশে মুক্ত।

৪. উক্ত বাস্তবতাকে একটা নিরেট ও যথার্থ বাস্তব ব্যাপার বলে অনুধাবন করার পর প্রশ্ন জাগে যে, ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ কার্যত কি উপায়ে করা যেতে পারে? এইসব রকমারি সরকার এবং ইসলাম সম্পর্কে এতো কোটি কোটি মুসলিম জনতার অস্তিত্বকে কি অস্বীকার করবো? অথবা এদের সকলের বিরুদ্ধে কি যুদ্ধ করবো? অথবা তাদের সাথে একেবারেই সম্পর্ক ছিন্ন করে এই সকল মুসলিম সরকার ও মুসলিম জনগণকে যেমন আছে তেমনই থাকতে দেবো এবং তাদের উপর প্রভাব বিস্তারের সকল সুযোগ থেকে হাত গুটিয়ে নেবো?

৫. আমি জানি না আপনি এবং আপনার সমমনা লোকেরা এসব উপায়ের মধ্যে কোনটা পছন্দ করেন। তবে নিজের সম্পর্কে ও জামায়াত সম্পর্কে আমি আপনাকে জানাতে চাই যে, আমরা প্রত্যেক দেশে বিরাজমান পরিস্থিতি দেখে এবং ভালোভাবে বুঝেসুজে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার আলোকেই ইসলামি দাওয়াত ও আন্দোলনের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকি। কিন্তু এই শিক্ষাকে প্রত্যেক দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী বাস্তবায়িত করা হয়। একদিকে আমরা আমাদের দেশে সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলামের জ্ঞান বিস্তার করেছি। অপরদিকে দেশের জনগণের মধ্য থেকে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করার জন্য আমাদের সহযোগী হতে প্রস্তুত হয়েছে, তাদেরকে আমরা সংগঠিত করেছি। এর পাশাপাশি আমরা দেশের শাসনব্যবস্থাকে ইসলামি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা চালাচ্ছি। অন্যান্য মুসলিম দেশে সরাসরি এ ধরনের কোনো চেষ্টা চালানো আমাদের সাধ্য ছিলনা। তাই আমরা সেখানে আমাদের বইপুস্তক প্রচার করেছি। তাদের মধ্যে যারা ইসলামি আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত হয়েছে কিংবা আগে থেকে করে আসছিল, তাদের সাথে সাধ্যমত সহযোগিতা করেছি। সেসব দেশের সরকারের সাথে আমরা যতোটা সম্ভব বিরোধীসুলভ আচরণ এড়িয়ে চলেছি, যাতে সেখানে আমাদের চিন্তাধারা প্রচারে অসুবিধা না ঘটে।

৬. আপনি বিশেষভাবে সৌদি সরকারের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ এ দেশের সরকারের সাথে আমাদের আচরণ অন্যান্য সরকার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কেন আলাদা, তা আমি আপনাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, চাই আপনি এবং আপনার সমমনা লোকেরা এ ব্যাপারে আমাদের সাথে একমত হোন বা দ্বিমত পোষণ করুন। আমাদের মতে সৌদি আরবের অবস্থা সারা দুনিয়া থেকে ভিন্ন এবং দুনিয়ার যে কোনো ভূ-খন্ডের চেয়ে তার গুরুত্ব বেশি। কেননা ওখানে প্রধান দুটো পবিত্র স্থান হারামাইন অবস্থিত। সারা পৃথিবী পাপে ডুবে থাক তা আমরা বরদাশত করতে পারি। কিন্তু মক্কা ও মদিনায় অনাচারের প্রসার ঘটুক এটা সহ্য করা যায় না। প্রধানত এই মনোভাব থেকেই আমরা এরূপ নীতি অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ হয়েছি যে, সৌদি আরবে যে ইসলামপন্থী লোকজন রয়েছে তাদেরকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে

সাহায্য করতে হবে। আর যারা সেখানে অনাচার আমদানী করছে, তাদের খপ্পর থেকে ঐ দেশকে ও তার সকল শ্রেণীর মানুষকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। এজন্যই সৌদি সরকার ও শাসকদের বেলায় আমাদের নীতি এই যে, তাদের প্রত্যেক ভালো কাজে সহযোগিতা করবো, অন্যান্য ভালো কাজেও উদ্বুদ্ধ করবো এবং তাদের ধনসম্পদ পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের খিদমত ও মুসলমানদের কল্যাণার্থে ব্যয় করতে অনুপ্রাণিত করবো। আমরা তাদের কোনো ভুল কাজে সমর্থন দিয়েছি, অকারণে তাদের প্রশংসা করেছি অথবা তাদেরকে খুশি করার জন্য রাজতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিন্দুমাত্রও কোনো রদবদল ঘটিয়েছি এমন কোনো দৃষ্টান্ত আপনি পাবেন না।

৭. আপনি বিশেষভাবে ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপ আয়োজিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, ঐ সম্মেলনে অনেকগুলো মৌলিক ইসলামি নীতিমালা লংঘন করা হয়েছে বা বিকৃত করা হয়েছে। কিন্তু কোন্ নীতিমালাকে লংঘন বা বিকৃত করা হয়েছে তা আমি আদৌ জানি না। আপনি এব্যাপারে আমাকে কিছু তথ্য সরবরাহ করলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

৮. ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের সামনে তুলে ধরা এবং কোনো ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলে তার সংশোধন করার উদ্দেশ্যেই জামায়াতে ইসলামির লোকেরা এ ধরনের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে থাকে। এধরণের কোনো সম্মেলনে আমাদের কোনো লোকের অংশগ্রহণ কোনো সরকারের অনুসৃত নীতিকে বৈধতার সনদ সরবরাহ করার সমার্থক হয়, এমন কথা আমি এই প্রথম জানতে পারলাম। (তরজমানুল কুরআন, আগস্ট: ১৯৭৭)

০৯. ইহুদিদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও আমেরিকা।

প্রশ্ন: ১. ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী বেগিন সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের অব্যবহিত পর জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে তিনটে বেআইনী ইহুদি বসতিকে আইনসঙ্গত করেছে। বেগিন সরকার এছাড়া আরো তিনটে নতুন বসতি পশ্চিম তীরে স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

২. মসজিদে আকসার প্রাচীরের নীচে ইসরাঈল এখনো খনন কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। এতে মসজিদের অস্তিত্ব মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। এ ব্যাপারে রাবেতায়ে আলমে ইসলামির বিবৃতি হয়তো আপনি দেখেছেন। এ সম্পর্কে আপনিও মতামত প্রকাশ করুন।

জবাব: ১. এ ব্যাপারে আমার প্রতিক্রিয়া হলো, মার্কিন সরকার যদি ইনসাফ ও নৈতিকতার সকল আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে ইহুদিদের অন্যায় সমর্থন ও সাহায্য অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর না হতো, তাহলে ইসরাঈল কখনো ধৃষ্টতা ও স্পর্ধা দেখাতে পারতো না যে, ক্রমাগতভাবে একটার পর একটা অধিকতর দুর্ধর্ষ দস্যুবৃত্তি, যুলুম ও আগ্রাসনের অপরাধ সংঘটিত করে যেতে থাকবে। এজন্য আমার কাছে বিবেকহীন আমেরিকাই আসল অপরাধী। সমগ্র জগতবাসীর চোখের সামনে এমন

অপরাধপ্রবণ রাষ্ট্রটিকে আস্কারা দিতে তার বিন্দুমাত্রও লজ্জা বোধ হয় না। আমেরিকা ইহুদিদের হাতে এতোই অসহায় যে, ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী সফরে এলেই সেখানকার ইহুদি ধর্মযাজকবৃন্দ ও প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ হোয়াইট হাউজে ভীড় জমান, বেগিনকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে প্রেসিডেন্টের উপর চাপ সৃষ্টি করেন এবং শুধু নেপথ্যেই নয় বরং আভাস ইঙ্গিতে তাকে এটাও বুঝিয়ে দেন যে, কেউ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে চাইলে তাকে ইহুদি ভোট অবশ্যই পেতে হবে। এই পটভূমিতে বেগিন যখন লজ্জার মাথা খেয়ে সদম্ভে উচ্চারণ করে যে, '১৯৬৭ সালের যুদ্ধে জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ফিলিস্তিনের যে অংশটা আরবদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল। তা অধিকৃত এলাকা নয় বরং মুক্ত এলাকা এবং চার হাজার বছর আগে বাইবেলে এ জায়গা আমাদের দেয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সেই সুবাদে ওটা আমাদের উত্তরাধিকার, তাই আমরা ওটা ছাড়বো না।' তখন মানবাধিকার, ইনসাফ ও ন্যায়নীতির বুলি আওড়ানো জিমি কার্টার সাহেব এমন নির্লজ্জ উক্তিকেও মায়ের দুধের মতো পরম আহলাদে খেয়ে নেন। এমন খোলাখুলি ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা মার্কিন শাসকরা ও জনগণ নির্বিবাদে শোনে এবং কেউ মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসাও করে না যে, বাইবেলের চল্লিশ শতাব্দী পুরানো কথার ভিত্তিতে আজ একটা দেশের উপর অন্য একটা জাতি কিভাবে এ দাবি জানাতে পারে? এ ধরনের যুক্তি দিয়ে যদি একটি জাতির আবাসভূমির উপর আরেক জাতির দখলদারিত্বকে বৈধ বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে আরো কতো জাতিকে যে তাদের আবাসভূমি থেকে বঞ্চিত হতে হবে তা কে জানে।

২. মসজিদে আকসাতে ইহুদিরা যে স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং ইতিপূর্বে তারা আল খলীলে মসজিদে ইবরাহিমীতে যা চালিয়েছে, তার প্রতিকার ও প্রতিরোধ বক্তৃতা, বিবৃতি, প্রস্তাব ও জাতিসংঘের ঘোষণাবলী দ্বারা হতে পারে না। ইহুদিরা এ সবই করছে গায়ের জোরে এবং সে জোর তাদেরকে আমেরিকাই দিচ্ছে। যতোদিন আমরা আমেরিকার উপর ইহুদিদের চাপের চেয়েও বড় চাপ প্রয়োগ করতে না পারবো, ততোদিন এই দস্যুবৃত্তি বন্ধ হওয়ার আশা সুদূর পরাহত। (তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর: ১৯৬৭)

দাওয়াত ও আন্দোলন প্রসঙ্গ

০১. তাসাউফের পরিভাষা, সিলসিলা ও শাসকদের চিঠিতে দাওয়াত।

প্রশ্ন: তাসাউফের পরিমণ্ডলে কয়েকটা পরিভাষা বেশ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত, যথা কুতুব, গাউস, আবদাল ও কাইয়ুম, কুরআন ও হাদিসে এ সবের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়না। এ ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত গবেষণালব্ধ কোনো তথ্য থেকে থাকলে জানাবেন। তাসাউফের চার তরিকা সম্পর্কেও আপনার অভিমত জানাবেন।

একটা বহুল প্রচলিত জনশ্রুতি রয়েছে যে, আলী রা. হাসান বসরী রহ.-কে খেরকা (ছেঁড়া জামা) দিয়েছিলেন এবং আলী রা. থেকেই ফকির দরবেশদের যাবতীয় সেলসেলা বা তরিকা শুরু হয়েছে। আমি মোল্লা আলী কারী লিখিত মাউযুয়াতে কবীর' থেকে উক্ত জনশ্রুতি সংক্রান্ত মন্তব্য তুলে দিচ্ছি। এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে আপনাকে অনুরোধ করছি:

'সুফীদের খেরকা পরা সংক্রান্ত হাদিস এবং আলী রা. হাসান বসরীকে খেরকা পরিয়েছিলেন বলে যে জনশ্রুতি রয়েছে, তা ইবনে দিহইয়া ও ইবনে সালাহর মতে ভুয়া ও ভিত্তিহীন। ইবনে হাজার আসকালানী বলেন: যে সূত্র থেকে এটা বর্ণিত হয়েছে তার কোনোটাই ঠিক নয়। কোনো শুদ্ধ বা উৎকৃষ্ট রেওয়ায়েত তো দূরের কথা, কোনো দুর্বল রেওয়ায়েতেও একথা বলা হয়নি যে, সুফীদের প্রচলিত রীতি মোতাবেক রসূল সা. কোনো সাহাবিকে খেরকা পরিয়েছেন কিংবা কাউকে পরাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে যেসব জনশ্রুতি রয়েছে তা সবই ভিত্তিহীন। তাছাড়া ইবনে হাজার বলেন, আলী রা. হাসান বসরীকে খেরকা পরিয়েছিলেন এ কথাও মিথ্যা। হাদিস শাস্ত্রের ইমামগণের মতে তো আলী রা.-এর সাথে হাসানের সাক্ষাতই হয়নি, খেরকা পরার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

সূফীদের মধ্যে সাত লতিফার একটা পর্যায়ক্রমিক ও ক্রমোন্নতিমূলক পদ্ধতি চালু আছে। হাদিস গ্রন্থসমূহে জিকর ও ধ্যানের এ পদ্ধতি বর্ণিত নেই। এ সম্পর্কে আপনার মতামত লিখে জানাবেন। একটি প্রস্তাবের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। আমার মতে, মুজাদ্দিদে আলফেসানী শেখ আহমদ সারহিন্দী যেভাবে সমসাময়িক সরকারি আমলা, আমীর ওমরা ও উজীরদেরকে উপদেশ সম্বলিত চিঠি লিখে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, আপনিও সেই পন্থা অবলম্বন করুন।

জবাব: তাসাউফের যেসব পরিভাষার উল্লেখ আপনি করেছেন, তন্মধ্যে শুধু আবদাল শব্দটার উল্লেখ আলী রা.-এর একটা বাণীতে পাওয়া যায়। এছাড়া গাউস, কুতুব ও কাউয়ুম এসব শব্দের কোনো উল্লেখ রসূল সা.-এর বাণী কিংবা সাহাবি ও তাবেয়ীনদের বক্তব্যে পাওয়া যায় না। খোদ আবদাল সম্পর্কে সূফী সমাজে যে ধারণা প্রচলিত, আলী রা.-এর যে বাণীটি এর উৎস, তাতে সেদিকে কোনো ইঙ্গিত নেই।

তাসাউফের চার তরিকা সম্পর্কে আপনি কি জানতে চান আমি বুঝতে পারিনি। মুসলিম উম্মাহর অত্যন্ত সৎকর্মশীল প্রবীণ নেতৃবৃন্দই এগুলোর প্রতিষ্ঠাতা। মানুষের আত্মা ও চরিত্রের সংশোধন ও পবিত্রতা সাধনই তাদের উদ্দেশ্য ছিলো। আর এটা যে একটা মহৎ ও পবিত্র উদ্দেশ্য, সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু মুসলিম জাতির জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র ও বিভাগ যেমন ক্রমান্বয়ে অবনতির শিকার হয়েছে এবং তাতে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ অনেক কিছুরই মিশ্রণ ঘটেছে, তেমনি এই তরিকাগুলিও স্বীয় আদি পূতপবিত্র মানে বহাল থাকতে পারেনি। তবে আল্লাহর অনুগ্রহে কুরআন ও সুন্নাহ পৃথিবীতে সুরক্ষিত রয়েছে। এ দুটির নির্দেশনায় আমরা যেমন জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে সত্য ও অসত্যের পার্থক্য নির্ণয় ও বাছবিচার করতে পারি, তেমনি তাসাউফের তরিকাসমূহের চিন্তা ও কর্মের মধ্যেও এই বাছবিচার করা সম্ভব।

আলী রা.-এর কাছ থেকে হাসান বসরী রহ. খেরকা লাভের যে কাহিনী সুফী সমাজে চালু রয়েছে, তার কোনো ভিত্তি নেই। আপনি মোল্লা আলী কারীর যে মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তা সম্পূর্ণ সঠিক। সুফী সমাজে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র শুদ্ধি এবং শিক্ষা দীক্ষার যে নিয়ম প্রণালী চালু রয়েছে, তার অধিকাংশই সুফী সাহেবানদের নিজস্ব উদ্ভাবন। রসূল সা., সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের আমলে অধিকাংশেরই কোনো নাম-নিশানাও ছিলনা।

মুজাদ্দিদে আলফেসানীর অনুসৃত পন্থায় ক্ষমতাসীনদের কাছে চিঠি লেখার যে পরামর্শ আপনি দিয়েছেন, তা আমি অবশ্যই কার্যকরী করতাম যদি দেখতাম যে, ক্ষমতাসীনদের মধ্যে আমার প্রতি সুধারণা পোষণকারী এবং আমার সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রক্ষাকারী কেউ আছে। এবং সেই সাথে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ঐ গোষ্ঠীতে কিছু না কিছু প্রভাব প্রতিপত্তিরও অধিকারী। এ ধরনের লোক যদি থাকতো, তাহলে তাদেরকে আমার কিছু বলা সার্থক ও ফলপ্রসূ হতে পারতো। কেননা তাদের প্রভাব ও চেষ্টায় সংশোধনের একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যেতো। মুজাদ্দিদে আলফেসানী যাদের সাথে পত্রালাপ করেছেন, তাদের মধ্যে এ দুটো বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান ছিলো। (তরজমানুল কুরআন, আগষ্ট: ১৯৬৫)

০২. অমুসলিম দেশে ইসলাম প্রচার।

প্রশ্ন: কিছুদিন যাবত আমেরিকায় বসবাস করছি। এখানকার লোকদের সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে মতামত বিনিময়ের সুযোগ মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। আল্লাহ যেটুকু বুঝসুজ দিয়েছেন এবং আপনার বইপুস্তক ও অন্যান্য ধর্মীয় বইপুস্তক পড়ে ইসলাম সম্পর্কে যতোটুকু চেতনা ও জ্ঞান অর্জন করেছি, সে অনুসারে ইসলামের ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট থাকি। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে, লোকেরা বাহ্যত বস্তুগত প্রাচুর্য ও আরামআয়েশ নিয়েই তৃপ্ত এবং এর মাধ্যমেই আরো বেশি তৃপ্তি লাভ করতে সচেষ্ট। এদের সমস্যা ও মনোযোগ আকর্ষণকারী বিষয়সমূহ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণকারী বিষয় থেকে আলাদা বলে মনে হয়। এদের ভ্রষ্টতা ও বিকৃতিও

আমাদের দেশের গোমরাহী থেকে ভিন্ন ধরনের ও প্রকটতর পর্যায়ের। যে ধরনের যুক্তিতর্ক দিয়ে আমরা মুসলিম সমাজের বিপথগামী লোকদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথের দিকে ডাকতে পারি এবং ইসলামি আদর্শকে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারি, সেই ধরনের যুক্তিতর্ক এখানে হয়তো কার্যকর হবে না।

আমার প্রত্যাশা হলো, আপনি এখানকার পরিবেশ ও মানসিকতার আলোকে ইসলাম প্রচার ও ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি কি হওয়া উচিত, এখানকার মানুষের চিন্তা ও কর্মের গোমরাহী ও ক্ষতিকর ফলাফল সম্পর্কে তাদেরকে কিভাবে সচেতন করে তোলা যায় এবং তাদেরকে সংস্কারের প্রতি অনুরাগী করার কি কি কৌশল প্রয়োগ করা যায়, তা আমাকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবেন। এখানে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠিকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা ও ইসলামে দীক্ষিত করাতো কঠিন ব্যাপার বলে মনে হয়। তবে কাজের সূচনালগ্নে কোন্ কর্মপন্থা অবলম্বন করা সমীচীন হবে সেইটিই শুধু জানা দরকার।

জবাব: আমেরিকায় আপনার সামনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা আসলে নতুন কিছু নয়। এ ধরনের জড়বাদী সমাজ যেখানেই আছে সেখানে ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতে গিয়ে এ ধরনেরই জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাফহীমুল কুরআনে মক্কী সূরাগুলো মনোনিবেশ সহকারে পড়লে আপনি জানতে পারবেন যে, কুরাইশদের মন মানসিকতাও এ ধরনেরই ছিলো। এ ধরনের মানসিকতা বিশিষ্ট লোকদেরকে জাগিয়ে তোলা ও তাদেরকে মহাসত্যের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কুরআনে দাওয়াতের যে ভঙ্গি ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, সেটা যদি আপনি ভালোভাবে মনোনিবেশ সহ লক্ষ্য করেন ও বুঝতে চেষ্টা করেন, তাহলে এ ধরনের যে কোনো সমাজে দাওয়াতী কাজের পদ্ধতি ও প্রণালী আপনার আয়ত্তে এসে যাবে। এই পদ্ধতি ও প্রণালী অনুসারে দাওয়াতী কাজ চালাতে হলে যে সমাজে আপনি কর্মরত তার মৌলিক খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আপনাকে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং ঐসব খারাপ বৈশিষ্ট্য লালনের যে কুফল ঐ সমাজে দেখা দিচ্ছে সে সম্পর্কেও আপনাকে বেশি করে নির্ভুল, প্রামাণ্য ও বিশদ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আমেরিকা সম্পর্কে এ ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা আপনার পক্ষে খুবই সহজ। সেখানে ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা, অপরাধের বৈজ্ঞানিক ও সংগঠিত পন্থা ও প্রক্রিয়া এবং তার পেছনে উচ্চশিক্ষিত লোকদের মেধা সক্রিয় থাকা বিশ বছরেরও কমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের একদিকে অপরাধের প্রতি ক্রমবর্ধমান ঝোঁক, অপরদিকে অস্বাভাবিক বল্গাহারা যৌনতার সয়লাবে গা ভাসিয়ে দেয়া (Abnormal Sexuality) তালাকের ব্যাপকতা ও পারিবারিক জীবন তছনছ হয়ে যাওয়া, একদিকে সম্পদের চরম প্রাচুর্য এবং অপরদিকে চরম দারিদ্রের উপস্থিতি, শুধু নিজ সমাজের লোকদের সাথে নয় বরং আপন আত্মীয় স্বজন এবং স্বয়ং নিজের বৃদ্ধ মা বাপের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, আর তার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ভিয়েতনামে যে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ এবং ফিলিস্তিনে বলপ্রয়োগে ইসরাইল রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠা করে যে চরম স্বার্থপরতামূলক যুলুম চালানো হচ্ছে, এসব জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মার্কিন সমাজের যেসব মানুষের বিবেক এখনো কিছুটা জীবন্ত আছে, তাদের মধ্যে তাদের বস্তুবাদী সভ্যতার মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেন। এসব উপকরণকে কাজে লাগিয়ে কুরআনের অনুসৃত ভঙ্গীতেই সমালোচনাও করুন। সেই সাথে কুরআনের অনুসৃত পদ্ধতিতে এবং কুরআনী যুক্তির ভাষায় মৌলিক সংস্কারের আহবানও জানান।

মার্কিনীদের দ্বিতীয় বিভ্রান্তি হলো খৃষ্টবাদ। এ বিষয়ে সমালোচনা চালানোর জন্য আপনি তাফহীমুল কুরআন থেকেই প্রয়োজনীয় সকল উপদান পেতে পারেন। এর সব কয়টি খণ্ডের পরিশিষ্টে উল্লিখিত বিষয়সূচী মনোনিবেশ সহ পড়ে দেখে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। তবে সেই সাথে আপনাকে খৃষ্টধর্মও অন্ত তপক্ষে আবশ্যকীয় পরিমাণে অধ্যয়ন করতে হবে। এতে করে আপনি একজন অজ্ঞ মানুষের মতো নয় বরং বিজ্ঞজনের মতো কথা বলতে পারবেন। অধিকন্তু আপনি মানুষের মনে একথাও বদ্ধমূল করুন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আসল ধর্ম মানবজাতির পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে আদিকাল থেকেই সকল নবী নিয়ে এসেছেন তা কি ছিলো এবং পরে সেই আসল ধর্মকে বিকৃত করে কিভাবে খৃষ্টবাদ, ইহুদিবাদ ও অন্যান্য ধর্ম তৈরি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনি তাফহীমুল কুরআন থেকে বিশদ তথ্য জানতে পারবেন। পরিশিষ্টে 'নবুয়ত' শিরোনাম বের করে দেখুন। এই প্রক্রিয়া আপনি মানুষকে বুঝাতে পারবেন যে, আমরা আসলে আপনাদেরকে ধর্মান্তরিত করতে চাইনে। বরঞ্চ যে ধর্ম স্বয়ং ঈসা আ., মূসা আ. ও ইবরাহীম আ.-এর ধর্ম ছিলো, তার দিকেই আমরা আপনাদেরকে আহবান করছি। তাদেরকে বলুন, ইসলাম শুধু মুহাম্মদ সা.-এরই ধর্ম নয় বরং সকল নবী ও সকল ঐশী গ্রন্থের ধর্ম। একজন মুসলমান এই সকল নবীর কাউকেই এবং এই সকল কিতাবের কোনটাকেই অস্বীকার করে না।

এ কথাও জেনে রাখুন যে, এ ধরনের সমাজে ব্যাপক আকারে ধর্মান্তর (Conversion) ঘটেনা। দাওয়াতকারীকে যদিও হাজার হাজার মানুষের কাছে যেতে হয়। কিন্তু প্রথম দুই একজনই সত্যকে আলিঙ্গন করে। আপনি যাদের যাদের সাথেই কথা বলেন, তাদের মধ্য থেকে এমন একজন মানুষ অনুসন্ধান করুন, যার মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা বিদ্যমান এবং যিনি হক ও বাতিলের ব্যাপারে সুস্থ চিন্তা ও নির্মল দৃষ্টির অধিকারী। এমন একজন মানুষ যখন পাওয়া যাবে, তখন প্রথমে তার উপরই অধিক শ্রম ব্যয় করতে থাকুন, যতোক্ষণ না সে আপনার সর্বাত্মক সহযোগি হয়ে যায়। অতঃপর সেই ব্যক্তিই আরো অনেককে সংশোধন করার মাধ্যম হয়ে যাবে। তবে এমন কোনো লোকের ইসলাম গ্রহণের উপর নির্ভর করবেন না, যার আবেগ অনুভূতি, মূল্যবোধ, চিন্তাধারা ও জীবনপদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আসেনি। যেসব পাশ্চাত্যবাসী ইসলামের কোনো একটা বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়ে যায় কিন্তু মুসলমান হওয়ার আগে যেমন ছিলো, মুসলমান হওয়ার

পরও তেমনি থেকে যায়, তারা আসলে কোনো কাজের লোক নয়। বরঞ্চ তাদের মুসলমান হওয়াটাই একটা ফেতনা বিশেষ। (তরজমানুল কুরআন, অক্টোবরঃ ১৯৬৬)

০৩. খৃষ্টান মিশনারীর কি মুসলিম দেশে অবাধ প্রবেশাধিকার উচিত?

প্রশ্নঃ আমেরিকা থেকে আমার এক বন্ধু চিঠি লিখেছেন যে, সেখানকার আরব ও মুসলিম ছাত্ররা আপনার কাছ থেকে দুটো প্রশ্নের জবাব জানতে চায়। প্রশ্ন দুটো নিম্নে দেয়া হলো।

১. মুসলিম দেশগুলোতে কি অন্যান্য ধর্মের প্রচারকদের বিশেষত খৃষ্টান মিশনারীদের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা উচিত? এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

২. বিধি-নিষেধ আরোপ করা যদি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বাধ্যতামূলক হয় তাহলে খৃষ্টানরাও নিজেদের দেশে মুসলিম প্রচারকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করবে। এমতাবস্থায় বিশ্বমানবের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর উপায় কি হবে?

জবাবঃ এ প্রশ্নগুলো উত্থাপন করার সময় আপনার বন্ধু হয়তো ভেবেছেন যে, আমরা যদি পাশ্চাত্য দেশে ইসলাম প্রচারকদের প্রবেশ উন্মুক্ত রাখতে চাই, তাহলে আমাদের পশ্চিমী মিশনারীদের জন্য আমাদের দরজা খোলা রাখতে হবে। নচেত তাদের মিশনারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে আমরা যদি তাদেরকে আমাদের ধর্মের প্রচারকদের যাওয়ার পথ খোলা রাখতে বলি, তবে সেটা ইনসাফ বিরোধী ও অযৌক্তিক হবে। কিন্তু আমার ধারণা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার মতে খৃষ্টান মিশনারীরা শত শত বছর ধরে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে নিজেদের ধর্ম প্রচারের জন্য যে কলা-কৌশল অবলম্বন করছে, কয়েকটি পশ্চিমা দেশ থেকে এ কাজের জন্য যে রকম বিরাট আকারে পুঁজি সরবরাহ করা হচ্ছে এবং সেই পুঁজির সাহায্যে মিশনের অপতৎপরতায় জর্জরিত দেশগুলোতে যে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা হচ্ছে, তা দৃষ্টিপথে থাকলে কোনো বিবেকবান মানুষ ইনসাফের দোহাই দিয়ে আমাদের কাছে মিশনারীদের প্রবেশাধিকার দেয়ার দাবি জানাতে পারেনা। বরঞ্চ আমাদের দেশগুলো থেকে সকল বিদেশী ধর্মপ্রচারকদের অবিলম্বে বহিষ্কার করা এবং ভবিষ্যতে তাদের কাউকে আর ঢুকতে না দেয়াই ইনসাফের দাবি। এর প্রতিক্রিয়ায় পাশ্চাত্য দেশগুলোতে যদি ইসলাম প্রচারকদের প্রবেশ নিষিদ্ধও করে দেয়া হয়, তবে আমাদের তার তোয়াক্কা করা চাই না। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে এই প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ একেবারেই অযৌক্তিক ও অন্যায় হবে। কেননা মুসলমানরা কখনো দুনিয়ার কোনো দেশে ইসলাম প্রচারের নামে খৃষ্টান মিশনারীদের মতো অপকৌশল প্রয়োগ করেনি এবং আজও করছে না। ঐসব অপকৌশল কেবলমাত্র খৃষ্টানদেরই বৈশিষ্ট্য। কোনো পাশ্চাত্য দেশ আমাদের কোনো প্রচার মিশন সম্পর্কে নামমাত্র ঐ ধরনের অভিযোগ তোলার সুযোগ পায়নি, যে অভিযোগে আমাদের মন ভারাক্রান্ত।

আমার এ বক্তব্যে যদি কারোর সন্দেহ থাকে তাহলে তার এশিয়া ও আফ্রিকার দেশে দেশে মিশনারীদের কর্মকাণ্ডের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জ্ঞান অর্জন করা উচিত এবং তারা বিভিন্ন দেশে আপন প্রচারকার্যে যে ফন্দিফিকির অবলম্বন করেছে, তা অধ্যয়ন

করা উচিত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এইসব ধর্মপ্রচার মিশন আসলে দুনিয়ার বেশির ভাগ দেশে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য বিস্তারের পথ সুগমকারী অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে কাজ করেছে। আফ্রিকার জনৈক নেতা ঐ মহাদেশে খৃষ্টান মিশনারীদের কর্মকাণ্ডের নিম্নরূপ বিবরণ দিয়েছেন: 'পাশ্চাত্যবাসী যখন আমাদের এখানে আসে, তখন তাদের হাতে ছিলো ধর্মগ্রন্থ আর আমাদের দখলে ছিলো জমি। কিছুকাল পরে দেখা গেলো যে, সেই ধর্মগ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে এবং জমি চলে গেছে তাদের দখলে।'

সাম্রাজ্যবাদের আগমনের পথ সুগম করার পর যেখানেই মিশনারীরা কোনো পশ্চিমা জাতিকে কোনো আফ্রিকী বা এশীয় দেশে আধিপত্যশীল করতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে তারা ক্ষমতা ও সম্পদের সাহায্যে নিজেদের ধর্মকে জাতির ঘাড়ে গায়ের জোরেও চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে, আবার টাকা দিয়েও তাদের ঈমান ও বিবেক কিনে নিয়েছে। কোনো কোনো দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমগ্র শিক্ষা বিভাগকে ঐসব মিশনারীর হাতে সঁপে দিয়েছে। আর তারা কোনো ব্যক্তিকে খৃষ্টান না হওয়া পর্যন্ত অথবা নিদেনপক্ষে নিজের নাম পাল্টিয়ে খৃষ্টান নাম না রাখা পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণেরই সুযোগ দেয়নি। কোনো কোনো দেশে তারা এক একটা গোটা এলাকাকে আইনত নিজেদের একচেটিয়া চারণভূমিতে পরিণত করেছে এবং সেইসব এলাকায় অন্য কোনো ধর্মের প্রচারকতো দূরের কথা, সাধারণ অনুসারীর প্রবেশেও প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেছে। দক্ষিণ সুদান -এর নিকৃষ্টতম ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ইংরেজ সরকার এই অঞ্চলটাকে একেবারেই মিশনারীদের হাতে অর্পণ করেছিল এবং উত্তর সুদানের কোনো মুসলমানকে বিশেষ অনুমতি ছাড়া সেখানে যেতে দেয়া হতো না। চাই সে প্রচারের উদ্দেশ্যে নয় বরং নিজের কোনো ব্যক্তিগত কাজেই সেখানে যাক না কেন। সুদানের স্বাধীনতার পর যখন জাতিয় সরকার ক্ষমতায় বসলো এবং সে দক্ষিণ সুদানে মিশনারীদের এই একচেটিয়া আধিপত্যের বিলোপ সাধন করলো, তখন তারা সেখানে বিদ্রোহ ঘটিয়ে দিলো। আজ কয়েক বছর হয়ে গেলো এরা ইথিওপিয়ার খৃষ্টান সরকার এবং আশপাশের অন্যান্য খৃষ্টান অঞ্চলের সাহায্যে সুদান সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক গোলযোগ সৃষ্টি করে চলেছে। তারা এর চেয়েও জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছে দক্ষিণ ভিয়েতনামে। খৃষ্টান সংখ্যালঘু সেখানে বৌদ্ধ সংখ্যাগুরুকে কার্যত নিজেদের আজ্ঞাবহ বানিয়ে রাখার জন্য বারবার ষড়যন্ত্র চালিয়েছে।

আমাদের দেশেও ইংরেজ শাসকদের আগমনের সাথে সাথেই প্রথমে এইসব মিশনারী চরম আক্রমণাত্মক কায়দায় মুসলমানদের ধর্মের উপর আঘাত হানতে আরম্ভ করেছিল। পরে যখন ইংরেজ সরকার মিশনারীদের এই তৎপরতা দ্বারা রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে বলে আশংকা বোধ করলো, তখন এই নীতি বাদ দিয়ে নতুন ফন্দি উদ্ভাবন করা হলো। মাদ্রাসা, কলেজ, হাসপাতাল ও বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে রকমারি ব্যাপক আকারের সুযোগ সুবিধা দেয়া হলো,

বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে কর্মী প্রদান করা হলো, মোটা দাগের আর্থিক সাহায্য দেয়া হলো, বিদেশ থেকেও এসব প্রতিষ্ঠানে অকাতরে অর্থ বিতরণ করা হলো। এসব পন্থা অবলম্বন করে তারা একদিকে প্রলোভনের অস্ত্র প্রয়োগ করে গরীবদের ধর্ম ও ঈমান খরিদ করলো। অপরদিকে যেসব মুসলমান তাদের নাগালে আসে, তাদেরকে যদি খৃষ্টান বানানো সম্ভব নাও হয়, তবে তারা যাতে মুসলমানও থাকতে না পারে, সেজন্য চেষ্টার কমতি রাখলো না।

মধ্যপ্রাচ্যে এই কুচক্রীরাই তুর্কীদেরকে তুরানী জাতীয়তাবাদ এবং আরবদেরকে আরব জাতীয়তাবাদের পাঠ শিখিয়ে শেষ পর্যন্ত পরস্পরকে সংঘর্ষে লিপ্ত করে এবং উসমানী সাম্রাজ্যকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। ইসলামের প্রথম মিশনবাহী আরব জাতির মধ্যে তারা এতো গোমরাহীর বীজ বপন করে যে, তারা ইসলামের পরিবর্তে আরব জাতীয়তাবাদকেই আসল জিনিস মনে করতে আরম্ভ করে এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে বড় বড় রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও তাত্ত্বিক আন্দোলন গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন হলো, এসব কর্মকান্ড কি সত্যিই 'ধর্মপ্রচার' এর ন্যায় নিষ্কলুষ নামে আখ্যায়িত হবার যোগ্য? যারা এসব কর্মকাণ্ডে জড়িত, তাদের কি বাস্তবিকই ধর্মের নামে এ কাজ চালিয়ে যাওয়ার অবাধ অধিকার রয়েছে? আমি মনে করি না যে, তাদের এই ইতিহাস এবং এই সব কার্যকলাপ দেখে কোনো ন্যায়নিষ্ঠ ও বিবেকবান মানুষ বলতে পারে যে, দুনিয়ার দেশে দেশে তাদের 'ধর্মপ্রচারের' অধিকার সংরক্ষিত থাকা উচিত, অথবা কেউ এরূপ মত ব্যক্ত করতে পারে যে, মুসলমানরা যদি নিজেদের দেশে এই মিশনারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে, তাহলে পাশ্চাত্য দেশগুলির পক্ষেও মুসলিম মিশনারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা ন্যায়সঙ্গত।

প্রসঙ্গত এ কথাও বুঝে নিন যে, ধর্মপ্রচারের যে সংগঠনকে 'মিশন' এবং যে পেশাদার প্রচারককে 'মিশনারী' বলা হয়, তা আগেতো মুসলমানদের মধ্যে আদৌ বিদ্যমান ছিলনা এবং বর্তমানেও তা কদাচিত কোথাও পরিদৃষ্ট হয়। ইসলামের প্রচারের কাজ সব সময় সাধারণ মুসলমানরাই করেছে। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত কাজ উপলক্ষ্যে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যেত। তারা যেখানেই মানুষের সংস্পর্শে যেত, সেখানে মানুষ তাদের কথাবার্তা শুনে এবং তাদের ইবাদাতের পদ্ধতি ও জীবনযাপন প্রণালী দেখে ইসলাম গ্রহণ করতো। এ ধরনের তাবলীগ বা প্রচারের পথ দুনিয়ার কোনো শক্তিই রুদ্ধ করতে পারে না। এ জন্য পাশ্চাত্য দেশগুলো যদি ইসলামের প্রচার কার্য ও প্রচারকদের প্রবেশ সেখানে রুদ্ধও করে দেয়, তবে তাতে আমাদের কোনো ক্ষতির আশংকা নেই। যতোক্ষণ একজন মুসলমানের কোথাও প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে ততোক্ষণ ইসলামের প্রবেশ দ্বারও সেখানে উন্মুক্ত থাকবে। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি: ১৯৬৭)

০৪. হক ও বাতিলের সংঘাত ও তার প্রকৃত তাৎপর্য।

প্রশ্ন: বেশ কিছুদিন যাবত একটা মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছি। অনুগ্রহপূর্বক এব্যাপারে আমাকে পথ প্রদর্শন করুন। দ্বন্দ্বটা হলো, নবুয়ত যুগ ও খেলাফত যুগ বাদে আজ

পর্যন্ত মুসলমানদের যে গোষ্ঠীটি দীনদারী ও ঈমানদারীর দাবি যথাযতভাবে পূরণ করার চেষ্টা করে এসেছে, তারা সব সময় ব্যর্থ হয়ে আসছে কেন? বিশেষত যখন আমরা দেখি যে, তাদের দীনি ভাইরাই এর প্রধান কারণ ছিলো এবং এখনো আছে, তখন এই ব্যর্থতা আরো গুরুতর বলে মনে হয়। প্রশ্ন হলো, যে ইসলাম পার্থিব জীবনকে সুষ্ঠু সুন্দর করে গড়ার জন্যই নাযিল হয়েছে, যার সকল বিধি বিধান পার্থিব জীবনে কার্যকরী করার জন্যই প্রণীত হয়েছে এবং যাকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহর বহু বান্দা জীবন দিয়েছে, আবার অনেকে এ জন্য জীবন উৎসর্গ করে রেখেছে, সেই ইসলাম বিজয়ী হতে পারলো না কেন? কেনোই বা দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ ইসলামের বরকত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত? আল্লাহর বান্দাহদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুষ্টিমেয় সংখ্যক প্রতাপশালীর জুলুম নির্যাতন সহ্য করে চলেছে কোন্ কারণে? অর্থনৈতিক অবিচার, দারিদ্র ও দুঃখ কষ্টের মর্মন্তুদ যাতনায় পিষ্ট হচ্ছে কেন? শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠাকারী সত্য দীন এবং তার অনুসারীরা কেন দুর্বল, অসহায়, মযলুম ও অক্ষম জনতার সহায় হতে পারছে না?

জবাবঃ আপনি যে মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছেন তা সহজেই নিরসন হতে পারে, যদি আপনি একবার এ কথাটা ভালো করে বুঝে নেন যে, এই পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছা ও নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছেন। আর এ স্বাধীনতা সে কিভাবে ব্যবহার করে, তাতেই তার পরীক্ষা। এ বিষয়টা যদি আপনি হৃদয়ঙ্গম করে নেন তা হলে আপনার বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, কোনো দেশ, জাতি বা যুগের লোকদের মধ্যে যদি অন্যায় ও অসত্যের আহ্বান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কিংবা কোনো বাতিল ব্যবস্থা বিজয়ী ও কর্তৃত্বশীল থাকে, তবে সেটা সেই বাতিল ও অসত্য ব্যবস্থার সাফল্য নয়। বরং যে মানব সমাজের মধ্যে একটা বাতিল প্রচারণা বা বাতিল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পেলো, সেই সমাজেরই ব্যর্থতা। একইভাবে সত্যের দাওয়াত ও তার কর্মীরা যদি সাধ্যমত সঠিক পন্থায় সংস্কার ও সংশোধনের কাজ চালিয়ে যায় এবং ইসলামি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে, তাহলে সেটা ইসলামি ব্যবস্থা ও তার প্রতিষ্ঠাকামী কর্মীদের ব্যর্থতা নয়। বরং যে সমাজে সত্যের জনপ্রিয়তা অর্জিত হলোনা এবং অন্যায় ও অসত্য পরিপুষ্ট হলো সেই সমাজেরই ব্যর্থতা। দুনিয়াতে হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত স্বয়ং একটা পরীক্ষা এবং এ পরীক্ষার ফলাফল ইহকালে নয় বরং পরকালে প্রকাশ পাবে। কোনো দেশে অথবা সমগ্র দুনিয়ায়ই যদি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সত্যকে অগ্রাহ্য ও বাতিলকে গ্রহণ করে তবে তার এ অর্থ হয় না যে, সত্য বিফল এবং অসত্য সফল হয়ে গেলো।

বরঞ্চ তার প্রকৃত অর্থ হলো, মানব সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আপন প্রভুর পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে গেলো। এর শোচনীয় পরিণাম সে অবশ্যই পরকালে ভোগ করবে। পক্ষান্তরে যে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বাতিলের মোকাবিলায় সত্যের উপর অবিচল রইলো এবং ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জান ও মালের সর্বাত্মক ঝুঁকি নিলো, সে এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হলো এবং আখেরাতেও সে নিজের এই সাফল্যের

গৌরবময় সুফল উপভোগ করবে। এ কথাটাই আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়ার সময় স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন।[১]

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ • وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ •

এ বিষয়টা অবগত হলে আপনি এ কথাও ভালোভাবেই বুঝতে পারবেন যে, বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তার জায়গায় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হকপন্থীদের দায়িত্ব নয়। তাদের প্রকৃত দায়িত্ব হলো, আপন সাধ্যমত বাতিলকে উৎখাত করা ও সত্যকে বিজয়ী ও কর্তৃত্বশীল করার জন্য সর্বোচ্চ মানের নির্ভুল, কার্যকর ও যথোচিত পন্থায় চেষ্টা চালাতে কোনো কসুর না করা।

আল্লাহর দৃষ্টিতে এই চেষ্টাই সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রকৃত মাপকাঠি। এ ব্যাপারে তারা যদি জেনে শুনে ও সচেতনভাবে কোনো ত্রুটি না করে তাহলে তারা আল্লাহর কাছে কৃতকার্য, চাই তাদের চেষ্টা সত্ত্বেও বাতিলের প্রাধান্য খর্ব না হোক এবং শয়তানের চরদের শক্তি স্তিমিত না হোক। কারো কারো মনে সময় সময় এ খটকাও জন্মে যে, ইসলাম যখন আল্লাহরই প্রেরিত জীবন ব্যবস্থা, এর প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের জন্য যারা চেষ্টারত তারা যখন আল্লাহর কাজেই নিয়োজিত এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তৎপর লোকেরা যখন আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহরত, তখন এই খোদাদ্রোহীরা কেন বিজয়ী হয় এবং অনুগতরা কেন যুলুমের শিকার হয়? কিন্তু যে কথা উপরে বর্ণনা করা হলো, তা নিবিষ্ট চিত্তে বিবেচনা করলে এ প্রশ্নের জবাবও আপনি নিজেই পেতে পারেন। আসলে মানুষকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, এটা তারই অনিবার্য ফল। আল্লাহ যদি এটাই চাইতেন যে, পৃথিবীতে কেবল তার আনুগত্য ও ফরমাবরদারী ছাড়া আর কিছু হতেই পারবে না এবং তার অসন্তোষজনক কাজ কেউ করতেই পারবে না, তাহলে জীব জানোয়ার, গাছপালা, সমুদ্র ও পাহাড়-পর্বত যেমন অনুগত, মানুষকেও তিনি তেমনি আনুগত্যশীল করে সৃষ্টি করতেন।

কিন্তু তা করা হলে তাতে পরীক্ষারও কোনো সুযোগ থাকতো না, আর সেক্ষেত্রে কৃতকার্যতার জন্য বেহেশত এবং ব্যর্থতার জন্য দোযখে নিক্ষেপেরও কোনো প্রশ্ন উঠতো না। কিন্তু এই পদ্ধতিটা বাদ দিয়ে আল্লাহ যখন মানবজাতি ও তার প্রতিটি ব্যক্তিকে পরীক্ষা করার পদ্ধতি অবলম্বন করলেন, তখন সে জন্য তাদেরকে (পরীক্ষার জন্য যতোটা দরকার) ইচ্ছা ও নির্বাচনের স্বাধীনতা দান করা অপরিহার্য ছিলো। আর যখন তিনি তাদেরকে এই স্বাধীনতা দিয়ে দিলেন, তখন আল্লাহর পক্ষে উপর থেকে হস্তক্ষেপ করে বল প্রয়োগ বিদ্রোহীদেরকে ব্যর্থ ও অনুগতদেরকে বিজয়ী করে দেয়া আর সমীচীন থাকলো না। এই স্বাধীনতার পরিবেশে হক ও বাতিলের

---

১. তোমাদের কাছে যদি আমার পক্ষ হতে পথ নির্দেশিকা আসে তাহলে যারা আমার পথনির্দেশ মেনে চলবে তাদের আর কোনো ভয় নেই এবং তাদের কোনো দুশ্চিন্তায়ও পড়তে হবেনা। পক্ষান্তরে যারা তা অমান্য করবে এবং আমার আয়াতগুলোকে অগ্রাহ্য করবে তারাই হবে দোযখের অধিবাসি এবং তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৮-৩৯)

মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত লেগে রয়েছে, তাতে সত্যের অনুসারী অসত্যের নিশানবাহী এবং সাধারণ মানুষ সবাই পরীক্ষাগারে নিজ নিজ পরীক্ষা দিয়ে চলেছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগতদের উৎসাহিত এবং অবাধ্যদের নিরুৎসাহিত অবশ্যই করা হয়। তবে এমন হস্তক্ষেপ করা হয় না, যাতে পরীক্ষার উদ্দেশ্যই নস্যাত হয়ে যায়। যারা ইসলামের একনিষ্ঠ ভক্ত তাদের পরীক্ষা হলো, তারা ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য কতোদূর প্রাণপণ সংগ্রাম করে। সাধারণ মানুষের পরীক্ষা হলো, তারা ইসলামের পতাকাবাহীদের পক্ষ নেয়, না বাতিলপন্থীদের পক্ষ নেয়।

আর বাতিলপন্থীদের পরীক্ষা হলো, তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে বাতিলের সমর্থনে কতোখানি হঠকারিতা দেখায় এবং ইসলামের বিরোধিতায় নোংরামীর কোন্ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। এটা একটা অবাধ ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা। এতে যদি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রামকারীরা মার খায় তাহলে তার অর্থ এ নয় যে, সত্য হেরে যাচ্ছে এবং আল্লাহ নীরব দর্শক হয়ে স্বীয় দীনের পরাজয়ের তামাশা দেখছেন।

বরং এর অর্থ হলো: আল্লাহর পরীক্ষায় ইসলামের পক্ষে সংগ্রামকারীদের নম্বর ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, তাদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন পরিচালনাকারীরা নিজেদের আখেরাতকে শোচনীয়ভাবে বিনষ্ট করছে এবং যারা এই প্রতিযোগিতায় নিরেট দর্শক সেজে তামাশা দেখছিল, যারা ইসলামের পক্ষ সমর্থনকে এড়িয়ে গিয়েছিল অথবা যারা বাতিল শক্তিকে বিজয়ী দেখে তার প্রতি সহযোগিতা দিয়েছিল, তারা নিজেদেরকে ভয়ংকর বিপদ ও ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করছে।

এ রকম ধারণা করা ঠিক নয় যে, যারা মুসলমানদের দলভুক্ত, তাদের এ পরীক্ষা দেয়ার প্রয়োজন হয় না কিংবা মুসলমান নামধারী হলেই এ পরীক্ষায় পাশ করা অবধারিত। এমন ভাবাও সঙ্গত নয় যে, মুসলিম জাতিতে বা দেশে ইসলাম থেকে বিচ্যুতির ব্যাপক প্রসার ঘটা কিংবা কোনো ধর্মহীন ব্যবস্থার প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব বজায় থাকা একটা আজব রহস্য, যার কোনো সমাধান নেই এবং যা মানসিক দ্বন্দ্ব ও খটকা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। আল্লাহর এই উন্মুক্ত পরীক্ষালয়ে কাফের, মোমেন, মোনাফেক, পাপাচারী ও নেককার, সকলেই নিরন্তর নিজ নিজ পরীক্ষা দিয়ে আসছে এবং আজও দিয়ে যাচ্ছে। কোনো মৌখিক দাবি নয় বরং বাস্তব কর্মই এক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিবেচ্য বিষয়। এর পরিণামও আদমশুমারির খাতা দেখে নয় বরং প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক সমাজ ও প্রত্যেক জাতির গোটা জীবনের কার্যবিবরণী দেখেই নির্ধারণ করা হবে। (তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল: ১৯৬৭)

০৫. মুফতি মুহাম্মদ ইউসুফের বই সম্পর্কে একটি প্রশ্ন।

প্রশ্ন: মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফের যে বইখানা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। আমি এ বইখানা পড়ে দেখেছি। আনন্দের কথা যে, বইখানা সর্বতোভাবে যুক্তিনির্ভর ও বলিষ্ঠ প্রমাণাদিতে সমৃদ্ধ। যারা যথার্থই কোনো ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়েছে, তাদের সে ভুল বুঝাবুঝি এ বই পড়লে দূরীভূত হবে। কিন্তু যারা একগুঁয়েমী ও

হঠকারী স্বভাবের তাদের রোগ নিরাময় করা কঠিন। আমি কয়েক বন্ধুকে পড়তে দিয়েছি। তারা বেশ তৃপ্তি লাভ করেছেন। কিন্তু এক মাওলানা সাহেব বইখানা পড়ে বললেন: আমার দ্বিধা দ্বন্দ্ব তো দূর হয়েছে। তবে একটা প্রশ্ন এখনো বাকি রয়েছে। সেটি হলো: মুফতী সাহেব যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্বয়ং মাওলানা মওদূদী তা অস্বীকার করেছেন। এ জন্যই তিনি এ বইতে কোনো ভূমিকা লেখেননি এবং এর প্রতি সমর্থনও ব্যক্ত করেননি।

আমি বললাম, মওদূদী সাহেব যদি এর সাথে দ্বিমত পোষণ করে থাকেন, তবে তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রকাশক এ বই প্রকাশ করতে গেলেন কেন এবং এতে ভূমিকা লিখলেন কেন? তাছাড়া 'তরজমানুল কুরআন' 'এশিয়া' ও 'আইন' প্রভৃতি পত্রিকায় এ বই এর বিজ্ঞাপন ছাপা হলো কেন? কিন্তু তবুও তিনি জিদ ধরে রয়েছেন এবং বলেছেন, মওদূদী সাহেবের অসম্মতি সত্ত্বেও জামায়াতের কিছু লোকের মর্জি অনুসারে এসব হয়েছে। মাওলানা সাহেব নিজে এসব পছন্দ করেননি। ঐ মৌলভী সাহেব আমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন, তোমার কথা যদি সত্য হয় তবে তুমি নিজে চিঠি লিখে জেনে নাও। এ জন্যই এ কথাগুলো লিখলাম, যাতে আপনি স্বয়ং এসব লোকের মনকে শান্ত করার জন্য দুচার কথা স্বহস্তে লিখে দেন।'

জবাব: যে মৌলভী সাহেব আপনাকে বলেছেন যে, 'মুফতী ইউসুফ সাহেব স্বীয় বইতে আমার বক্তব্যসমূহের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আমি তা অস্বীকার করেছি এবং সে জন্যই আমি এ বই-এর ভূমিকা লিখিনি এবং এ বইখানা আমার অসম্মতি সত্ত্বেও প্রকাশিত হয়েছে তিনি আপনাকে একটা নির্জলা মিথ্যা কথা বলেছেন। ভাবতে অবাক লাগে যে, আরবি মাদ্রাসাগুলোতে এমন জঘন্য মিথ্যাবাদী লোকেরাও রয়েছে এবং তারা আলেম বলে গণ্য হয়ে থাকে। তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এসব আজগুবী কথা তিনি কিসের মাধ্যমে জানতে পারলেন।

আপনি যদি মুফতী সাহেবের বইখানা মনোনিবেশ সহকারে পড়তেন তাহলে আপনার আমাকে জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন হতো না। বরং আপনি নিজেই বুঝে নিতে পারতেন যে, ঐ মৌলভী সাহেবের এ উক্তি একবারেই মনগড়া এবং আপনি এটাও বুঝতে পারতেন যে এ বইতে আমার প্রত্যয়নের আদৌ কোনো প্রয়োজনই ছিলনা। মুফতী সাহেব আমার কোনো বক্তব্যের ব্যাখ্যাও নিজে থেকেই দিয়ে দেননি। প্রতিটি ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি আমারই বক্তব্য ও পূর্বাপর বর্ণনা থেকে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এবং আমার উক্তিগুলোই পুরোপুরি উদ্ধৃত করেছেন, যার ফলে আমি যা বলতে চেয়েছি তা আয়নার মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। এভাবে যুক্তি প্রমাণ দর্শানোর পর আমার প্রত্যায়নের প্রয়োজন কেবল দুই ধরনের লোকেরাই অনুভব করতে পারে। প্রথমত যাদের কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা বুঝবারই ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয়ত যারা অকাট্য যুক্তি প্রমাণ সামনে আসার পরও সত্যকে মেনে নিতে চায় না এবং বিভ্রান্তী সৃষ্টির প্রয়াসে নতুন ছলছুতা খুঁজতে থাকে।

মুফতী সাহেবের বইখানা পছন্দসই হয়ে থাকলে আমি তাতে প্রশংসামূলক ভূমিকা লিখলাম না কেন, এই মর্মে মৌলভী সাহেব যে উক্তি করেছেন, সেটা তার হীন

মানসিকতার পরিচায়ক। তাকে বলে দেবেন যে, অন্যকে দিয়ে নিজের সমর্থন ও বন্দনামূলক বই লেখানো এবং তাতে আবার নিজেই ভূমিকা লেখা ছেঁচোড় লোকদেরই কাজ। আমি মুফতী সাহেবকে বা অন্য কাউকে আমার সমর্থনে বই লিখে দেয়ার জন্য কখনো অনুরোধ করিনি। মুফতী সাহেব নিজের সততা ও সত্যনিষ্ঠার তাগিদে স্বউদ্যোগেই এ বই লিখেছেন। আমি মনে করি যে, তার বক্তব্য যদি যুক্তির দিক দিয়ে গুরুত্ববহ হয়ে থাকে তা নিজেই জ্ঞানী গুণীদের সমাজে প্রভাব বিস্তার করবে। আমার কোনো ভূমিকার মুখাপেক্ষী থাকবে না।

আসল ব্যাপার হলো, এ যাবত যারা জেনে শুনে আমার কথাগুলোকে বিকৃত করা এবং তা থেকে কুফরী, গোমরাহী ও খোদাদ্রোহিতার মর্ম উদ্ধারের কারসাজিতে লিপ্ত ছিলো, মুফতী সাহেবের এ বইখানা তাদের অনেকের সততাকে সন্দেহযুক্ত করে দিয়েছে। আমি কখনো ঐসব লোকের বাড়াবাড়ির পরোয়া করিনি। কেননা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, মিথ্যার তেলেসমাতি বেশিদিন চলতে পারে না। একদিন না একদিন আল্লাহ্ তাদের গোমর ফাঁক করে দেবেনই। এবার যখন তাদেরই দলভুক্ত একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির হাতেই আল্লাহ্ তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন, তখন তারা এতে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছে। অথচ এই মরণকামড় তাদেরকে আরো বেশি কলংকিত করবে। প্রশ্ন হলো, আমার পক্ষ থেকে যদি মুফতী সাহেবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো বক্তব্য প্রকাশিত নাও হয়, আর মুফতী সাহেবও যদি আমার উক্তি উদ্ধৃত করার মাধ্যমে আমার বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেয়ার পরিবর্তে নিজের পক্ষ থেকেই এমন কোনো ব্যাখ্যা করে দেন, যাতে বিরোধীদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর জবাব হয়ে যায়, তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে এতে অসুবিধার কি আছে?

যেখানে একজন মুসলমানের কোনো কথার দুরকম ব্যাখ্যা করা সম্ভব এবং যার একটা ব্যাখ্যা অনুসারে তাকে কোনো রকম দোষারোপ করার অবকাশ থাকে না, অপর ব্যাখ্যা অনুসারে তাকে দোষারোপ করা যায়, সেক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যা অনুসারে তাকে অভিযুক্ত করার অবকাশ আছে সেটা গ্রহণ করার জন্য জিদ ধরা এবং অপর ব্যাখ্যাটা প্রত্যাখ্যান করা শরিয়তের কোন্ বিধি অনুসারে একজন সদাচারী মানুষের করণীয় হতে পারে? তার এই জিদ ধরা থেকেই তো বুঝা যায় যে, সে এই বিরোধিতা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নয় বরং বিদ্বেষবশতই করছে। আর এ ধরনের বিরোধিতাকেই হাদিসে বলা হয়েছে যে, 'সাবধান এটাই সম্পর্ক কর্তনকারী।' (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি: ১৯৬৮)

০৬. বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ইসলামি আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি।

প্রশ্ন: ১. আমাদের ইসলামি মহলে আজকাল একটি বিষয় নিয়ে ব্যাপক বাক-বিতন্ডা চলছে। সেটি হচ্ছে, যে দেশে অমুসলিমরা মুসলমানদের উপর কর্তৃত্বশীল, সেখানে মুসলমানদের জাতিয় বিষয়াদিতে ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের কতখানি অংশগ্রহণ করা উচিত? যারা এসব বিষয়ে অংশগ্রহণের পক্ষপাতী, তারা যুক্তি দেখান যে, বনী ইসরাইলকে ফেরাউনের অত্যাচার নিপীড়ন থেকে উদ্ধার করে মিশর থেকে বের করে

নিয়ে যাওয়ার জন্য মূসা আ. চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এর বিপরীত মতাবলম্বীদের আশংকা যে, এ ধরনের কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার ফলে ইসলামি আন্দোলনের নীতিগত অবস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তার আন্তর্জাতিক ও আন্তমানবিক আহ্বান স্বীয় আবেদন হারিয়ে ফেলবে। প্রথমোক্ত গোষ্ঠীর যুক্তির সারকথা হলো, বনী ইসরাইলকে যেভাবে আল্লাহ নবুয়তে মুহাম্মদীর পূর্বে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ও মনোনীত জাতি বলে অভিহিত করেছিলেন, তেমনি পৃথিবীর যে দেশেই মুসলিম নামের মানবগোষ্ঠী বসবাস করে, সেও মনোনীত ও শ্রেষ্ঠতম মানবগোষ্ঠী। কাজেই এ মানবগোষ্ঠীর জানমাল ও ইজ্জত সম্ভ্রমের সংরক্ষণ এবং তার পারিবারিক আইন ও শিক্ষা সংস্কৃতি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানাদির স্থিতি ও নিরাপত্তা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য এবং সর্বাগ্রে সেদিকে মনোনিবেশ করা জরুরি।

অন্য কথায় বলা যায় নবুয়ত যখন আন্তর্জাতিকতার যুগে প্রবেশ করলো এবং একাধিক জাতির জন্য একই নবীর আবির্ভাবের ধারা শুরু হলো, তখন একটি জাতিকে যেমন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করে নবুয়তের পদে অভিষিক্ত করা হতো, তেমনি বিশ্বের সকল জাতির মধ্য থেকে একটি জাতিকে মনোনীত করে নবুয়তের কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। তাই ফেরাউনকে ঈমান আনার দাওয়াত দেয়াটা মূসা আ.-এর মিশনের অংশ ছিলো কেবল ততোটুকুই, যতোটুকু বনী ইসরাইলকে উদ্ধার করার জন্য তার প্রয়োজন ছিলো।

আপনার কাছে অনুরোধ যে, একটি অমুসলিম শাসনাধীন দেশে দীন কায়েমের কর্মপদ্ধতি কি হওয়া উচিত, তা ব্যাখ্যা করবেন। সেই সাথে মূসা আ.-এর দাওয়াতের যে সম্পর্ক বনী ইসরাঈল ও ফেরাউনের জনগোষ্ঠীর সাথে ছিলো, তার প্রকৃত ধরন আপনার মতে কি ছিলো এবং কেনই বা তিনি বনী ইসরাইলের জাতিয় সমস্যার প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করলেন, তাও উল্লেখ করবেন।

জবাবঃ আপনাদের মধ্যে যে বিতর্ক ইদানীং চলছে, তা আমি গভীর মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করেছি। এ ব্যাপারে সংক্ষেপে আমার মত হচ্ছে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যে দেশে বা যে যুগেই উদ্যোগী হোক না কেন, সে যদিও স্থান ও কালের সীমারেখার উর্ধ্বের এক শাশ্বত সত্যের বাহক এবং সর্বকালের ও সকল স্থানের জন্য সমভাবে উপযোগী এক আদর্শগত বিধিনির্দেশ ও শিক্ষার উপস্থাপক হয়ে থাকে। তথাপি যে দেশ ও সমাজে সে এ কাজ করতে ব্রতী হয়, তার অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নির্বিকার থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে যদি নিছক প্রচারক না হয়ে থাকে বরং কার্যত ইসলামি বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করা তার লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট স্থান ও কালের গণ্ডিতে বিরাজমান পরিস্থিতি ও চলমান ঘটনাপ্রবাহকে স্বীয় দাওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ও বুঝা এবং সেই পরিস্থিতি ও পরিবেশের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা তার জন্য অপরিহার্য। এটা পর্যবেক্ষণ না করে তার উপায় থাকেনা যে, যে সমাজে সে এই কাজে উদ্যোগী হয়েছে সেটা কি পুরোপুরি অনৈসলামি সমাজ, না সেখানে কিছু লোক আগে থেকে ইসলামের অনুসারী

রয়েছে অথবা সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। এই তিনটি অবস্থার সব কটিতেই আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি এক রকম হতে পারে না।

আবার এই বিভিন্ন রকমের সমাজও সারা পৃথিবীতে একই ধরনের হয় না। কোথাও আমেরিকা ও জাপানের মতো পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকে, আবার কোথাও চীন ও রাশিয়ার মতো পরিবেশ বিরাজ করে। কোথাও ভারতের মতো অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় আবার কোথাও সিংহলের (শ্রীলংকা) মতো ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। কোথাও বা পাকিস্তানের মতো, কোথাও মিশর ও সিরিয়ার মতো আবার কোথাও তুরস্কের মতো পরিস্থিতি বিরাজমান থাকে। ইসলামের নীতিগত ও আদর্শিক আহবান যদিও এসব অবস্থার জন্য একই থাকে, কিন্তু এর জন্য যারা কাজ করবে তারা যদি কুশলী ও প্রজ্ঞাবান হয়, তাহলে তারা সর্বক্ষেত্রে একই দাওয়াই প্রয়োগ করবে না। বরং রোগ ও রোগীর অবস্থাভেদে প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য দাওয়াতেই উপযুক্ত রদবদল ঘটাবে।

নবীগণ যেভাবে হরেক রকম পরিস্থিতিতে কাজ করেছেন তা থেকে আমরা এ কৌশলটাতো অবশ্যই শিখে নিতে পারি যে, মৌলিক দাওয়াতকে অপরিবর্তিত রেখে কর্মপদ্ধতিতে অবস্থাভেদে কি তারতম্য ঘটানো উচিত। কিন্তু তাই বলে আমরা যেখানে কাজ করছি, সেখানকার অবস্থান হুবহু কোনো নবীর আমলে যেমন ছিলো তেমনই হবে এটা জরুরি নয়। তবুও যেহেতু আপনার প্রশ্নে মুসার দৃষ্টান্ত নিয়ে কথা উঠেছে, তাই সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য পেশ করছি। সে সময়ে মিশরে একদিকে ১০ থেকে ২০ শতাংশের মাঝামাঝি মুসলিম অধিবাসী ছিলো। অপরদিকে অমুসলিম শাসকশ্রেণি ঐতিহাসিক কারণে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভীষণ বৈরী ভাবাপন্ন ছিলো। এই পরিস্থিতি ও পরিবেশে মূসা আ. ইসলামি আন্দোলনের যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেন, তা নির্ভেজাল অমুসলিম সমাজে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত নবীদের কর্মপদ্ধতি থেকে ভিন্ন ধরনের ছিলো। মুসা আ. যদিও ফেরাউন ও তার অনুসারীদের কাছে ইসলামের মৌলিক দাওয়াত পেশ করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, কিন্তু তিনি মিশরে বিদ্যমান মুসলিম জনগোষ্ঠির ব্যাপারেও উদাসীন ও সম্পর্কহীন ছিলেন না। তিনি নিজেকে সেই জনগোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত বলে চিহ্নিত (Identify) করেন। কেননা তাদের প্রতি উদাসীন (Indifferent) হওয়াটা একেবারেই অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো। তিনি সাধারণ মিশরীয়দেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানোর পাশাপাশি আগে থেকেই ইসলামের অনুগত অথচ আকিদাগত বিভ্রান্তি ও নৈতিক অধপতনের শিকার ঐ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ইসলামি জাগরণ সৃষ্টির চেষ্টা চালান। তাছাড়া ঐ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কুফরীর আধিপত্য থেকে নিষ্কৃতি দেয়াও তার মিশনের একটা অপরিহার্য অংশ ছিলো। এ ক্ষেত্রে বনী ইসরাইলকে মিশর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন যে কারণে অনুভব করা হয়েছিল সেটা আমার মতে কেবল এটাই ছিলো যে, ঐ সময়ে মিশরকে একটা ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করার কোনো সম্ভাবনা ছিলনা। নচেৎ ফেরাউন ও তার সরকারের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ এবং তার অনুগত জনগোষ্ঠীর প্রভাবশালী ও

কর্তৃত্ব অংশের ইসলাম গ্রহণের কোনো সম্ভাবনা যদি থাকতো তাহলে বনী ইসরাইলকেও মুসা আ.-এর সহচর মুসলমানদেরকে অনর্থক মিশর থেকে বের করে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ ছিলনা।

এ দৃষ্টান্ত থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় সেটা হলো: যেখানে অনৈসলামি আধিপত্য বিরাজ করে এবং আগে থেকে একটা মুসলিম জনগোষ্ঠীও বিদ্যমান থাকে, সেখানে ইসলামের মৌলিক দাওয়াত বিস্তারের কাজে নিয়োজিত লোকেরা ঐ মুসলিম অধিবাসীদেরকে উপেক্ষা করে কাজ করতে পারে না। যদিও তাদের কর্মকান্ডে মুসলিম জাতিয়তাবাদের কোনো প্রকার ছাপ না থাকাই বাঞ্চনীয়। তথাপি ইসলামের যেটুকু পুঁজি আগে থেকেই সঞ্চিত রয়েছে তার সংরক্ষণে যত্নবান হওয়া তাদের জন্য অপরিহার্য। 'নতুন পুঁজি' সংগ্রহের চিন্তায় তাদের এতোটা বিভোর হয়ে যাওয়া কিছুতেই সঙ্গত নয় যাতে সাবেক পুঁজিও নষ্ট হয়ে যায়। এই মূলনীতি অনুসরণ করেই আমি দেশবিভাগের আগে এরূপ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম যে, একদিকে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছে ইসলামের মৌলিক ও আদর্শিক দাওয়াত পেশ করতে হবে, অপরদিকে ভারতের মুসলমানদেরকে অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া ও তাদের নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হওয়া থেকে যতোটা পারা যায় রক্ষা করতে হবে। **(তরজমানুল কুরআন, জুন: ১৯৬৮)**

০৭. মুসা আ.-এর দাওয়াতের দুটো অংশ।

প্রশ্ন: ২. ১নং প্রশ্নের যে সংক্ষিপ্ত জবাব আপনি দিয়েছেন তা থেকে আমার মনে হয়েছে যে, আমার প্রশ্নের যে প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়টা মুসা আ.-এর মিশন সংক্রান্ত ছিলো, সেটা আপনার সমর্থন লাভে বঞ্চিত রয়ে গেছে। আপনি বরঞ্চ আপনার সেই পুরানো মতটাই নতুন করে তুলে ধরেছেন, যা ইতিপূর্বে তাফহীমুল কুরআনে ব্যক্ত করেছেন। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেয়াতে যে সমস্যা দেখা দেয় সেটা সংক্ষেপে এই যে, মুসা আ. যে বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে মিশর থেকে হিজরত করেছিলেন, সেটা তিনি ফেরাউন ও তার অনুসারীদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে হতাশ হওয়ার পরে করেননি। বরং নবুয়তের সূচনাতেই তিনি ফেরাউনের কাছে ঈমানের দাওয়াত পেশ করার সাথে সাথে 'বনী ইসরাইলকে দেশ ত্যাগ করতে দেয়ার' দাবিও জানিয়েছিলেন। আমার প্রশ্ন ছিলো যে, এটা করার উদ্দেশ্য কি ছিলো? শুধু ঈমানের দাওয়াত দেয়াই কি যথেষ্ট ছিলনা? এ সমস্যার একটাই সমাধান আমার বুঝে আসে। সেটা হলো, বনী ইসরাইলের দেশ ত্যাগের অনুমতি দেয়ার দাবিটা ঈমানের দাওয়াতের বিকল্প ছিলনা। ফেরাউন ঈমান না আনলে বনী ইসরাইল হিজরত করে চলে যাক, এটা তার অভিপ্রায় ছিলনা। বরঞ্চ হিজরত করার দাবিটা ছিলো স্বতন্ত্র দাবি। ফেরাউন ঈমান না আনলেও এটা আদায় ও কার্যকরী করা হতো। কুরআনের বাচনভঙ্গীও এই বক্তব্যকে সমর্থন করে বলে মনে হয়।

আশা করি আপনি প্রথম সুযোগেই আমার এ বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ দেবেন এবং আপনার পুনর্বিবেচনা প্রসূত মতামত আমাকে জানাবেন।

জবাবঃ মুসা আ. কর্তৃক একই সাথে ফেরাউনের কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান বনী ইসরাইলের হিজরতের দাবি উত্থাপন থেকে সত্যিই আপনার কথিত জটিলতার সৃষ্টি হয়। তবে কুরআন শরীফে এ ঘটনার যে বিশদ বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে, তা লক্ষ্য করলে এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। বনী ইসরাইলকে দেশত্যাগ করতে দেয়ার দাবি শুরুতেই পেশ করার কারণ হলোঃ একটি মুসলিম জাতি যারা শুধু মিশরে নয়, তৎকালে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে, এমনকি সম্ভবত সমগ্র সভ্য জগতে একমাত্র তাওহীদ ও রিসালাত মান্যকারী জাতি ছিলো, দীর্ঘকাল যাবত কাফেরদের কঠোর জুলুম নির্যাতনে নিষ্পেষিত হচ্ছিলো। পরিস্থিতি এতদূর গড়িয়েছিল যে, 'অদূর ভবিষ্যতে ঐ জাতিটার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়া কিংবা কাফেরদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া একেবারেই অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হচ্ছিলো। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রথমে একটা পর্যাপ্ত মেয়াদ পর্যন্ত ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে সত্য দীনের দাওয়াত দিতে থাকা হবে। তারপর যখন তাদের মুসলমান হওয়ার কোনো আশা থাকবে না তখন তার দেশে বসবাসরত মুসলিম জনগোষ্ঠীর দেশ ত্যাগের অনুমতি চাওয়া হবে এতোটা কালক্ষেপণ করা সম্ভব ও সঙ্গত ছিলনা। কেননা সেটা যদি করা হতো এবং ঐ জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে কেবল দীনের দাওয়াতের চাহিদা পুরণেই নিয়োজিত থাকা হতো, তাহলে ২৫-৩০ বছরের মধ্যে মিশরের বুক থেকে এই মুসলিম জাতিটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

লেখা বাহুল্য যে, ইসলামের যৌক্তিকতা সম্পর্কে যাতে মিশরবাসী নিসংশয় হয় এবং তা গ্রহণে তাদের ওজরবাহানা করার কোনো সঙ্গত কারণ অবশিষ্ট না থাকে, সে জন্য এতোটুকু সময় দেয়া অপরিহার্য ছিলো। আর এই সময় দেয়ার অর্থ দাঁড়াতো এই যে, নতুন পুঁজি সংগ্রহ করতে গিয়ে হাতের পাঁচ যা ছিলো তাও খোয়ানো হলো।

কিন্তু যেহেতু মুসা আ. নিছক একজন জাতীয় নেতাই ছিলেন না, দাবি তুলেই ক্ষান্ত হননি বরং সে সাথে দীনের দাওয়াতও দিয়েছেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রেখেছেন। এ দাওয়াত যদি সফল হতো এবং মিশরের শাসক গোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ করতো, তাহলে এমন কোনো কারণ ছিলনা যে, খামাখা একটা মুসলিম জনগোষ্ঠীর মুসলিম দেশ থেকে হিজরত করে অন্য কোনো অমুসলিম দেশে যেতে হতো এবং সেখানে আবার নতুন করে কাফেরদের সাথে লড়াইতে লিপ্ত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়তো। কিন্তু এটা আপনার সুবিদিত যে, মিশরে ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে বনী ইসরাইলকে হিজরত করতে দেয়ার দাবিও শুরু করা হয়েছিল। তা যদি না করা হতো, তাহলে বনী ইসরাইলের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে শেষ মুহূর্তে আকস্মিকভাবে দেশ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব হতো না। দীর্ঘ ২৫-৩০ বছর ধরে তাদেরকে এ জন্য প্রস্তুত করতে থাকার বদৌলতেই তাদের মধ্যে এ মনোবল সৃষ্টি হতে পেরেছিল। নচেৎ দীর্ঘকালের অব্যাহত নিপীড়নের দরুন তাদের মনোবল এমন শোচনীয়ভাবে ভেঙ্গে গিয়েছিল যে, চূড়ান্ত মুহূর্তে তাদেরকে দেশত্যাগ করতে বলা হলে কেউ আর নড়তো না। (তরজমানুল কুরআন, জুনঃ ১৯৬৮)

বিবিধ প্রসঙ্গ

০১. স্বপ্ন সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রশ্ন স্বপ্ন সম্পর্কে মনে অনুসন্ধিৎসা জাগে, মানুষ কেন স্বপ্ন দেখে? কিভাবে কোথেকে সৃষ্টি হয় স্বপ্নের? আর স্বপ্ন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিই বা কি? ফ্রয়েডের মতে, মানুষের অচেতন বাসনাসমূহ চেতনার জগতে আসার প্রয়াস চালায়। কিন্তু সমাজের প্রতিবন্ধকতা এবং আত্মশ্লাঘার (ego) চাপের মুখে সেগুলো অবদমিত হয়ে থাকে। রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তার চেতনাও ঘুমে অসাড় হয়ে পড়ে। তখন তার অচেতন সত্তা জেগে ওঠে এবং সেই বাসনাসমূহকে চেতনার জগতে নিয়ে আসে। কিন্তু সেগুলোর অচেতন বেশ বদলে দেয়। (ফ্রয়ডের মতে সব স্বপ্নই Sexual ধরনের হয়ে থাকে) তাই ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর স্বপ্নে যা কিছু দেখা গিয়েছিল ফ্রয়ড সেটার জন্য Manifest Content এর পরিভাষা প্রয়োগ করেন।

তার মতে স্বপ্ন প্রতীকি হয়ে থাকে, যার তাৎপর্য অন্য কিছু হয়। এসব প্রতীকের (Symbols) বিশ্লেষণের মাধ্যমেই স্বপ্নের তাৎপর্য জানা যায়। এসব প্রতীকের প্রকৃত তাৎপর্য অচেতন বাসনাসমূহের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। এসব বাসনার জন্যে ফ্রয়ড Latent Content এর পরিভাষা ব্যবহার করেন। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্বপ্নের বিশ্লেষণ হচ্ছে মূলত Manifest Content এবং তার Symbols এর মাধ্যমে Latent Thought পরিজ্ঞাত হওয়া। মনোবিজ্ঞানীরা এর জন্যে Free Association এর টেকনিক ব্যবহার করেন এবং স্বপ্নের প্রতিক সমূহকে Sexual অর্থ পরিধান করান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে:

১. ইসলামের দৃষ্টিতে কিভাবে বা কি কারণে মানুষ স্বপ্ন দেখে?

২. এর Symbol সমূহের তাৎপর্য কিভাবে জানা যাবে? অর্থাৎ কোন্ টেকনিকে? নবীগণ এবং সাহাবিগণ কিভাবে স্বপ্নের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতেন?

৩. আমরা স্বপ্নের Symbol সমূহের যে অর্থ গ্রহণ করবো, তা যে ইসলামের দৃষ্টিতে স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা সেটা কিভাবে নির্ণয় করবো?

এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি প্রশ্ন আছে।

ক. আল্লামা ইবনে সীরীন এবং সাহাবায়ে কিরামের রা. স্বপ্ন বিশ্লেষণকে কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গির স্বপ্ন ব্যাখ্যা বলবো, নাকি সেগুলোকে মুসলিম চিন্তাবিদদের স্বপ্ন বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার অধীনে আনা হবে?

খ. স্বপ্ন সত্য হবার বিষয়টাকে কোনো বিশেষ 'সময়' কি প্রভাবিত করতে পারে? যেমন বলা হয় প্রত্যুষে যে স্বপ্ন দেখা হয় তা অধিকতর সঠিক।

গ. 'স্বপ্ন নবুয়্যতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ, বুখারি শরীফের এ হাদিসটির তাৎপর্য কি?

জবাবঃ বর্তমান যুগের মনোবিজ্ঞানীরা দুটি মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত। প্রথমত তারা কোনো উর্ধ্বজগতে বিশ্বাস করে না, যা মানুষ এবং তার পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাদের দ্বিতীয় রোগটি হচ্ছে, তারা আদতেই মানুষকে শুধু একটি অনুভূতিশীল প্রাণীমাত্র মনে করে। তার মধ্যে Biological life এর উর্ধ্বে কোনো রূহ এবং রূহানিয়াতের অস্তিত্ব স্বীকার করেনা। এ জন্যেই ফ্রয়ড এবং অন্যান্যরা স্বপ্নের উপরোক্ত ধরনের বিশ্লেষণ পেশ করেছে। ইসলাম যেহেতু উর্ধ্বজগতে বিশ্বাস করে এবং মানুষের মধ্যে রূহের অস্তিত্ব স্বীকার করে, সে জন্যে স্বপ্নের উপরোক্ত ধরনের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। ইসলাম স্বপ্নকে দুটি মৌলিক ভাগে ভাগ করে। একটির নাম 'রুইয়ায়ে সাদিকা' এবং অপরটির নাম 'আদগাছে আহলাম' (Confused Medley of dreams বা বিভ্রান্তিকর জগাখিচুড়ি স্বপ্ন)।

রুইয়ায়ে সাদিকা সত্য স্বপ্নের পারিভাষিক নাম। এ হচ্ছে এমন স্বপ্ন যা অনুভূতির অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত হয়ে উর্ধ্ব জগতের সাথে মানুষের রূহের সম্পর্ক স্থাপনের ফলে দেখা যায়। এমতাবস্থায় অধিকাংশ সময় কোনো প্রকৃত সত্য কিংবা ঘটিতব্য ঘটনা সম্পূর্ণ হুবহু দেখতে পাওয়া যায়। কখনো ব্যক্তিকে কোনো বিষয়ে একেবারে সরাসরি এবং সুস্পষ্ট জ্ঞান বা পরামর্শ দেয়া হয়। এ অবস্থায় ব্যক্তি অনুভব করে যেন দিবালোকের জাগ্রত অবস্থায় তিনি কোনো কথা শুনছেন বা দেখছেন। আবার কখনো ব্যক্তি এসব জিনিস Symbolic form এ দেখতে পায়, যার তাৎপর্য নির্ধারণ কষ্টকর হয়। স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য রাখেন এমন লোকেরা এসব প্রতীকের তাৎপর্য অনেক সময় যথাযথভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হন। এভাবে নির্ণয় করা সম্ভব না হলে পরবর্তীতে কোনো সময় যখন সেই স্বপ্নের তাৎপর্য বাস্তবে ঘটে যায়, তখন তার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ হচ্ছে আমার সেই স্বপ্নের অর্থ, যা অমুক সময় দেখেছিলাম।

এই হচ্ছে সেই স্বপ্নের প্রকৃত তাবীর। এসব প্রতীকী স্বপ্ন বিশ্লেষণের সঠিক পদ্ধতির প্রতি আমাদেরকে নির্দেশনা দান করছে সেই স্বপ্ন দুটি যা ইউসুফ আ. দেখেছিলেন এবং কুরআন মজীদে যার তাবীর বলে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে মূলনীতি সেই সব স্বপ্ন ব্যাখ্যা থেকেও জানা যায়, যা নবী করীম সা. কিংবা সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণ কোনো কোনো স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু স্বপ্ন ব্যাখ্যার বিষয়টা খোদা প্রদত্ত অন্তরদৃষ্টির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এর কোনো ছক বাঁধা নিয়ম নেই যে, স্বপ্ন ব্যাখ্যাকে একটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মতো ধরাবাঁধা পদ্ধতিতে এর নির্দিষ্ট অর্থ নির্ণয় করা যেতে পারে।

এবার 'আদগাছে আহলামের' আলোচনায় আসা যাক। এ ধরনের স্বপ্ন বিভিন্ন ধরনের কার্যকারণের প্রেক্ষিতে মানুষ দেখে থাকে। যেমন, এর মধ্যে এক ধরনের

স্বপ্ন হচ্ছে সেই স্বপ্ন, যার মাধ্যমে কোনো পথভ্রষ্ট কিংবা দুর্বল বিশ্বাসের ব্যক্তিকে শয়তান এসে কোনো মিথ্যাকে সত্য হবার কিংবা সত্যকে মিথ্যা হবার বিশ্বাস জন্মায় এবং তাকে এমন কিছু নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করায় এবং এমন কিছু কথা শুনায়, যা ঐ ব্যক্তির পথভ্রষ্ট হবার কারণ হয়। এর মধ্যে আরেক ধরনের স্বপ্ন হচ্ছে সেইসব স্বপ্ন যার মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব কল্পনা, ধ্যান ধারণা, ভয় ভীতি, ঘৃণা বিদ্বেষ, লোভ লালসা, কামনা বাসনা প্রভৃতি তার সম্মুখে আকৃতি ধারণ করে। অপর এক ধরনের স্বপ্ন হচ্ছে সেই স্বপ্ন যা কোনো মানুষ রোগের প্রভাবে দেখে থাকে। এই বিভিন্ন ধরনের স্বপ্নকে একত্রিত করলে সেগুলোর বিশ্লেষণ ফ্রয়ডীয় মতবাদের অধীনে করা সম্ভব নয়। সেগুলো থেকে ফলাফল গ্রহণ কিংবা তাৎপর্য নির্ণয় করার জন্যে অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীদের পদ্ধতিও (Techniques) যথেষ্ট নয়। এদের ত্রুটি হচ্ছে, তারা আগেই একটা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে নেয়। অতঃপর সেই দৃষ্টিভংগির অধীনে সমস্ত স্বপ্নের একটা বিশেষ ধরাবাধা ব্যাখ্যা করতে থাকে। অথচ সঠিক পন্থা হচ্ছে, অনেকগুলো স্বপ্নকে একত্রিত করে এবং সেগুলো যারা দেখেছে তাদের জীবনকে ভালভাবে অধ্যয়ন করে এই মত প্রতিষ্ঠা করা যে, আদগাছে আহলাম কোন্ কোন্ ধরনের হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন লোক তা কোন্ কার্যকারণের প্রেক্ষিতে দেখে থাকে।

আপনার অধিকাংশ প্রশ্নের জবাব উপরে দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট প্রশ্নগুলোর জবাব হচ্ছে, স্বপ্ন সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভংগিও কেবলমাত্র কুরআন এবং বিশুদ্ধ হাদিস থেকেই জানা যেতে পারে। পরবর্তীকালে মুসলিম চিন্তাবিদগণ যেসব দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করেছেন সেগুলোকে সেইসব চিন্তাবিদদের দৃষ্টিভংগির মর্যাদা দেয়াই সমীচীন।

স্পষ্টত এটা মনে করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই যে, স্বপ্নের সত্যতা কোনো বিশেষ সময়ের সাথে সম্পৃক্ত।

সত্য স্বপ্নকে নবুয়্যতের একটি অংশ বলে আখ্যায়িত করার দুটি তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত নবীদের স্বপ্ন এক ধরনের ওহি হয়ে থাকে, আদগাছে আহলাম নয়। দ্বিতীয়ত সত্য স্বপ্ন যেহেতু মানুষের রূহ এবং ঊর্ধ্ব জগতের মধ্যে এমন এক সম্পর্কের ফলে হয়ে থাকে যাতে মানুষের ইচ্ছা আকাংখা, কামনা বাসনা কিংবা অনুভূতি প্রতিবন্ধক হয় না। এ কারণে তা নিতান্তই সূক্ষ্ম প্রতীকের সাথে সম্পর্ক রাখে, বা খুবই উচ্চ এবং পূর্ণাঙ্গরূপে নারীদের কলব ও ঊর্ধ্ব জগতের মধ্যে ওহি এবং ইহলাম আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়।

০২. স্বপ্নের অনুসরণ

প্রশ্নঃ এক শুক্রবারে আমি জুমার নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমে স্বপ্ন দেখলাম, সাদা পোশাক পরিহিত দুজন বুযুর্গ ব্যক্তি। আমি তাদের নিকটে এলাম। দেখলাম, একজন হলেন মাওলানা এবং অপরজন তার চাইতেও অধিক বয়স্ক। মাওলানা সাহেব আমাকে নির্জনে একপাশে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তুমি জামায়াতের ইসলামীর আমীর মাওলানা মওদূদী সাহেবের সহযোগিতা করা ত্যাগ

করো। তার সাথে থাকা তোমার ঠিক নয়।' এ পর্যন্ত দেখেই সজাগ হয়ে গেলাম। সেদিন থেকে ভীষণ মানসিক পেরেশানীতে আছি। কারণ আমিতো জামায়াতের ইসলামির একজন সহযোগী বা সমর্থক মাত্র। কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তেই এ সহযোগিতা করি। মেহেরবানী করে এ সম্পর্কে কিছু হিদায়াত দিয়ে আমাকে আশ্বস্তি দান করুন।

জবাব: এ সম্পর্কে আপনার কোনো পরামর্শ দেয়া আমার জন্যে কষ্টকর। এ স্বপ্নের অনুসরণ করা আপনার জন্যে উচিত কি উচিত নয়, সে বিষয়ে আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে যেসব বিষয়ে জাগ্রত অবস্থায় চোখ খুলে জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেকের আলোকে আমাদের মত প্রতিষ্ঠা করা উচিত, সেগুলোর ভিত্তি স্বপ্নের উপর স্থাপন করার পক্ষপাতি আমি নই এবং এ পন্থাকে আমি মোটেই সহী সঠিক মনে করি না। কারণ এ ক্ষেত্রে যেমন ইলহামের অবকাশ আছে, তেমনি আদগাছে আহলাম এবং শয়তানী ধোঁকারও পূর্ণ অবকাশ আছে।

আপনি যে স্বপ্ন দেখেছেন, তাতো একটা মামুলী স্বপ্ন। কাদিয়ানীদের বহু লোক এর চাইতেও অনেক বিরাট বিভ্রান্তিকর স্বপ্ন দেখেছে যার ভিত্তিতে তারা সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে কাদিয়ানী মতবাদ এবং সে ধরনের অন্যান্য ভ্রষ্টপথের দিকে ধাবিত হয়েছে। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি: ১৯৬৬)

০৩. আল্লাহর যিকির ও তাঁর বিভিন্ন রীতি।

প্রশ্ন: আল্লাহর যিকির স্বয়ং রসূল সা. কর্তৃক প্রচলিত সুন্নত কিনা সে সম্পর্কে আমি দ্বিধাদন্দ্বে ভুগছি। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর একটা উদাহরণ বর্ণিত আছে যে, তিনি দেখতে পেলেন যে তার কতিপয় শিষ্য জিকিরের জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত হয়। তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'তোমরা রসূল সা.-এর সাহাবিদের চেয়েও বেশি পাকা মুসলমান হয়ে গেছো নাকি?' অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, 'রসূল সা.-এর আমলে তো আমি এ ধরনের যিকির দেখিনি। তোমরা এ নতুন রীতি কি কারণে উদ্ভাবন করছো?

অপরদিকে মিশকাতে সামষ্টিক জিকিরের ফজিলত সম্বলিত একাধিক হাদিস রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আনাস রা. বর্ণনা করেন যে, রসুল সা. জিকিরের সমাবেশকে বেহেশতের বাগীচার সাথে তুলনা করেছেন। আবু সাইদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন, "যখনই কোনো দল আল্লাহ্র জিকিরের জন্য সমবেত হয়, তখন ফেরেশতারা তার চারপাশে জমায়েত হয় এবং সেই সমাবেশের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়।" অনুরূপভাবে বুখারি ও মুসলিমের হাদিসে আছে যে, "ফেরেশতারা আল্লাহ্র জিকিরের সমাবেশ কোথায় কোথায় হচ্ছে খুঁজে বেড়ায় এবং তাতে যোগদান করে।" এসব হাদিসের আলোক জিকিরের সমাবেশ কিভাবে বিদয়াত হলো তা বুঝে আসে না। রসূল সা.-এর হাদিসের আলোকে ইবনে মাসউদ রা.-এর বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা কি হতে পারে বুঝিয়ে দেবেন।

জবাব: যিকির শব্দাটা দ্বারা অনেক কিছুই বুঝানো হয়ে থাকে। এর এক অর্থ হলো: মন দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করা ও স্মরণ রাখা। দ্বিতীয় অর্থ হলো: উঠতে বসতে সকল অবস্থায় নানাভাবে আল্লাহকে স্মরণ করা। যেমন বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলহামদুলিল্লাহ, মাশায়াল্লাহ, ইনশাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ইত্যাদি বলা। কথায় কথায় কোনো না কোনোভাবে আল্লাহর নাম উচ্চরণ করা, রাতে দিনে বিভিন্ন অবস্থায় আল্লাহর কাছে দোয়া করা, নিজের সাধারণ কথাবার্তায় আল্লাহর নিয়ামত, তার বিচিত্র সৃষ্টি নৈপুণ্য, তার গুণাবলী ও বিধিবিধানের উল্লেখ করা। তৃতীয় অর্থ হলো: কুরআন শরীফ ও ইসলামি শরিয়তের শিক্ষা ও বিধিমালা বর্ণনা করা। চাই সেটা শিক্ষাদানের ভংগীতে হোক, পারস্পরিক আলাপ আলোচনার প্রক্রিয়ায় হোক অথবা ওয়াজ নছিহত ও বক্তৃতার আকারে হোক। চতুর্থ অর্থ হলো: আল্লাহ আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার প্রভৃতি সশব্দে জপ করা। যে সব হাদিসে জিকিরের সমাবেশ বা বৈঠকাদির ব্যাপারে রসূল সা.-এর প্রশংসাসূচক বক্তব্য এসেছে, তা দ্বারা তৃতীয় ধরনের সমাবেশ বুঝানো হয়েছে। আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. যে সমাবেশ দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সেটা চতুর্থ ধরনের জিকিরের সমাবেশ। কেননা রসূল সা.-এর আমলে সামষ্টিকভাবে সশব্দে আল্লাহ আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ প্রভৃতি উচ্চারণ ও জপ করার প্রচলন ছিলনা। তিনি এটা শিক্ষাও দেননি, সাহাবিগণও কখনো এই রীতি অবলম্বন করেননি। প্রথম দুই অর্থে যে যিকির, তা যে আদৌ সামষ্টিকভাবে হতেই পারে না, সে কথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেন। ঐ যিকির কেবলমাত্র একাকি করা সম্ভব। (তরজমানুল কুরআন, মে: ১৯৬৬)

০৪. পর্দা সম্পর্কে জনৈকা মহিলার কিছু প্রশ্ন।

প্রশ্ন: আমি আপনার পুস্তক 'দীনিয়াত' (বাংলায় 'ইসলাম পরিচিতি' ও ইংরেজিতে Twards understanding islam নামে অনুবাদ প্রকাশিত)-এর ইংরেজি অনুবাদ পড়ছিলাম। ১৮২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আপনার সকল বক্তব্যের সাথে আমি একমত ছিলাম। এই পৃষ্ঠায় আপনার এ উক্তিটা দেখলাম যে, 'মহিলাদের যদি অনিবার্য প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হয়, তাহলে সাদাসিধে ধরনের কাপড় পরে এবং শরীরকে ভালো মতো ঢেকে বেরুবে। মুখমণ্ডল ও হাত বের করার যদি অত্যধিক প্রয়োজন না হয় হবে তাও ঢেকে রাখবো।' এর পরবর্তী পৃষ্ঠাতেই দেখলাম লেখা রয়েছে, 'কোনো নারী (স্বামী ছাড়া) আর কারোর সামনে নিজের হাত ও মুখ ছাড়া শরীরের আর কোনো অংশ বের করবেন না, চাই সে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হোক না কেন।' প্রথম আপনার উক্তি দুটো উক্তিতে আমি বৈপরিত্য দেখতে পাই। দ্বিতীয়ত আপনার প্রথম উক্তি আমার মতে সূরা নূরের ২৪নং আয়াতের পরিপন্থী। অধিকন্তু যে হাদিসে রসূল সা. আসমা রা. কে বলেছিলেন যে, "কোনো মেয়ে যখন যৌবনপ্রাপ্তা হয়, তখন হাত আর মুখ ছাড়া তার শরীরের কোনো অংশ দেখা যাওয়া চাই না", সেই হাদিসের সাথেও এ কথার মিল নেই।

পুস্তকের শেষাংশে আপনি লিখেছেন, 'শরিয়তের বিধান কোনো বিশেষ জাতি এবং বিশেষ যুগের প্রচলিত রীতি প্রথার ভিত্তিতে তৈরি হয়নি, আর তা কোনো বিশেষ জাতি বা বিশেষ যুগের লোকদের জন্যও নয়।' অথচ কুরআন পড়লে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পর্দা নিছক একটা প্রথাসিদ্ধ ব্যাপার এবং ইসলামের শিক্ষার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি যে ইসলমি আইনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বহু লোককে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন, এটা কি আপনি স্বীকার করবেন? আমরা ইসলামকে এমনভাবে উপস্থাপন করা দেখতে চাই না, যাতে এ যুগের তরুণ সমাজ ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। ইসলাম যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, তাছাড়া বাড়তি কিছু মনগড়া বিধিনিষেধ আরোপ করার অধিকার কি কারো আছে? (আমেরিকা থেকে পাঠানো জনৈক মুসলিম মহিলার ইংরেজিতে লেখা চিঠির অনুবাদ)

জবাবঃ আমি আপনার স্পষ্টবাদিতার প্রশংসা করি। তবে আমার মনে হয়, আপনি আমার বক্তব্যকে যথাযথভাবে বুঝতে পারেননি। ১৮২ ও ১৮৩ পৃষ্ঠায় আমি যা বলেছি, তাতে কোনো বৈপরিত্য নেই। নারীর জন্য শরিয়তের বিধান তিন অংশে বিভক্ত।

১. মুখমণ্ডল ও হাত ছাড়া শরীরের কোনো অংশ স্বামী ছাড়া আর কারোর সামনে খোলা চলবেনা। কেননা ওগুলো 'ছতর'। ছতর শুধু স্বামীর সামনেই খোলা যায়।

২. সূরা নূরের ৩১নং আয়াতে যে সব আত্মীয়ের উল্লেখ রয়েছে, তাদের সকলের সামনে মুখ ও হাত খোলা যায় এবং তাদের সকলের সামনে সাজসজ্জাসহ আসা যায়।

৩. এসব আত্মীয় ছাড়া সাধারণ বেগানা পুরুষদের সামনে নারীকে নিজের সাজসজ্জাও ঢেকে রাখতে হবে, যেমন উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে। আর মুখমণ্ডলও ঢেকে রাখতে হবে যেমন ৩৩ নম্বর সূরার ৫৩ থেকে ৫৫ নম্বর আয়াতসমূহে এবং ৫৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে।

ইংরেজি অনুবাদকরা সাধারণত এ আয়াতগুলোর অনুবাদে ঘাপলা বাঁধিয়ে বসেন। আপনি যদি আরবি জানেন তাহলে আপনার নিজের এ আয়াতগুলো পড়লে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্বামী, আত্মীয় স্বজন ও বেগানা পুরুষদের ব্যাপারে কুরআন নারীদের জন্য আলাদা আলাদা বিধান দেয়। বেগানা পুরুষদের থেকে তাদেরকে পুরোপুরি পর্দা পালন করার নির্দেশ দেয়।

আপনার এ ধারণা ঠিক নয় যে, পর্দা নিছক সামাজিক প্রথাভিত্তিক। কুরআন নাযিল হওয়ার আগে আরবরা হিযাব তথা পর্দার সাথে মোটেই পরিচিত ছিলনা। কুরআনই সর্বপ্রথম তাদের জন্য এ বিধান প্রবর্তন করে। পরবর্তীতে শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই পর্দা চালু ছিলো। পৃথিবীর আর কোনো জাতি এটা কখনো মেনে চলতো না, আজ চলে না। তাহলে আপনার মতে মুসলমানদের মধ্যে পর্দার আকারে যে 'প্রথাটা' চালু হয়ে গেলো, তা কাদের প্রথা। পৃথিবীর আর কোনো

জাতি এটা কখনো মেনে চলতো না, আজো চলে না। তাহলে আপনার মতে মুসলমানদের মধ্যে পর্দার আকরে যে 'প্রথাটা' চালু হয়ে গেলো, তা কাদের প্রথা?

আপনার এ ধারণা ঠিক যে, মনগড়াভাবে কোনো অন্যায় বিধি নিষেধ আরোপ করার অধিকার কারোর নেই। কিন্তু যেসব বিধি নিষেধ কুরআন ও হাদিস থেকে প্রমাণিত, কোনো মুসলমানের আধুনিকতার বলে তা লংঘন করার চিন্তাও করা যায় না। আমি জানি না আপনি উর্দু জানেন কিনা। যদি উর্দু পড়তে পারেন তাহলে আমার প্রণীত 'পর্দা' এবং সূরা নূর ও সূরা আহযাবের তাফসির অধ্যয়ন করুন। তাহলে পর্দার বিধান কুরআনের কোন্ কোন্ আয়াত এবং রসূলুল্লাহ সা.-এর কোন্ কোন্ হাদিসের আলোকে প্রণীত, তা আপনি জানতে পারবেন। সেই সাথে এটাও আপনি জানতে পারবেন যে, এ সব বিধি নিষেধ পরবর্তীকালের লোকেরা সংযোজন করেছে, না আল্লাহ ও তার রসূল স্বয়ং তা প্রবর্তন করেছেন। (তরজমানুল কুরআন,অক্টোবরঃ ১৯৬৬)

০৫. মসজিদের মিম্বর, মেহরাব ও মীনারের স্বার্থকতা।

প্রশ্নঃ এক ব্যক্তি নিজের একটা প্রবন্ধে এমন এক মসজিদের রূপরেখা দিয়েছেন যাতে মিম্বর, মেহরাব ও মীনার কিছুই থাকবেনা। ইসলামি স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসের আলোকে তিনি যুক্তি দেন যে, মেহরাব ও মীনার রসূল সা. ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে তৈরি করা হয়েছে। কাজেই এগুলো ইসলামি স্থাপত্যের অঙ্গীভূত নয়। প্রথম মসজিদে নববী যে নকশা অনুসারে তৈরি হয়েছিল সেটাই ইসলামি নকশা। সেই অনুসারেই মসজিদ বানানো উচিত। ইসলামের আলোকে এ দৃষ্টিভঙ্গী কি সঠিক?

জবাবঃ ইসলামে মসজিদের জন্য কোনো বিশেষ নির্মাণ প্রণালী নির্ধারিত নেই। তাই কোনো বিশেষ প্রণালীতে মসজিদ নির্মাণ করা ফরযও নয়, নিষিদ্ধও নয়। প্রবন্ধকারের এ যুক্তি ঠিক নয় যে, রসূল সা. প্রথম মসজিদে নববী যে প্রণালীতে তৈরি করেছিলেন সকল মসজিদ চিরদিনের জন্যে সেইভাবেই তৈরি হতে হবে। বিভিন্ন মুসলিম দেশে মসজিদ নির্মাণের জন্য বিভিন্ন রকমের নকশা আবহমানকাল ধরে অনুসৃত হয়ে এসেছে। এতে যে মূলনীতিটা অনুসরণ করা হয়েছে সেটা হলো, মসজিদের আকৃতি সাধারণ ভবনসমূহ থেকে এতোটা পৃথক হওয়া দরকার এবং সংশ্লিষ্ট দেশে বা অঞ্চলে তা এতোটা সুপরিচিত হওয়া চাই যে, সেই অঞ্চল বা দেশের যে কোনো লোক দূর থেকে তা দেখেই মসজিদ বলে চিনতে পারে এবং নামাজের সময় মসজিদ খুঁজতে তার কোনো অসুবিধা না হয়। এই মূলনীতি অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মসজিদের একটা নির্দিষ্ট নির্মাণ কৌশল থাকে এবং তার জন্য এমন কিছু লক্ষণীয় নিদর্শনাবলী রাখা হয়, যাকে ঐসব দেশে মসজিদের চিহ্নরূপে সবাই জানে। আমাদের দেশেও সাধারণভাবে মসজিদের একটা স্বতন্ত্র নির্মাণ কৌশল চালু রয়েছে। সেটা পরিবর্তন করে একেবারেই অভিনব একটা নির্মাণ প্রণালী প্রবর্তন করা এবং তার পক্ষে মসজিদে

নববীর প্রাথমিক নির্মাণ প্রণালীর বরাত দিয়ে যুক্তি প্রদর্শন একটা অর্থহীন উদ্ভট চিন্তা ছাড়া কিছু নয়।

মিম্বরের ব্যাপারে এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, রসূল সা. স্বয়ং মসজিদে নববীতে কাঠ দিয়ে একটা মিম্বর তৈরি করিয়েছিলেন, যাতে বিপুল জনসমাগমে খুতবা দেয়ার সময় খতীবকে সবাই দেখতে পায়।

মসজিদে মেহরাব স্থাপন করা হয় তিনটে উদ্দেশ্য। একটি হলো, সামনে যেহেতু শুধু ইমাম দন্ডায়মান হয়ে থাকেন, তাই অল্প খানিকটা জায়গা তার জন্য অতিরিক্ত বানানো হয়, যাতে শুধু একজনের জন্য পুরো একটা কাতারের জায়গা খালি না থাকে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, মেহরাবের কারণে ইমামের আওয়াজ পেছনের কাতারগুলো পর্যন্ত পৌছানো সহজ হয়ে থাকে। তৃতীয়ত মেহরাবও মসজিদের একটা বিশেষ চিহ্ন। কোনো ভবনকে যদি আপনি পেছনে দিক থেকেও দেখেন তবে সেখানে মেহরাব সামনে বর্ধিত থাকা দেখে তৎক্ষণাত চিনে ফেলবেন যে এটা মসজিদ। মসজিদের মীনার ইত্যাদি বানানোর তাৎপর্যও এটাই। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি: ১৯৬৭)

০৬. তাত্ত্বিক জালিয়াতি।

প্রশ্নঃ মাহমুদ আব্বাসী সাহেব 'তাহকীকে মজিদ' (আরো কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব) নামে যে বই লিখেছেন, তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। অনুগ্রহপূর্বক এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করুন যে, এতে যা কিছু লেখা হয়েছে তা কতোদূর শুদ্ধ। সমস্যা হলো, সকল সীরাত লেখক তো রসূল সা.-এর দাদার মৃত্যুর পর আবু তালেবকে তাঁর অভিভাবক বলে স্বীকার করেন, কিন্তু আব্বাসী সাহেব অন্য ধরনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করছেন।

১২৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, 'আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর সময় তাঁর নয়জন পুত্র জীবিত ছিলেন। তাদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন যোবাইর। কুরাইশ বংশের রীতি অনুসারে তিনিই পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং আব্দুল মুত্তালিব তাকেই নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।'

'যোবাইর ছিলেন একজন কবি ও মহৎ ব্যক্তি। আব্দুল মুত্তালিব তাকেই কুরাইশ সরদার নিয়োগ করেন'। (তাবাকাতে ইবনে সাদ, ১ম খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা)

১২৫ পৃষ্ঠাতেই তিনি আরো লিখেছেন, যোবাইর, আবু তালেব ও রসূল সা.-এর পিতা আব্দুল্লাহ একই মায়ের সন্তান ও সহোদর ভাই ছিলেন।'

১২৫-১২৬ পৃষ্ঠা: 'প্রাচীনতম ইতিহাসবেত্তা আবু জাফর মুহাম্মদ বিন হাবীব (মৃত্যু ২৪৫ হিজরি)' কিতাবুল মুহাব্বার' পুস্তকের প্রণেতা। তিনি 'আল নুক্কামু মিন কুরাইশ ছুম্মা মিন বনী হাশেম'(কুরাইশের সরদারগণ, অতঃপর বনু হাশেমের সরদারগণ) শিরোনামে সকল কুরাইশী গোত্রের মধ্যে থেকে যারা যারা তৎকালীন সরদার ও শাসক ছিলেন তাদের তালিকা দিয়েছেন। বনু হাশেম গোত্রে আব্দুল

মুত্তালিবের মৃত্যুর পর যোবাইর এবং তারপর তাঁর ছোট ভাই আবু তালেবের নাম উল্লেখ করেছেন।'

১৩২ ও ১২৬ পৃষ্ঠাঃ আব্দুল মুত্তালিব ও যে তার এই গুণধর ও সৎচরিত্র সন্তানকে (যোবাইর) নিয়ে গৌরব বোধ করতেন, সেটা ছিলো স্বাভাবিক। মৃত্যুকালে তিনি তাকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান।'

১২৫-১২৭ পৃষ্ঠাঃ হিলফুল ফুযুল হলো সেই চুক্তি ও জোটের নাম, যা কুরাইশ বংশীয় বিভিন্ন পরিবার ও গোত্রকে নিয়ে এবং তাদেরই উদ্যোগে আব্দুল্লাহ্ বিন জাদয়ানের গৃহে বসে গঠন করা হয়েছিল।'(শরহে ইবনে আবিল হাদিদ) সেই সময় রসূল সা. স্বীয় চাচার (যোবাইর) সাথে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন বিভিন্ন বর্ণনা মোতাবেক রসূল সা.-এর বয়স ছিলো ১৮ থেকে ২০ বছরের মাঝামাঝি।'

১২৮ পৃষ্ঠাঃ 'দাদার ইন্তিকালের পর রসূল সা. স্বীয় চাচা যোবাইরের অভিভাবকত্বে লালিত পালিত হন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী আতেকা নিজেদের সন্তানদের চেয়েও স্নেহ ও মমতা দিয়ে তাঁকে লালন পালন করেন।'

১২৯ পৃষ্ঠাঃ ' যোবাইরের মৃত্যুর সময় তিনি এতোটা বয়োপ্রাপ্ত ছিলেন যে, অন্য কোনো চাচা বা আত্মীয়ের অভিভাবকত্বের তাঁর প্রয়োজন ছিলো না।'

জবাবঃ মাহমুদ আব্বাসী সাহেবের অভ্যাস হলো, প্রসিদ্ধতম বর্ণনাকে উপেক্ষা করে তাঁর মতলব সিদ্ধ হয় এমন বর্ণনা খুঁজে বেড়ান। তাও যদি না পারেন তবে বর্ণনাগুলোকে বিকৃত করে নিজের মতলব অনুসারে বানিয়ে নেন। যে ইবনে সাদের বর্ণনা তিনি যোবাইর সম্পর্কে উদ্ধৃত করেছেন, সেই ইবনে সাদই তার গ্রন্থ তাবাকাতের ১১৯ পৃষ্ঠায় (বৈরুত সংস্করণ) এই মর্মে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আব্দুল মুত্তালিবের পর আবু তালেব রসূল সা.-এর লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি নিজের সন্তানদের চেয়েও তাঁকে বেশি স্নেহ করতেন। এর পূর্বে ১১৮ পৃষ্ঠায় ইবনে সাদ রা. লিখেছেন যে, আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুর সময় আবু তালেবকে রসূল সা.-এর রক্ষণাবেক্ষণের ওছিয়ত করেন।

সকল হাদিসবেত্তা, ঐতিহাসিক এবং সীরাত লেখক সর্বসম্মতভাবে এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু আব্বাসী সাহেবের তাত্ত্বিক জালিয়াতি এতোদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, আব্দুল মুত্তালিবের যে ওছিয়তের কথা তিনি ইবনে সাদের বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন সেটা আসলে এই যে, আব্দুল মুত্তালিব বনু খোজায়ার সাথে যে মৈত্রী চুক্তি করেছিলেন তা রক্ষা করার জন্যই স্বীয় পুত্র যোবাইরকে ওছিয়ত করেছিলেন। অতঃপর যোবায়ের ছোট ভাই আবু তালেবকে এবং আবু তালেব আব্বাসকে একই ব্যাপারে ওছিয়ত করে যান।

যে আবু জাফর মুহাম্মদ বিন হাবীবের বরাত আব্বাসী সাহেব দিয়েছেন, তিনি আব্দুল মুত্তালিবের পর কুরাইশ সরদার হিসেবে যোবাইরের নিয়ুক্তির উল্লেখ

করেছেন। কিন্তু একথা উল্লেখ করেননি যে, রসূল সা.-এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করা হয়েছিল। এই দুটো নমুনা দেখেই আপনি বুঝতে পারেন যে, আব্বাসী সাহেব কেমন সত্যভাষী। (তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারিঃ ১৯৭৬)

০৭. রসূল সা.-এর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ।

প্রশ্নঃ রসূল সা.-এর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ নিয়ে মতভেদে আমি ভীষণভাবে বিচলিত। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতি ফের্কার বিশ্বাস হলো, রসূল সা.-এর জন্ম ও ওফাতের তারিখ ১২ই রবিউল আউয়াল। শীয়া ফের্কার মতে তাঁর জন্মের তারিখ ১৭ই রবিউল আউয়াল এবং ইন্তিকালের তারিখ ২৮শে সফর। রসূল সা.-এর ইন্তিকালের সময়ে তো তাঁর পরিবারের লোকেরা (আহলে বাইত) এবং সাহাবায়ে কেরাম, সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তাহলে মতভেদ কেন এবং কবে হলো? সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতের লোকেরা নিজেদের জীবদ্দশায় কোন্ কোন্ দিনকে তাঁর জন্ম ও ইন্তিকালের দিন উদযাপন করতেন? আমি খুবই অস্থিরতার মধ্যে আছি।

জবাবঃ আহলে সুন্নাতের মধ্যে যতোগুলো রেওয়ায়েত প্রচলিত আছে, তাতে এব্যাপারে তারা সবাই একমত যে, রসূল সা.-এর জন্ম ও মৃত্যু দুটোই সংঘটিত হয়েছিল রবিউল আউয়াল মাসের সোমবারে। কিন্তু তারিখের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তাঁর শুভ জন্ম সম্পর্কে কেউ ২, কেউ ৮, কেউ ১২ এবং কেউ ১৭ তারিখ লিখেছেন। তবে বেশির ভাগ আহলে সুন্নাতের মধ্যে ১২ তারিখই অধিকতর প্রসিদ্ধ। অনুরূপভাবে ওফাত সম্পর্কে কেউ ১ তারিখ, কেউ ১০ তারিখে ও লিখেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আহলে সুন্নাতের কাছে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ১২ তারিখই। আহলে সুন্নাতের বর্ণনা মোতাবেক রসূল সা.-এর জন্ম ও ওফাতের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইত কোনো দিন উদযাপন বা অনুষ্ঠানাদি করতেন না।

শিয়াদের প্রখ্যাত গ্রন্থ আল্লামা কুলিনী প্রণীত উসূলে কাফিতেও জন্ম ও ইন্তিকালের দিন ১২ই রবিউল আউয়ালই লিখিত রয়েছে। তা সত্ত্বেও শিয়া আলেমগণ এব্যাপারে একমত যে, জন্ম তারিখ ১৭ই রবিউল আউয়াল এবং ওফাতের তারিখ ২৮শে সফর। আমি যতোদূর জানি, আহলে বাইতের ইমামগণও রসূল সা.-এর জন্ম ও ওফাতের দিন কোনো অনুষ্ঠানাদি করতেন না।

তারিখ নিয়ে মতভেদ কেন হয়েছে এবং কবে হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা খুবই কঠিন। (তরজমানুল কুরআন, মার্চঃ ১৯৭৭)

০৮. কোনো কোনো মক্কাবাসীর পারস্পরিক আত্মীয়তা।

প্রশ্নঃ তরজমানুল কুরআন জুলাই ৭৬ সংখ্যায় ১২পৃষ্ঠায় আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের নামের তালিকায় ৪৭ নম্বরে আইয়াশ বিন রবিয়ার নামের পর বন্ধনীতে তাঁকে আবু জেহেলের ভাই বলে পরিচয় দেয়া হয়েছে। ১৫পৃষ্ঠায় 'মক্কায় এই হিজরতের প্রতিক্রিয়া' উপশিরোনামে আইয়াশকে আবু জেহেলের চাচাতো

ভাই লেখা হয়েছে। ১৭পৃষ্ঠায় আইয়াশের সহোদর ভাই আব্দুল্লাহ বিন আবি রবিয়াকে এবং ২২পৃষ্ঠায় আইয়াশকে আবু জেহেলের মা শরীক ভাই বলা হয়েছে। আইয়াশ আবু জেহেলের চাচাতো ভাইও ছিলেন আবার মা শীরক ভাইও ছিলেন, এটা কি সঠিক?

জবাব: আইয়াশ বিন আবু রবিয়া রা. আবু জেহেলের চাচাতো ভাইও ছিলেন আবার মা শরীক ভাইও ছিলেন। এই পরিবারটির আত্মীতার বন্ধনগুলোকে ভালোভাবে বুঝে নিন। কেননা ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের সাথে এর গভীর যোগসূত্র রয়েছে।

বনী মাখজুম গোত্রের গোত্রপতি মুগীরা বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার বিন মাখজুমের কয়েক পুত্র ছিলো। তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নে দেয়া হলো। ইসলামের ইতিহাসের সাথে এদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

১. ওলীদ বিন মুগীরা, খালেদ বিন ওলীদ রা.-এর পিতা।

২. হাশেম বিন মুগীরা, এর কন্যা হানতামা ওমর রা.-এর মাতা।

৩. হিশাম বিন মুগীরা, আবু জেহেল ও হারেসের পিতা।

৪. আবু উমাইয়া বিন মুগীরা, উম্মে সালমার পিতা।

৫. আবু রবিয়া বিন মুগীরা, এই ব্যক্তি স্বীয় ভ্রাতা হিশামের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী আসমা বিনতে মুখাররিবা (আবু জেহেল ও হারেসের মাতা) কে বিয়ে করে এবং তার পেট থেকে আইয়াশ বিন আবু রবিয়া জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে আইয়াশ আবু জেহেলের মা শরীক ভাইও ছিলো আবার চাচাতো ভাইও ছিলো।

এই পরিবার থেকেই মুগীরার এক ভাই আসাদের পুত্র আবদে মানাফ আরকামের পিতা ছিলো। আরকামের গৃহ ইসলামের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ।

মুগীরার আর এক ভাই হিলালের পুত্র আব্দুল আসাদ আবু সালমার (উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমার প্রথম স্বামী) পিতা ছিলো।

৩৯. ওমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের সময় মুসলমানদের সংখ্যা।

প্রশ্ন: তরজমানুল কুরআন আগষ্ট, ৭৬ সংখ্যার ১৯পৃষ্ঠায় ওমর রা.-এর এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, 'রসূল সা.-এর সাথে ৩৯জন মুসলমান ছিলো। আমি ইসলাম গ্রহণ করে তাদের সংখ্যা ৪০জনে উন্নীত করলাম।' আপনি এ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, সম্ভবত ওমর রা. এই কয়জনের কথাই জানতেন। কেননা বহু সংখ্যক মুসলমান নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা তখনো গোপন রেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক তিন বছর গোপন আন্দোলন চলাকালে ৩৩ জন মুসলমান হয়। এরপর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু হয় এবং লোকেরা একজন দুজন করে মুসলমান হতে থাকে। কাফেরদের বিরোধিতা মারাত্মক আকার ধারণ করা পর্যন্ত এ ধারা চলতে থাকে।

অবশেষে নবুয়তের ৫ম ও ৬ষ্ঠ বছরে ১০৩জন সাহাবিকে দুই পর্যায়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে হয়। এদের মধ্যে কয়েক জন পরে ফিরে আসেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনায় কাফেরদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হিজরতকারীদের মধ্যে ওমর রা.-এর গোত্র বনী আদীর লোকজনও ছিলো এবং এ হিজরতের ঘটনায় ওমর রা.ও বিচলিত হন।

সুতরাং যারা ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেনি, তাদের কথা ওমর রা.-এর অজানা থাকা তো বিচিত্র নয়। কিন্তু হিজরত করে আবিসিনিয়ায় গিয়ে বসবাসকারী মুসলমানদের এতোবড় সংখ্যা ওমর রা.-এর মতো বিচক্ষন লোক জানলেন না, এটা কি সম্ভব? ওমর রা.-এর বক্তব্যের তাৎপর্য কি এটা হতে পারে না যে, তিনি যখন ইসলাম গ্রহণের জন্য আরকামের গৃহে গেলেন, তখন সেখানে মাত্র ৩৯ জন ছিলো এবং ওমর রা.-এর আগমনে ৪০ জন হয়ে গেলো? পরে এই ৪০ জনই দুই কাতারে মসজিদে হারামের দিকে যাত্রা করেন। এক কাতারে ছিলেন হামযা এবং অপর কাতারে ওমর রা.। এছাড়া এ সময় মক্কায় দশজন মুসলিম নারীও ছিলেন এবং অন্যান্য পুরুষ ও মহিলা সাহাবি তখন আবিসিনিয়ায় মোহাজের হিসাবে অবস্থান করছিলেন।

জবাব: আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর মক্কায় যেসব মুসলমান থেকে গিয়েছিলেন, তারা সবাই আরকামের গৃহে আশ্রিত ছিলেন না বলে আমার ধারণা। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক নিজেদের মুসলমান হওয়ার কথা গোপন রেখেছিলেন এবং অপর কিছু সংখ্যক আরকামের গৃহে রসূল সা.-এর সাথে বসবাস করছিলেন। ওমর রা. তাদের সম্পর্কেই বলেছিলেন যে, তারা ৩৯ জন ছিলেন এবং আমার যোগদানে ৪০ জন হয়ে গেলো। (তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল: ১৯৭৭)

১০. একটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ব্যবহারে আপত্তি।

প্রশ্ন: একটি অনুবাদের ভুলের ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তরজমানুল কুরআন জানুয়ারি ১৯৭৭ সংখ্যায় 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনামে আপনি' এক কোষ বিশিষ্ট অণু' (Unicellular Molecule) শব্দটা ব্যবহার করেছেন। এটা শুদ্ধ নয়। জীববিদ্যার (Biology) দৃষ্টিতে এটা একটা বহুল প্রচলিত তত্ত্ব যে, সকল জীবিত দেহ কোষের দ্বারা নির্মিত এবং প্রত্যেক জীবিত কোষে কয়েক প্রকারের কোটি কোটি সংখ্যক অণু থাকে। দেহাকৃতি গঠন অথবা শক্তির যোগান দেয়াই এসব অণুর কাজ। এসব অণু রাসায়নিক একক (Chemical units) হয়ে থাকে। একটি কোষে যখন কোটি কোটি অণু বিদ্যমান, তখন আপনার (Unicellular Molecule) বলা এবং তার অনুবাদ 'এক কোষ বিশিষ্ট অণু' করাটা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। আপনি সমগ্র বৈজ্ঞানিক সাহিত্যভাণ্ডারে কোথাও এ শব্দ লিখিত দেখাতে পারবেন না। এ কথা সত্য যে, কতিপয় অতি প্রাচীন এবং এক কোষ বিশিষ্ট প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে, যেমন ভাইরাস (Virus)। আপনি যদি এসব প্রাণীকে বুঝিয়ে থাকেন তাহলে সঠিক অনুবাদ হবে এক কোষ বিশিষ্ট প্রাণী (Unicellular Organism)। অধিকাংশ ভাইরাসের দেহে কেবল একটিমাত্র

দীর্ঘাকৃতির অণু (DNA Molecule) থাকে। এগুলোকে আমরা 'এক অণু বিশিষ্ট কোষ' (Uni Molecular Cells) বলতে পারি। অনুবাদের এই ভুল তাফহীমাত ২য় খণ্ডের 'ক্রমবিবর্তনবাদ' শীর্ষক নিবন্ধেও রয়েছে। সেখানে আপনি 'এক কোষধারী জীবাণু' শব্দ ব্যবহার করে তার ইংরেজি অনুবাদ (Unicellular Molecule) লিখেছেন।

জবাবঃ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে, আপনি আমার একটি ভুলের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জীববিদ্যার দৃষ্টিতে এ কথা সত্য যে, জীবিত দেহ (Organism) চাই তা প্রাণীর হোক কিংবা উদ্ভিদের, বহু সংখ্যক কোষের (Cells) সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক কোষ অসংখ্য অণুর দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু জীববিদ্যার দৃষ্টিতেই আল্লাহর সৃষ্টি জগতে এমন বহু বিকাশমান দেহ বা সজীব অস্তিত্ব রয়েছে, যার দেহ একটি মাত্র একক (Unit) দ্বারাই গঠিত হয়ে থাকে। এই এককটি বৃহত্তর কলেবরের উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহের কোষের (Cells) সমতূল্য হয়ে থাকে। এ ধরনের দেহগুলোকে সাধারণভাবে 'এককোষধারী' (Unicellular) বলা হয়ে থাকে। আবার যেহেতু কোষই সকল দেহের ক্ষুদ্রতম একক হয়ে থাকে, চাই তা এককোষধারী হোক বা বহুকোষধারী হোক এবং যেহেতু তাতে সজীব পদার্থের যাবতীয় গুণবৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তাই একে কোনো কোনো দিক দিয়ে 'সজীব পদার্থের অণু' নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকার ৩য় খণ্ডের (১৯৬৭ সংস্করণ) ৬৫৫ পৃষ্ঠায় আপনি এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য পড়ে দেখতে পারেন।

আপনি নিজে একথাও লিখেছেন যে, অধিকাংশ ভাইরাসের (Virus) দেহে শুধুমাত্র একটা দীর্ঘাকৃতির অণু থাকে এবং তাকে আমরা 'এক অণু বিশিষ্ট কোষ' বলতে পারি। এ থেকেই তো আপনার বর্ণিত সেই মৌল তত্ত্বটা উচ্ছেদ হয়ে যায় যে, প্রত্যেক সজীব কোষে কয়েক ধরনের কোটি কোটি অণু (Molecule) থাকে। তাই আমার প্রশ্ন হলো, 'এক অণুধারী কোষ (Unimolecular Cell) এবং 'এক কোষবিশিষ্ট অণু' (Unicellular Molecule) তে শাব্দিক ওলট পালট ছাড়া আর কি পার্থক্য রয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই একটি 'এক অণু বিশিষ্ট সজীব কোষ' এর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। চাই আপনি তাকে এক কোষ বিশিষ্ট অণুই বলুন, আর এক অণু বিশিষ্ট কোষই বলুন।

তাফহীমাত দ্বিতীয় খণ্ডে যে জিনিসকে আমি জীবাণু লিখেছি, তা দ্বারা এক অণুবিশিষ্ট সেই সজীব কোষকেই বুঝিয়েছি, যাকে আপনি 'প্রাণী' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। (তরজমানুল কুরআন, ১৭ই এপ্রিলঃ ১৯৬৭)

১১. 'ফকর' বলতে কি বুঝায়?

প্রশ্নঃ আল্লামা ইকবাল স্বীয় কাব্যে 'ফকর' শব্দটা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। আমি এ বিষয়ে তার যাবতীয় কবিতা সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক। আপনার মতে 'ফকর' অর্থ কী?

জবাবঃ 'ফকর' শব্দের আভিধানিক অর্থ তো অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া। কিন্তু তাসাউফপন্থীদের মতে, এর অর্থ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা ভোগ করা নয় বরং একমাত্র আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়া এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো দ্বারস্থ না হওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর কাছে নিজের অভাব ব্যক্ত করে এবং যার মধ্যে ধনলিপ্সা এতো প্রবল হয় যে, তাকে অন্যের সামনে মাথা নোয়াতে ও হাত পাততে প্ররোচিত করে, সে আভিধানিক অর্থে 'ফকীর' হতে পারে বটে, তবে খোদাভক্ত সুফীর দৃষ্টিতে সে ফকীর নয় বরং ভিখারী মাত্র। প্রকৃত ফকীর সেই, যে সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়, সে সৃষ্টির সামনে নিজেকে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এবং স্রষ্টার সামনে বিনয়ী অক্ষম বান্দাহ হিসেবে পেশ করে। স্রষ্টা কম দিক বা বেশি দিক, তাতেই সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ থাকে এবং সৃষ্টির ধনসম্পদ ও প্রতাপের দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। সে আসলে আল্লাহর ফকীর হয়ে থাকে। বান্দাহদের ফকীর নয়। (তরজমানুল কুরআন, এপ্রিলঃ ১৯৭৭)

১২. ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা।

প্রশ্নঃ ১. ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা কাকে বলে?

২. আপনার দৃষ্টিতে পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কতোখানি?

৩. ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে কোন্ কোন্ শক্তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে?

৪. আপনার মতে গত ২৭ বছরে পাকিস্তান ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার নিকটবর্তী হয়েছে, না তা থেকে দূরে সরে গেছে?

৫. আপনার মতে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক। শিক্ষা, সংস্কৃতি, জাতীয়তা এবং ভৌগোলিক জীবনে এ শিক্ষা ব্যবস্থার কি প্রভাব পড়া উচিত?

৬. 'নূর খানের শিক্ষানীতি' কার্যকরীকরণের পথে কে বাধা দিলো?

জবাবঃ ১. ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা বুঝায়, যাতে পাঠ্যসূচীভুক্ত যাবতীয় বিষয়কে ইসলামি আদর্শ ও মূলনীতির আলোকে প্রণীত ও বিন্যস্ত করা হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের ধর্মীয় ও নৈতিক প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয় এবং আরবি ভাষা ও কুরআন সুন্নাহর অপরিহার্য ও মৌলিক শিক্ষাকে পাঠ্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে নির্ধারণ করা হয়।

২. পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হলে এ সত্যকে উপলব্ধি করা দরকার যে, দেশ ও জাতির নেতৃত্বের চাবিকাঠি সর্বদা শিক্ষিত শ্রেণীর হাতেই নিবদ্ধ থাকে এবং অশিক্ষিত ও আধাশিক্ষিত শ্রেণী সব সময় নেতাদের পেছনে পেছনেই চলে। শিক্ষিত শ্রেণীর

চরিত্র গঠন কিংবা চরিত্র বিকৃতিতে শিক্ষা ব্যবস্থার যে ভূমিকা রয়েছে, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

৩. যে সরকার ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা কি জিনিস তা জানেও না, আবার তাকে ভীতির চোখেও দেখে এবং এড়িয়ে চলে, সেই সরকারই ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক।

৪. গত ২৭ বছরে পাকিস্তান ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে যদি এক কদম এগিয়ে থাকে, তবে দুই কদম পিছিয়েছে।

৫. ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়নে দুধরনের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। প্রথমত শিক্ষাঙ্গনের ভেতর থেকেই এর উদ্যোগ নেয়া দরকার। দ্বিতীয়ত বাইরে থেকে জনমতের চাপ প্রয়োগ করে কাজের সূচনা করা চাই। এই উভয় ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণভাবে, সংঘবদ্ধভাবে এবং অব্যাহতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। সেই সাথে একথাও মনে রাখা কর্তব্য যে, জীবন একটা অবিভাজ্য একক। তাই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে যতোক্ষণ ইসলামি বিপ্লব না আসবে, ততোক্ষণ শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন সহজ হবে না এবং দীর্ঘস্থায়ীও হবে না।

৬. 'নূর খানের শিক্ষানীতি' বাস্তবায়নে কে বাধা দিলো তা আমার জানা নেই।
(তরজমানুল কুরআন, জুলাইঃ ১৯৭৭)

সমাপ্ত

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩১১২৯২